পঞ্চকন্যা

অমিয়ভূষণ মজুমদার

বাকৃশিল্প
১৭সি, তেলিপাড়া লেন, কলকাতা ৭০০ ০৩১

PANCHAKANYA

A collection of short stories by Amiyabhusan Majumdar

পঞ্চকন্যা, জুন ১৩৭০

প্রকাশনা : তৃষ্ণা খাঁ
বাক্‌শিল্প
১৭-সি তেলিপাড়া লেন
কলকাতা ৭০০ ০৩১

মুদ্রণ : পৃথ্বীশ সাহা
অমি প্রেস
৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্প : বিপুল গুহ

শ্রীযুক্তা বীণাপাণি দেবী

অশেষ শ্রদ্ধাস্পদাসু—

সূচি

যে সাগ্নিকা

সীতার পাশে উর্মিলা নয়, বড়বউএর পাশে ছোটবউ। এক বছর আগে এ সংসারে এসে বড়বউ ছোট'কে ঘরে তুলেছিলো। এ রকম ধারণা হ'তে পারে বড়বউ সম্ভবত বয়সের দিকেও, যেমন যৌথ পরিবারের পদমর্যাদার দিকে, অনেকটা বড়। তা নয়। পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিলে এটা আরও স্পষ্ট হয়। মনে হবে দু'রঙের বটে, কিন্তু জাতে এক, সদ্য ফুটে উঠেছে। একই দামের, একই জমি ও নকসার, শুধু বা রঙে তফাৎ—এমন সব শাড়ি পরে এরা।

কিন্তু অনেক মিলের মধ্যে তফাৎ আছে: এখন সেটা ভালো ক'রে বোঝা যাচ্ছে। ধোপা কাপড় এনেছে, পরনের ময়লাগুলো তাকে দিয়ে দু'বউ শাড়ি পালটে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে ঠিক একই কথা বলতে, অর্থাৎ ভাঁটি দিও না মিস্ত্রীবউ, রঙ্ জ্ব'লে যাবে। রঙের কথায় চোখ তুলে তাকালে দেখা যাবে: দু'খানা শান্তিপুরী পরনে তাদের, ছোটবউএর হাল্কা নীল জমিতে সাদার চেক্, বড়বউএর জাম-রঙের গায়ে সবুজ ডুরি। দু'জনেরই ব্লাউজ গলার কাছে কেটে নামানো চোখে পড়ার মত অনেকটা, বুক ও গলার অনাবৃত অংশে উঁচুদামে পালিশ করা সরু সোনার হার। বড়বউএর বেণীটা মাথার পেছন থেকে উঠে এসে একটা মালার মতো সমস্ত মাথাটাকে বেষ্টন করেছে, আর ছোটবউএর এলোখোপার মস্ত ভারটা যেন বাঁধন খুলে ঠিক কাঁধের উপর নেমে এসেছে। পাঁচ ছ' বছর আগে এসব লক্ষ্য করা যায় নি। স্বাস্থ্যবতী ছিল দু'জনেই, ষোল-সতেরোর কৃশতা দেহে লেগে থাকা সত্বেও। তারপরে দু'জনেই বেড়েছে। বড়বউ যেন বর্ধিত হয়েছে—ষোল বছরের এনলার্জ করা ছবি যেন, তবু এখনও তেমনি কিশোরী। ছোটবউএর চেহারা বদলে গেছে, আগে তার ছিল পালিশ করা চেহারা, এখন একটু বা রুক্ষ, হয়তো বা প্রসাধনের ফলেই। দৃষ্টি বদলেছে, অভিজ্ঞতার ছাপ লেগেছে হাসিতে। অদ্ভুত শোনালেও সত্য—সে পীন বক্ষে ও গুরু নিতম্বে তন্বী।

ধোপা গেলে বড়বউ বললো,—'কর্তাদের আসার সময় হ'লো। লুচির ময়দাটা মেখে ফেল, ময়ী।'

ছোটবউ রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলো কি একটা কাজে, ফিরে দাঁড়িয়ে বললো,

'এখন কেউ আসবেন না, নিমন্ত্রণ আছে।'

'ও মা, তাইতো। কি যে হয়েছে আমার মন! তুই যা ছিলি, ভাই।'

'এস। ততক্ষণ দু'জনের জন্য চা করি। তুমি বরং কর্তা সেজে ব'সো, আমি গুছিয়ে দিই।'

'কেন, তোর বুঝি আসলে তৃপ্তি নেই?'

দুই বউই একসঙ্গে হেসে উঠলো।

একটু পরে ছোটবউ বললো, 'শাড়িটা পালটে এসো তো, দাদা, রান্নাঘরের জলকাদার ছাপ নিয়ে উঠেছো; এখনই ঠাকুর এসে—'

বড়বউ একটু যেন রাগ ক'রেই বললো, 'তা বলুক, এ কী রকম ব্যাভার, বল দেখি! উঠতে বসতে খুঁত ধরলে মানুষ বাঁচে? কখন কি পরি তার দিকেই বা অত নজর কেন? হ'লোই বা একটু ময়লা। তাতে যদি ভালবাসা কমে, যাক ক'মে।'

ময়ী বললো, (ছোটবউএর নাম বিয়ের আগে কি ছিলো জানি না, এখন রূপময়ী, সংক্ষেপে ময়ী। বড়বউএর নাম বিয়ের আগে এবং পরে সুভদ্রা।) 'পুরুষের ভালোবাসার কথা আর ব'লো না, ধুলোর মতো গলা শুকিয়ে আছে।'

'সত্যি তাই।'

'তার চাইতে যদি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তো, কত সুখী হ'তাম দু'জনে।'

ময়ী রান্নাঘরের টিপয়ের উপরে দু'কাপ কফি রাখলো, তার পাশে ঝকঝকে কাঁচকড়ার পিরিচে বাদামী ক'রে ভাজা হাল্কা দু'খানি টোস্ট।

সুভদ্রা সত্যিই ভাবতে বসেছিলো, এবার হেসে উঠলো, বললো, 'ও, পোড়ামুখী, ঠাট্টা হচ্ছে!'

কিন্তু কফি শেষ ক'রেই সুভদ্রা উঠে গেল শাড়ি পাল্টাতে।

কলেজে ছাত্র পড়িয়ে ফিরে মাস্টারির ভাবটাই থাকে মহেন্দ্রের, গম্ভীরভাবে কথা বলে, গম্ভীর সুরে উপদেশ দেয়। হয়তো এসে বলবে: বড়বউ, (বড়বউই সে বলে, মিষ্টি কোন নাম ধ'রে ডাকে না।) গানটা বোধ হয় আজও তোলা হয় নি? তার পরেই বলবে, হলুদ নাকি কাপড়ে? তা হ'লে তো আমার জামাতেও চক্ লেগে থাকা উচিত ছিলো। ঠাকুরপোও বলেন, বোধ হয় সব পুরুষই বলে। কপালের সিঁদুর নাকে লাগায়, ঠাকুরপো বলেছিলেন, সুবচনী ঠাকরুণ। কিন্তু তাঁর বলবার ধরনই আলাদা।

মহেন্দ্র ক্লাস শেষ ক'রে বাড়ি আসবার সময়ে কলেজের গ্রন্থাগারে গিয়েছিলো—বইএর জন্যই নয়। তাদের বিশ্রাম ঘর থেকে বেরুবার পথটিতে কমনরুম ও লাইব্রেরির দরজা। একটার দরজা তাকে পার হ'তেই হ'তো। লাইব্রেরির কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে কতগুলো ছেলে মেয়ে বই নিচ্ছে দেখতে পেলো মহেন্দ্র। সহকারী গ্রন্থা-

গারিক তাকে দেখে যথোচিত সম্মান জানালো। ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকে ফিরে চাইলো। ঠিক সেই সময়ে এই অনুভবটা হ'লো তার : অধ্যাপক যখন সে, ছাত্র-ছাত্রীদের চাইতে তার বেশী পড়া দরকার ; অন্তত সে যে বেশী পড়ে এ ধারণা তার প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধার গঠনে থাকা উচিত। এগিয়ে গিয়ে, সে অবশ্যই অন্যান্য অধ্যাপকদের মতো পুঁজি পাঠিয়ে বই নিতে পারতো, সে ছাত্রদের সান্নিতে দাঁড়িয়ে বললো, 'দিন না হয়, একখানা বই।'

গ্রন্থাগারিকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মহেন্দ্রর মনে হ'লো, সে অঙ্কের অধ্যাপক, অঙ্কের অধ্যাপকেরা শুধু অঙ্কই জানে আর কিছু বোঝে না, এ ধারণাটা, এই অর্ধ-অপমানকর ধারণাটা যেন ছাত্রদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে। তাই সে বললো,—'সিবোলভের বায়োলজির একখানা আমায় পড়তে দেবেন বলেছিলেন।'

বইখানি হাতে নিয়ে কোলকাতার রঙহীন রোদে ভরা পথে চলতে চলতে সহসা একটা চিন্তা প্রায় নাটকীয় আতিশয্য নিয়ে স্ফুরিত হ'য়ে উঠলো তার মনে : ছাত্ররা কি মনে করবে এটা বড় কথা নয়। এতগুলো ছাত্র এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের অভাব পূরণ করার মতো জ্ঞানের সঞ্চয় থাকা উচিত বৈকি অধ্যাপকদের। আরও পড়া উচিত। আরও কিছু, কিছু কেন সত্যিকারের জ্ঞানী হওয়া উচিত।

বাঁক নিয়ে অধ্যাপক মহেন্দ্র দেখলো সুধীর আর ক্ষমা যাচ্ছে। সুধীর দু'বছর আগে দর্শন শাস্ত্রে কোনো রকমে প্রথম সারিতে প্রথম হ'য়ে তার কলেজেই চাকরি পেয়েছে। ক্ষমা পড়ছে ইকোনমিক্সে। কোলকাতার ছাত্রমহলে বিশ্বাস এ বছরের পরীক্ষায় সেই সর্বশ্রেষ্ঠ হবে। এমন কি অত্যাশ্চর্য কিছু একটা ঘটতে পারে।

অথচ এমন কথা শোনা যায় সুধীর ও ক্ষমা প্রকাশ্যে প্রেম করছে। ক্ষমার মতো মেয়েকে তার বাবা-মা কিইবা বলতে পারে ? বেলা দু'টোর রোদ্দুরে লম্বা লম্বা পা ফেলে তারা ফুটপাত বেয়ে চলেছে। এই অশ্রদ্ধেয় কথাটা এখানে বলতে হবে, ক্ষমার চলন দেখে কোন এক চিত্র-নায়িকার প্রাণপূর্ণ উরুদেশের কথা মনে হ'লো মহেন্দ্রর। কেন হয় ?

তার ভালো লাগতো যদি এরা দু'জনে আলাপ করতো তাকে নিয়ে। মহেন্দ্র খুব দীন মনোবৃত্তির লোক নয় কিন্তু এরকম দু'জন কর্তৃক উল্লিখিত হ'তে ভালো লাগে বৈকি। যদি এরা আলাপ করতো ইকোনমিক্স কিংবা দর্শনের কোনো দুরূহ অঙ্গ নিয়ে তাহ'লেও মহেন্দ্র খুসী হ'তো।

সে শুনলো ক্ষমা বলছে সাহিত্যের কথা। মাঝখান থেকে শুনে বিষয়বস্তু বোঝা গেলো না। সুধীর অনেক ভেবে অল্প কথায় বললো, 'ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবটা কি বড়ো নয় ?'

'তুমি যখন বলছো, বড়ো তা হ'লে। কিন্তু ধরা দিয়েও দেবো না, ধরা দেবার জন্য আঁকা-বাঁকা পথে নিয়ে যাবো কাশ্মীরে, স্কার্দুতে, কিম্বা হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে, জীবনটাকে ক'রে দেবো পাটনা আর কুশারীদের গ্রামে আর বৈষ্ণবী আশ্রমে ছড়ানো

কবিতা—এমন মিষ্টি মেয়েটি আমি নই।'

'কি চাও তুমি ?'

'আমি হয়তো বলতাম, বিয়ে করি এসো, সংসার পাতি। যে কোনো রকমের একটা বিয়ে, দু'একটি ছেলে মেয়েকে দুরন্ত করে মানুষ করি।'

মহেন্দ্র লজ্জিত হ'য়ে উঠেছিলো। ট্র্যাম এসে পড়াতে ওরা আচমকা অন্তর্ধান করলো।

সুধীর ও ক্ষমা কি আলোচনা করলে তার ভালো লাগবে সে সম্বন্ধে একটা আন্দাজ সে করেছিলো কিন্তু যা সে শুনলো সেটা কি আরও ভালো লাগার মতো কিছু ?

নিমন্ত্রণের কথা ভুলে বাড়িতে এসে মহেন্দ্র দেখলো, শোবার ঘরে তার স্ত্রী টেবলের কাছে দাঁড়িয়ে ফুলের তোড়া গুছিয়ে রাখছে। মহেন্দ্র ঘরে ঢুকে অন্য অন্য দিনের মতো স্ত্রীর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো না।

ফিরে দাঁড়িয়ে চমকে ওঠার সুযোগ না-পেয়েও সেই সুরেই সুভদ্রা বললো, 'ওমা, একি ! আজ না চায়ের নিমন্ত্রণ ছিলো ?'

(ব'লে রাখা ভালো সুভদ্রা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মহেন্দ্রকে দেখেই এ ঘরে ঢুকেছিলো, আয়নার সামনে একটু দাঁড়িয়েও নিয়েছিলো, তারও আগে শাড়ি পালটেছিলো।)

'মন ভালো নেই বুঝি ?' সুভদ্রা বললো।

সুভদ্রার আবার সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে। মহেন্দ্রর মনে হয় প্রকৃতপক্ষে যতো তার চাইতে বেশী সে এখনই দেখতে পায়। সম্ভাবনার প্রায় কাল্পনিক লক্ষণগুলোতে তার চোখ আটকে গেলো। খানিকটা কৌতুক, কিছুটা কৌতূহল, অনেকটা স্নেহাভাস ফুটে উঠলো তার চোখে।

সে দৃষ্টিকে অনুসরণ ক'রে লজ্জিতা সুভদ্রা বললো,—'খাবার নিয়ে আসি।'

মহেন্দ্র লক্ষ্য করলো সিঁড়ি বেয়ে তর্‌তর্ ক'রে নেমে গেলো সুভদ্রা। চলার ভঙ্গিতে মাতৃত্বের গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে নি।

পথের মহেন্দ্রকে স্থানচ্যুত ক'রে ঘরের মহেন্দ্র ইতিমধ্যে নিজের গোছানো পরিবেশে তৃপ্তি বোধ করতে সুরু করেছে।

ছোট জায়ের কাছে গিয়ে সুভদ্রা বললো, 'এদিকে তোর ভাসুর এসে পৌঁছেছেন। কি করি বল তো ? কি দেয়া যায় খেতে ? পেঁপে কেটে দিই, আর সেই নোতুন সিরাপটা সরবতে ?'

ঘুঁটে ভালো নয়। ধোঁয়ায় চোখ রাঙা হ'য়ে উঠেছিল ময়ীর। ঝি তখনও আসে নি। চোখ তুলে, জল মুছে সে হাসলো।

'ও রকম ক'রে হাসিস নে।'

'তুমি ওপরে যাও, আমি যাচ্ছি যা নিয়ে যাবার।'

'তা যা ভালো বুঝিস,' এই ব'লে সুভদ্রা আবার তর্ তর্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো।

রাত্রিতে বায়োলজির বইখানা লিখবার জন্য সিবোলভের অনেক উর্ধতন পুরুষকে অভিসম্পাত দিচ্ছিলো মহেন্দ্র। এ রকম স্বচ্ছ ভাষায় এমন বই কে লিখতে বলেছিলো তাকে। বই না প'ড়ে ফেরৎ দেয়ার অভ্যাস নেই ব'লে আরও অসুবিধা হয়েছে।

সুভদ্রা এসে বাঁচালো। সদ্য একটা স্নিগ্ধ প্রসাধন শেষ করেছে সে। বেণীটা দুলছে পিঠের উপরে। পরনের শাড়ির খসখসে রঙ্ চোখে লাগতে পারে—সুভদ্রা তাও জানে। একটু হেসে সে সাদা আলোটা পালটে নীল আলোটা জ্বাললো। রাত্রির রঙে শুধু শাড়ির আঁশ মিশে গেলো না, সুভদ্রাও রাত্রির অংশ হ'য়ে গেলো।

মহেন্দ্র বললো, 'এ রকম সময়ে সবাই এমন মিষ্টি হ'য়ে ওঠে, তাই নয় ?'

ব্রীড়াবনতা সুভদ্রা মুচকি হেসে চোখ নামালো।

কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার আগে সাদা আলো জ্বালতে হ'লো সুভদ্রাকে। টেবল থেকে সিগারেট কেস এনে দিতে হলো মহেন্দ্রকে। সেই সাদা আলোয় সিগারেট টানতে টানতে ক্ষমার কথা মনে হ'লো মহেন্দ্রর। কলেজ থেকে ফিরে জামাটা খুলে আলনায় ঝুলোতে গিয়েও তার কথা মনে পড়েছিলো তার একটু অন্যভাবে : য়ুনিভার্সিটিতে সে আর সুভদ্রা যদি একই সঙ্গে যেতো ? সেও সোনার পদক পেয়েছিলো ; বহুদিনের কল্পনা সত্য হয়ে উঠেছিলো। সে সময়ে সুভদ্রাও যদি ডিগ্রির ডিপ্লোমাটাও নিদেন নিতো ? ভালো লাগতো হয়তো অনেকের চোখের উপর দিয়ে সুভদ্রাকে, অবিবাহিতা সুভদ্রাকে, খুব কাছে নিয়ে বেরিয়ে আসতে কনভোকেসন্ হল থেকে, কতকটা ক্ষমাকে সঙ্গে ক'রে সুধীরের পথ চলার মতো। বর্তমানে যে ক্ষমার কথা তার মনে হ'লো সে ঠিক দিনের আলোয় দেখা ক্ষমার মতো নয়, ঘুমের আগের সিগারেটের মতো নেশায় স্তিমিত, কতকটা সুভদ্রার মতোই।

এরকম সময়েই ময়ী আলসে থেকে অলস হাতখানা কুড়িয়ে নিয়ে পায়ে পায়ে ঘরে ফিরে চললো ছায়ামোহময় এক স্বপ্নোত্থিতার মতো। তখন তার মনে হ'লো : উপেন্দ্র সন্ধ্যার খানিকটা পরে বাড়ি ফিরেছিলো চায়ের নিমন্ত্রণের পর। দুই বউএর জন্য খাবার কিনে এনেছিলো সে। প্রায়ই এমন হয় যে উপেন্দ্রর বাড়ি ফেরার সময়ে সুভদ্রা থাকে দরজার কাছে। চোখে স্বাগত ভ'রে, 'ভাই ঠাকুরপো' ব'লে এগিয়ে গিয়ে অন্তত দৃশ্যত ময়ীকে ছায়ায় ফেলে দেয়।

আজ সে ছিলো না।

উপেন্দ্র আবৃত্তির সুরে বললো, 'দেখো কি এনেছি।'

'বউদের জন্য কতগুলো খাবার।'

কবিতা থেকে একেবারে গদ্যে নেমে গেল সুর।

উপেন্দ্র হেসে বললো, 'কি রকম মানুষ, একেবারে অবাক হও না।'

(বলা বাহুল্য সুভদ্রা আশ্চর্যে গান গেয়ে উঠবার মতো সুরে কথা বলতো।)

'ব'সো এখানেই। চা দিই একটু।'

নিজের খুব কাছে আসন পেতে দিয়ে ময়ী চা করতে বসেছিলো। স্বাভাবিক যা তা করলো না সে, অন্তরের সোহাগ ধরা না-দেবার লাস্যে ঢেকে দিলো না ; বরং একটু এগিয়েই এলো।

এই কথাগুলোই কি ভাবছিলো সে ? এই ভেবে সে নিজেই অবাক হ'য়ে গেলো। কি আছে এই আটপহুরে কথাগুলোর মধ্যে ভাবনার মতো।

সে ধীরে ধীরে নিজের ঘরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো।

উপেন্দ্রও বিছানায় এপাশ ওপাশ ক'রে উঠে বসলো। টাইমপিসটায় দেখলো রাত তখন সাড়ে এগারোটা পার হচ্ছে। দেখলো টেবলে জল ঢাকা আছে—ময়ী তা হ'লে এসেছিলো। একটু জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখার পর তার নজরে পড়লো একখানা বই প'ড়ে আছে ময়ীর বসবার চেয়ারটার উপরে। সে তুলে দেখলো, রোমাঞ্চ উপন্যাস। সে বইখানা লুকিয়ে রাখলো। বই লুকোতে গিয়ে আরও অনেক জিনিস লুকোবার কথা মনে হ'লো তার। ড্রয়ার্স থেকে চিঠি লিখবার কাগজ ও কলম সরালো, তারপর সে ভেবে পেলো না আর কোন-কোন জিনিসকে অবলম্বন ক'রে ময়ী চেয়ারটায় আড় হ'য়ে ব'সে হাই তুলতে তুলতে কাজ করতে পারবে। একটি সুশিক্ষিতা মেয়ের যেমন শুচিবায়ু থাকতে পারে, ময়ীর যেন তেমনি কাজের বাতিক। অন্তত উপেন্দ্রর তাই ধারণা।

চটিটা পায়ে দিয়ে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে উপেন্দ্র হাসিমুখে ভাবলো—কাজের মধ্যে ঘুমন্ত ময়ীকে বিছানায় তুলে নিয়ে যেতে হয়নি, হয়তো হবে একদিন।

কিন্তু উপেন্দ্র কি লক্ষ্য করেছে ময়ী যখন ব'সে ব'সে উপেন্দ্রর ঘুমের প্রতীক্ষা করতে থাকে ময়ী নিজেও তখন ঘুমে ঢুলে-ঢুলে পড়ে। বিছানার জন্যে তার কর্মক্লান্ত দেহ নুয়ে-নুয়ে আসে। অনেকদিন ময়ীর এ কৌশল সার্থক হয়, কোনো কোনো দিন হয় না। একদিন উপেন্দ্র রাত দুটো অবধি জেগে থেকে ময়ীর কাজের সঙ্গে আড়ি দিয়েছিলো। সেদিন যেন ময়ীর পরীক্ষা। যতবার সে ভেবেছে উপেন্দ্র ঘুমিয়েছে এবার সেও শোবে, উপেন্দ্র 'তা হ'লে শোনো—' ব'লে ছোটো আর একটা গল্প গুছিয়ে নিয়েছে।

কিছুদিন পরে এক দুপুরে ময়ী বড়জায়ের একমাসের শিশুটার দোলনা তদারক করতে করতে একখানা চিঠি লিখছে এমন সময়ে উপেন্দ্র এলো দুপুরের রোদে ঘেমে।

কলম চালাতে চালাতে ময়ী বললো, 'আড্ডা ভেঙে গেলো ?'

'গেলো।'

কলম চালাতে চালাতে ময়ী বললো, 'কিছু খেতে দেবো ?'

'দিও।'

বলা বাহুল্য এমন দুপুরে সব পুরুষই কলম কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু উপেন্দ্র কি জানে ময়ী যখন তার বান্ধবীকে চিঠি লেখে তখন সে এমন ছেলেমানুষ হ'য়ে যায় যে সে চিঠির প্রতি কেউ উপদ্রব করলে তার চোখ ছল-ছল ক'রে ওঠে ? সে ময়ীর সঙ্গে দিন রাত্রির অন্য কোন ময়ীর তুলনা হয় না। ছেলেমানুষের মতো কথাও সে লেখে সঙ্গিনীকে।

খস্ ক'রে বাঁকা একটা টান দিয়ে চিঠির শেষ সূচনা ক'রে প্যাডটা নামিয়ে রাখলো ময়ী। আঁচল তুলে উপেন্দ্রর মুখটা মুছে দিলো। হয়তো এর পরে এক সময়ে সে একটা পুনশ্চ দিয়ে সুরু করে বন্ধুকে লিখবে আবার। নিজে থেকে আঁচল দিয়ে স্বেদ মুছে না দিলে উপেন্দ্র নিজেই হয়তো তা করতো সে আশঙ্কাও ছিলো, তেমনি নিজে থেকে কলম ও প্যাড নামিয়ে না রাখলে হয়তো উপেন্দ্র কলম কেড়ে নিতো। মাঝপথে ঘটনাকে লুফে নিতে হয় ময়ীকে।

ময়ী বললো,—'ভারি ঠাণ্ডা ছেলেটি।'

কোন বিষয়ে গভীর মতামত জানাবার সুরে উপেন্দ্র বললো, 'নাকটিও বেশ খাঁদা খাঁদা। ভালো মানুষের মতোই।'

কিন্তু এত সব গবেষণা তার সম্বন্ধে খাটে না এটা প্রমান করার জন্যে তখন তখনই হাত-পা ছুঁড়ে কেঁদে উঠলো শিশুটি। ময়ী তাকে কোলে নিয়ে একটু দোলা দিয়ে মিষ্টি কি একটা ব'লে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিলো তখনই।

উপেন্দ্র জানতো এরকম অবস্থায় মেয়েরা এক সহজ উপায়ে শিশুকে শান্ত করতে পারে, সে বিষয়ে ময়ীর একান্ত অসহায়তার কথা চিন্তা করে সে বিরত হ'য়ে উঠেছিলো। বললো,—'ছেলে ভুলানো শিখলে কোথায় ?'

· এরকম ধরনের কথায় ময়ী উপেন্দ্রর অন্তরটা বুঝবার চেষ্টা করে। উপেন্দ্রর এই প্রশ্নটার চারিদিকে কোথাও কি কোন খেদ লুকিয়ে আছে ? এই সাধারন কথাটায় কি কোনো ইঙ্গিত আড়াল করছে উপেন্দ্র। ময়ীর ছেলেপুলে হয় নি। কিন্তু ঝলমল ক'রে উঠল দুল জোড়া, ময়ী বললো, 'ওর কাকাকে ভোলাতে ভোলাতে অভিনয়ে পাকা হয়েছি।'

পুরুষ এমন অবস্থায় যা করে তাই করলো সে।

উপেন্দ্র বললো, 'জ্ব'লে যাচ্ছে ? অভিনয় যে !'

'ওতে কি প্রমান হয় ?' বললো ময়ী। ভাবলো সে ঠোঁটের আনন্দের পিছনে শূন্যতাও থাকতে পারে।

নিজেদের কথা দিনের প্রখর আলোর মাঝখানে চিন্তা করার অবসর এমন অখণ্ড ভাবে রোজ আসে না। ময়ীর কাছে ব'সে উপেন্দ্রর পুরনো কথাও মনে হ'লো। সে বললে, 'কিন্তু সব সময়ে অভিনয়ও তুমি করো না।'

'কি রকম ?'

'সেবার সাগরসঙ্গমে বেড়াতে গিয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়া ডেকে শীতের রাত্রিতে একলা পায়চারি করতাম কিন্তু একজন জেনেও আসতো না।'

'সেটাও অভিনয়, তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার জন্যে।' ময়ী বললো হাসিমুখে।

'হয়তো সত্যি। ভালোবাসাটা যেন গল্প সৃষ্টি, কথার পরে কথা বসিয়ে পাঠকদের উপরে প্রভাব মেপে মেপে আরও কথা বসানো।'

খিল খিল ক'রে হেসে ময়ী বললো, 'লজ্জায় ম'রে যাই, দেখোদেখি একটা কথাও কি নোতুন রাখতে দিয়েছো যে সেটি দিয়ে বোঝাবো কত ভালোবাসি।'

'যেন কোন বাদশা-হারেমের অতিথি আমি, কখনও কণ্ঠের মণি, কখনও কোতল হচ্ছি।' কথাটা বলতে গিয়ে নিজেই হেসে ফেললো উপেন্দ্র।

উপেন্দ্র চ'লে গেলে, দেখলি খোকন, তোর কাকাবাবু কি বললেন, এই জলো কথাটা থেকে চিন্তার সূত্রপাত হ'লো। অনেকটা সময় ভাবলো ময়ী। এক একটা কথা এমন লেগে যায় প্রাণে। সে যেন বুঝতে চেষ্টা করলো, অন্তত তার ইচ্ছা হ'লো বুঝতে এই অভিনয়ের ব্যাপারটা। সে কি অভিনয় করার মতোও করুণাবতী নয়।

কিন্তু কথাটি কি অভিনয় ?

কথাটা শুনতে লজ্জা করে, নিজের সম্বন্ধে ভাবতেও। আগ্রহ বাড়ানোর কথা সে হয়তো রসিকতা ক'রে বলেছিলো কিন্তু সেটা তো মিথ্যা নয়। ওরা তো আজকাল বলছে : শাড়ি পরা, কানের দুলটি পছন্দ করার মূলে যা, এই যে সে ঘুরে ফিরে সংসারের কাজ ক'রে যাচ্ছে তার মূলেও সেটাই আছে—উপেন্দ্রকে তার প্রতি আগ্রহ-শীল ক'রে তোলা। তার প্রতি উপেন্দ্রর সব দিকের দৃষ্টি ধেয়ে আসুক শুধু এই। যেন উপেন্দ্র পৃথিবীর আর কোনো মেয়ের কথা চিন্তা করতে না পারে।

ময়ী উঠে গিয়ে একটা সেলাই নিয়ে এলো, সেটাকে জানুর উপরে বিস্তৃত ক'রে নিয়ে দাঁত দিয়ে সুতো কেটে নতুন জায়গায় ফোঁড় তুললো।

সে এবং তার মতো সবাই মিলে যে ষড়যন্ত্র করেছে তার জন্যে ময়ীর লজ্জা বোধ হ'লো। কিন্তু কি করবে সে? এই বোধ হয় স্ত্রীজাতির ভাগ্যলিপি যে সমস্ত জীবনটা নিজের সন্তানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে হয়। সে যদি বা হাতুড়ি আর গাঁইতি নিয়ে পাহাড়ের চূড়োয় আঘাত করতে যায়, কিম্বা যায় চামড়ার নৌকায় ডুবন্ত সূর্যের সোনা কুড়োতে ঢেউএর মাথা থেকে, তাকে ভুলিয়ে আনতে হয় ঘরে, পাতা দিয়ে, রঙিন মাটি দিয়ে অলঙ্কৃত করতে হয় দেহ। সেই তো পুরুষ যাকে সৃষ্টি করেছ, লালিত করেছ ; তার প্রতিও সদয় হ'তে পার না ?

অবশ্য মানুষের সমাজে প্রথা নেই ঠিক নিজের সন্তানটিকে এমন ক'রে ভুলানোর। ছিলো এককালে হয়তো সেই প্রথা সৃষ্টির আগের যুগে।

ময়ীর অসহায় বোধ হ'লো। সামনের দিকে দেয়ালের গায়ে তার দৃষ্টি নিরর্থক

হ'য়ে রইলো। কি করবে সে যদি জন্মের থেকেই সে ষড়যন্ত্রী হয়েছে ?

পাশের ঘরে রেডিও নানাস্তরের আর্তনাদ ক'রে উঠে একটা গান ধরলো। আর্তনাদে ময়ীর তন্ময়তা টুটে গিয়েছিলো। সে শুনতে পেলো সুভদ্রা রেডিওর সঙ্গে সঙ্গে গাইছে। গলা মিলছে না। ময়ী হাসি হাসি মুখে মনে মনে বললো—হবে না, হবে না।

সুভদ্রা একদিন রাগ ক'রে বলেছিলো, 'দেখো তো ব্যাভার! এখন কি ও সব শেখা যায় আর—ওই ফরাসি ?'

ময়ী হাসতে হাসতে বলেছিলো, 'বড় ঠাকুর শিখতে বলেছেন বুঝি ?'

'কাল থেকে এক ক্যাথলিক সিস্টার আসবেন। তা আমি বলি, বাপু, আমাকে সভা সমিতিতে নিয়ে যাওয়াই বা কেন ? আর যাবেই যদি নিয়ে তবে আমি যা তা বলতে লজ্জা কি ?'

'তবে পড়ো কেন ?'

'কপাল!' সুভদ্রা এইটুকুই বলতে পেরেছিলো।

উত্তরটা, যেন তা সত্যি উত্তর, ময়ী পেয়েছিলো অন্য একদিন উপেন্দ্রর মুখে। উপেন্দ্র বলেছিলো,—'ভগবান মিলিয়েছেন ভালো, যেমন আমরা, তেমন ওরা দুটি। বৌদি শুনলাম ফরাসি ভাষা শিখেছেন অনেকটা। দাদার টেবলে সেদিন দেখলাম রাশি রাশি সংস্কৃত বই। আমরা দুটি বেশ হাঁদা হাঁদা।'

ময়ী বললো, 'দিদি খুব শ্রদ্ধা করেন বড়ঠাকুরকে। এক না হ'লে অন্যের চলতো না, কিন্তু দেখে নিও দিদি যা শিখেছেন ক্যাথলিক মেমের সাধ্য নেই তার এক লাইন বেশী শেখায়।'

· 'সে তো ভালো নয়, দাদার মনে লাগবে।'

রেডিওর গায়ক তখন মিড়ের কাজ করছে সুরে, ধরতে না পেরে সুভদ্রার শিউরে উঠছে গলা। ময়ী ভাবলো,—বাঃ, দাদার লাগবে মনে এর চাইতে বড়ো কথা যেন আর নেই। সুভদ্রা নামা যে জীবনটি তার নিজস্ব অস্তিত্বই যেন কিছু নেই। সে যে বেঁচে থাকবে তার কেন-টা কোথায় ? রান্না করা, ঘর গুছিয়ে রাখা, স্বামীর মনের মতো শাড়িটা পরা এত সব আয়োজনের উদ্দেশ্যটা ?

ময়ী আবার ফিরে এলো সেই ষড়যন্ত্রে। একটা দ্বন্দ্ব চলেছে যেন সুভদ্রা ও তার স্বামীতে। কিছু সুবিধা হয়েছে সুভদ্রার, কি সে ভালোবাসে এ ব'লে দিয়ে মহেন্দ্র নিজের দুর্বলতাগুলোই যেন সুভদ্রাকে ব'লে দিয়েছে।

কিন্তু তাই যদি হয় সুভদ্রাও কেন ব্যথিতা হ'য়ে ওঠে। সুভদ্রা কি জানে না এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপার ? একটু ভেবে দেখতে গিয়ে ময়ীর মনে হ'লো,—না জানাটাই সম্ভব, নতুবা সুভদ্রার ব্যথা অত ক্ষণস্থায়ী কেন হবে। শুধু ক্ষণস্থায়ী কেন, সে ব্যথা যেন সুখে পরিণত হয়, অন্তত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশগুলো আরও মধুর হ'য়ে

উঠে। বিহ্বলা যেন সুভদ্রা। এত বড় ফাঁকির বিষয়টিকে সে যেন প্রশ্নও করে না। আঘাত পেয়ে অভিমান করে, কিন্তু কখনও ভেবে দেখবে না একটা নিছক প্রয়োজনের ব্যাপার সবটাই।

উঠে সেলাইটা গুছিয়ে রেখে অভ্যাসমতো আয়নার সম্মুখে একটু দাঁড়িয়ে সিঁড়িতে পা দিলো ময়ী।

রান্নাঘরের সম্মুখে দেখা হ'লো সুভদ্রার সঙ্গে। ছোট একটা টেবলের পাশে দাঁড়িয়ে সে মহেন্দ্রর পাঞ্জাবি গিলে করছে।

'বাব্বা এতো ?'

সুভদ্রা লজ্জিত হ'য়ে বললো,—'ঠাকুরপোর গুলো এনে দে।'

'দরকার হয় নিয়ে এসো। ঝির কাজ করছি ব'লে ধোপার কাজও ক'রে দেবো অত ভালোবাসি না।' ময়ী হাসলো।

রান্নাঘরে ঘণ্টাখানেক কাজ করতে হ'লো ময়ীকে। এক এক ক'রে দুই কর্তাই বাড়ীতে এলেন। সুভদ্রাকে প্রায় জোর ক'রে মহেন্দ্রর সঙ্গে বেড়াতে পাঠালো ময়ী।

সুভদ্রা বললো, 'কষ্ট হবে তোর ছেলে সামলাতে।'

'ছাই কষ্ট। ভাসুরকে নিয়ে যদি বেরিয়ে না যাও ও লোকটির কি উপায় বলো তো ? তারও তো সাধ যায় অফিস ফেরৎ বউ-এর সঙ্গে কথা বলতে কিম্বা খোলামেলা ছাদের সান্ধ্য টেরাসটা উপভোগ করতে।'

সুভদ্রা যেন কর্তব্যে অবহেলা করার লজ্জায় জড়িয়ে পড়লো। 'ছি-ছি। দেখ দেখি। এসব কি লক্ষ্য করেছি কোনদিন ? কি অন্যায়! আমরা এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি।'

সুভদ্রা বেরিয়ে গেলে তার শিশুটিকে কোলে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ময়ী হাসি থামিয়ে রাখতে পারলো না। কত সরল, কি ভালোমানুষ!

ছাদের টেরাসের দিকে তার ঘরের দরজা খোলা। ময়ী গিয়ে সেই দরজার গোড়ায় বসলো। মুখে তখনও হাসির সুখটুকু লেগে আছে। চারিদিকের বাড়ির চাপাচাপি থেকে ছিনিয়ে নেয়া একটুকরো আকাশ। ভাগ্য ভালো, সেটুকু যেন পূর্ণতরটির একটা ক্ষুদ্র অনুকৃতি। সামান্য কিছু সাদা মেঘ আর একটিমাত্র নারকেল গাছের মাথা কাঁপানো ঝিরঝির বাতাস।

উপেন্দ্র মুখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে ময়ীকে দেখে উঠে এলো, 'কি ব্যাপার ?'

'বসতে দি কাছে সন্ধ্যাভোর যদি একটি দু'টি মিষ্টি গন্ধের সিগারেট খাও।'

'তাতেই রাজী।'

কিন্তু রাত্রিতে উপেন্দ্র ঘুমিয়ে পড়লে মারি স্টোপস্ খুলে পড়তে বসলো ময়ী। লজ্জায় কানের পাশ দু'টি লাল হ'য়ে উঠতে লাগলো। তবু চেয়ারে সোজা হ'য়ে ব'সে সে পড়তে লাগলো ওষুধ খাওয়ার মতো মুখ ক'রে। দুপুর ও বিকেলের

চিন্তাগুলোর উদ্দামতা সে বুঝতে পেরেছে ইতিমধ্যেই। কি করবে সে মারি স্টোপস্ প্রমুখাদের সাহায্য নেয়া ছাড়া? কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত তো নারী হৃদয় উদ্ঘাটিত করে নি যে নিজের সমস্যাগুলো তার নিরিখে বিচার করা যাবে। কি ক'রে তারা পারবে? তাদের ভাষাও যে পুরুষের তৈরী। সে অনুভব করলো উপেন্দ্রকে আর একটু গভীর ক'রে ভালোবাসতে পারলে বোধ হয় ভালো লাগতো।

ভালো কি সে বাসে না? সেই এক টুকরো আকাশে চাঁদের আলোর মতো একটা আভা জেগেছিলো সন্ধ্যায়। উপেন্দ্রের ক্লাবে বেরোনোর মুখে চটুলতার মাঝে মাঝে একটি দু'টি মিষ্টি কথাও কি সে বলে নি অন্তর থেকে? বলেছিলো, পেয়েছিলো। তখন কি মনে ছিলো বৈজ্ঞানিক কোন আপ্তবাক্য? বরং ঠিক যেন সুভদ্রার মতোই হ'য়ে গিয়েছিলো সে। সুভদ্রা যেমন বিকেলে অন্তরের সমস্তটুকু সেবা প্রবৃত্তি একাগ্র ক'রে দিয়েছিলো জামা ইস্ত্রির কাজে, তেমনি সে একাগ্রতাটুকু ময়ীরও। এমনই সে ভাব-গভীরতা যে ধরা পড়লে গালে রং ফোটে।

কিন্তু সুভদ্রাকে কি এমন সব কথা ভাবতে হয়? হয়তো ওরা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে টেরাসের দিকের দরজার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো সে। অন্ধকার টেরাস। অন্ধকারের হাল্কা কালোর গায়ে গাঢ় কালোর আলসেগুলো একটা কোমল ত্রিমাত্রিক চিত্রের দুরূহতার মতো ঝিল্‌ঝিল্ করছে। দরজার কালো ফ্রেমে ঝিলমিলে ছবিটার অংশ হ'য়েই সে দাঁড়িয়ে রইলো হাত দু'টি বুকের উপরে আড়াআড়ি রেখে। একটা কোমল কালো নীরবতা যেন থৈ থৈ করছে তার চারিদিকে।

সুভদ্রাকে ভাবতে হয় না, কিন্তু তাকে ভাবতে হয় কেন? একি ভাবার বিষয়? ভেবে, চিন্তা ক'রে কি ভালোবাসা যায়? গভীর অনুভূতিতে সব চিন্তা মগ্ন—তেমন হয় না কেন তার? চিন্তা কি সন্দেহ নয়? হঠাৎ যেন কান্না পেলো ময়ীর। ডাক্তাররা যে কথা বলে তা হ'লে সে কি তাই, সেই বিশেষ অর্থে ফ্রিজিড্? অথবা, অথবা—ছবির রেখা গ'লে যাওয়ার মতো সজল হ'য়ে উঠলো তার চোখ দু'টি।

তাদের পাশের বাড়ির নিচতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছে। একদিন ময়ীর আলাপ হ'লো সে বাসার গিন্নীর সঙ্গে। গিন্নী বলতে তাদের চাইতেও কম বয়সের একজন। ক্ষমা নাম মেয়েটির। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কলেজে অধ্যাপনা করে। ময়ী আর সুভদ্রা দুপুরের আড্ডার খোঁজে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলো।

এ কথায় ও কথায় আলাপে সম্বোধন তুমিতে এলো। আসবার সুবিধাটা ছিলো এই যে, প্রকাশ পেলো এই নতুন ভাড়াটেরা দু'জনেই একসময়ে মহেন্দ্রর ছাত্র-ছাত্রী ছিলো একই বছরে। এই বাসার খোঁজও তারা মহেন্দ্রর কাছেই পেয়েছে।

আর এক ছুটির দিনে ভদ্রলোক বাসায় ছিলেন না, কোন এক সভায় গিয়েছিলেন, ময়ীরা গিয়ে দেখলো ক্ষমা বই পড়ছে এবং নোট নিচ্ছে। সুভদ্রা

বললো, 'ক্ষমা, তোমার ভালো লাগে এখনও এমন সব বই পড়তে ?'

অত্যন্ত অভ্যাসের ফলে যে আত্ম-সমালোচনা ও দম্ভের ভাবটি যুগপৎ আসে তেমনটি মুখে ফুটিয়ে তুলে ক্ষমা বললো, 'এই দেখুন কাল কলেজে পড়াতে হবে এইগুলো' (সেলফের কয়েকটি বই দেখিয়ে দিলো), 'আর এই বইটি উনি নিয়ে এসেছেন' (কোলের বইটি তুলে ধরলো), 'ওঁর সঙ্গে হয়তো রাত্রির অনেকটা সময় তর্ক হবে এরই বিষয় নিয়ে ।'

আলাপের মাঝে এক সময়ে ঝি এসেছিলো । তাকে ক্ষমা বুঝিয়ে দিলো না, সেই ক্ষমাকে বললো আজ কি-কি আহার্যের ব্যবস্থা হয়েছে, কি-কি আর হ'তে পারে । ক্ষমা খুসী হ'লো । ময়ী লক্ষ্য করলো এটা ।

ক্ষমা বললো, 'আপনারা ভাবছেন স্বামীর জন্যে নিজের হাতে খাবার করি না কেন ?'

মনের প্রশ্নটা মুখের চেহারায় প্রকাশ পেয়েছে ভেবে ময়ী মুখ নামিয়ে নিয়েছিলো । পথে আসতে আসতে ময়ীর মনে হ'লো স্বামীকে সুস্বাদু আহার্য রান্না ক'রে দেওয়া ছাড়া কিই বা সে করেছে ? এমন সব সময়ে তার মনে প'ড়ে যায় নভেলের মেয়েদের কথা, তারাও (নভেলের মেয়েদের কথা মনে প'ড়ে এই জন্যে যে তাদের মানসিক অবস্থাটা লেখার কৌশলে সুস্পষ্ট হ'য়ে চোখে পড়ে)—তারাও বা কি করছে ? প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অগোছালো পুরুষটির চারিপাশে পরিচ্ছন্নতা, উদাস পুরুষের সামনে সুজাতার পরমান্ন এনে দিচ্ছে । সে যদি গ্রহণ করে, ট্র্যাজিডি থাকে না । ঠিকই করেছে ক্ষমা । রান্না করা এবং তা করা বলতে যে সমুদয় বোঝায় তার জন্যেই যদি শুধু দেহ নয় মস্তিষ্কও ব্যাপৃত থাকে, নিজের ঐশ্বর্যগুলো কখন দেওয়া যায় ভালোবাসার মানুষটিকে ? ময়ী বললো, 'সত্যি তা ভাবি নি ।'

কিন্তু ভালবাসার নিদর্শনগুলি বোধ হয় দিতে হয় এবং নিতে হয় । কয়েক দিন পরে বিছানায় একটা বিশেষ সেন্টের লেশমাত্র ছড়াতে ছড়াতে ভাবলো সে,—এতো গল্পের সমস্যা হ'তে পারে । মানুষের জীবনে তারই প্রয়োগ করতে হবে এ কোনো মহাভারতে লেখা নাই । বিছানাটা ঢেকে দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এলো সে । নেশার দরকার হয় যেমন উপেন্দ্রর কাঙালপনা এই সেণ্টটার জন্যে । ময়ী এখনও ব্যবহার করে কিনা, কোনো সেণ্টেই করে কি না সেটা বিচার্য নয়, বিয়ের রাতের কথা মনে পড়ে তাই এখনও মাঝে মাঝে বিছানার একপ্রান্তে এর দু'এক ফোটা দিতে হয় । এটাকে কোন বিষয়ের প্রতীক করতে হবে কেন ? আর কৌতুকের বিষয় এই, উপেন্দ্রর এই কাঙালপনা পাছে সোচ্চার হয় তাকে ব্যস্ত হ'য়ে থাকতে হচ্ছে তার আগেই তার তৃষ্ণা মিটিয়ে দিতে । অন্যদিকে ভালোবাসা ছাড়া জীবনই কি বৃথা হ'য়ে যায় ? ধরো না একটা মেয়ের কথা, যার স্বামী অধ্যয়নে ডুবে থেকে তার স্ত্রীর যৌবন কখন সৌরভ রেণুর আমন্ত্রণ জানালো তার খোঁজ নিলো না । স্ত্রী অন্য পুরুষকে ভালোবাসলো, তৃপ্তি না পেয়ে প্রতিহিংসা নিলো, পাগল হ'য়ে গেলো

অবশেষে। যদি সে অন্য পুরুষের ভালোবাসা পেতো ? পায়তো। তারপরও কি উদগ্রতা থাকে ভালোবাসার ? দু'চারটে ছেলে-মেয়ে হওয়ার পরে সমস্যাটারও কি ভরাডুবি হয় না ?

ময়ীর সাময়িক ভাবে মনে হ'য়েছিলো যেটা সে খুঁজছে সেটা ধরা পড়েছে ক্ষমাদের জীবনে। মাঝে মাঝে তার যে অগভীর অনির্দিষ্ট অভাববোধটা হয় যেন সেটার উর্ধ্বে উঠে গেছে ওরা। নিজে যা খুঁজে ফিরি হঠাৎ তার সন্ধান পাওয়া গেছে মনে হ'লে বাড়াবাড়ি হ'য়ে যায়। ক্ষমাদের জানলা খোলা দেখলে কোনো না কোনো ছুতো ক'রে ময়ী যাবেই তাদের বাড়িতে। সুধীরের সঙ্গেও তার আলাপ হ'য়ে গেলো।

এখন ব্যাপার হচ্ছে এই ময়ী নিজে ট্র্যামে চ'ড়ে অফিসে বেরোয় না, কিন্তু জানে সেটা জীবন নয়, যেমন নয় কোথাও না বেরিয়ে রান্না করাটা। জীবন যদি থাকে তবে তা আছে ট্র্যামের পথ শেষ হওয়ার পর। যদি কেউ বলে ক্ষমা স্বাধীনা তাই ময়ীর মোহ ? এরকম লোকে বলছে বটে বিশেষ ক'রে তারা যারা অর্থনীতি দিয়ে মানুষকে বিচার করে। কিন্তু শ্ল্যাক্‌স্‌ পড়লেই কি বন্ধন যায় ? সেই অনুকৃতি কি হীনতর বন্ধনদশা নয় ? ময়ী তবু কিছু একটা যেন খুঁজে পায় ক্ষমাদের জীবনে। ময়ী অনুভব করার চেষ্টা করলো ভালোবাসার দেনাপাওনা চুকিয়ে যেখানে ওরা দাঁড়িয়েছে সেখানে ওদের একটি মন অপরটির পরম সাথী। কখনো মনে হয় তার : সংসারের বাইরে যে কেন্দ্র—কেন্দ্র একটা নিশ্চয় আছে নতুবা কাকে লক্ষ্য ক'রে প্রাণধারণ ?—সেদিকে ওদের দুটি মন শিশুর নিরাবরণ কৌতূহল নিয়ে চেয়ে আছে।

এরই ফলে ময়ী কোনোদিন বাসায় ফিরে এসে বলে,—'আচ্ছা, তোমার খাবার সময়ে আমি যদি না থাকি, মানে দিদির আড়ালে থেকে যদি না গুছিয়ে দেই ? অবশ্য তোমাকে আর একটা রাঁধুনি রাখতে বলছি না।'

উপেন্দ্র বললো,—'ভালোই হয় তা হ'লে, আর একটু কাছে পাই।'

ময়ীর মনে হয়েছে উপেন্দ্রের শান্ত কিন্তু কৌতুকপ্রিয় দৃষ্টির দিকে চেয়ে তা হ'লে কি ব্যথাটা যায় ?

কিন্তু উপেন্দ্রর আর একটা স্বভাব আছে। ময়ীকে চিন্তার অবসর না দিয়ে সে ব'লে বসতে পারে,—একটা কাজ করতে পারো ময়ী ? নিচে দেখে এলাম তোমার বড়জা তোমার বড়ঠাকুরকে খেতে দেবার নাম ক'রে গল্প করছেন। তুমি টুকটুক ক'রে গিয়ে উনুনের কেট্‌লি থেকে জল নিয়ে চুপ চুপ ক'রে এক কাপ চা তৈরি ক'রে আনতে পার ? সাবধান ক'রে দিচ্ছি : ধরা পড়লে বউদি জিজ্ঞাসা করবেন—কে খাবে। প্রশ্নটা দাদার সম্মুখে হবে এবং আমি কিছুদিন আগে ঘোষণা করেছি, যখন তখন চা খাওয়া যখন তখন বিয়ার খাওয়ার চাইতেও খেলো বিলাসিতা।

এ রকম একটা অনুভূতি হলো ময়ীর—সে মুহূর্তের জন্য উপেন্দ্র তাকে কানায়

কান্নায় পূর্ণ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু নেশা, এতো একটা মিষ্টি নেশা।

একদিন দুপুরে জানালা খোলা দেখে ক্ষমাদের বাসায় গিয়ে ময়ী দেখলো ক্ষমা নেই বাসায়, সুধীর শুয়ে আছে। ময়ী ফিরে যাচ্ছিলো, সুধীর ডেকে কথা বললো।

ময়ী বললো, 'বিছানায় কেন, অসুখ নাকি ?'

'ম্যালেরিয়ার মতো শীত নিয়ে এসেছে ফ্লু, খুব কুইনাইন খেয়েছি।'

দুর্বল লাগলো সুধীরের গলা।

ময়ী, বললো, 'ক্ষমা কোথায় ?'

'পার্টি আছে। যেতে হয়েছে তাকে।'

ময়ীর ভালো লাগলো না। সুধীর অবশ্য বলেছে যেতে হয়েছে তাকে অর্থাৎ ইচ্ছা ক'রে যায়নি এবং তার স্বরে কিম্বা দৃষ্টিতে নালিশ ছিলো না, তবু ময়ীর ভালো লাগলো না সুধীরকে রোগশয্যায় একা রেখে ক্ষমার বাইরে যাওয়া। ঠিক তখন অন্য কোন কথা মনে হ'লো না, শুধু উপেন্দ্রর রোগপাণ্ডুর একখানা মুখ যেন তার দিকে একান্তভাবে ফিরানো আছে।

ময়ীর মতো মেয়ে যে কোন রোগশয্যার পাশেই বসতে পারে, তাই বসেছিলো সে।

পরের দিন দুপুরেও ময়ী গিয়েছিলো। ক্ষমা ছিলো না বাসায়। কলেজে গিয়েছে। দু'পিরিয়াড্ ক্লাস নিয়েই ফিরবে। হাল্কা বাদামী একটা মলিদা গায়ে সুধীর বিছানাতেই ছিলো। তার দৃষ্টিটা ক্লান্ত।

কিন্তু হঠাৎ চ'লে আসতে হয়েছিলো ময়ীকে। সুধীরকে তার চ'লে আসার কারণ সম্বন্ধে সজাগ না ক'রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চ'লে এসেছিলো সে।

বাড়িতে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে তিরস্কার করলো--সব সময়েই যে ব্লাউজটা কিছু না-ভেবেই গায়ে তোলে সেটা পরার জন্যই ; শোবার ঘরের ইলেকট্রিক হিটারে জল চাপানোই ছিলো, সেটা ফুটে উঠতেই সুধীর যখন নিজের জন্য ওভালটিন গুলতে যাচ্ছিলো, তখন সে কাজটুকু নিজে ক'রে কাপটা সুধীরের সামনে এগিয়ে দেয়ার জন্যই। সুধীরদের দৃষ্টিকে সতৃষ্ণ ক'রে তোলার জন্য মেয়েদের এ রকম ব্লাউজ উদ্ভাবন করা হয়েছে এ বিচার করার বুদ্ধিও কি থাকতে নেই ?

তবু উপেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলো সে, 'অসুখ হ'লে বড্ড মনে পড়ে মায়ের কথা, নয় ? মা, দিদি, বন্ধু এদের স্পর্শ ভালো লাগে, ভরসা দেয় ?'

'পড়ে না মনে ? কান্না আসে মনে হ'লে।'

এবার ময়ীরও মনে পড়লো : কয়েকদিন আগে রোদ লেগে বিশ্রী মাথা ধরেছিলো উপেন্দ্রর। সারা রাত ছটফট ক'রে ভোরের দিকে উপেন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সকালে বিছানা ছাড়তে গিয়ে ময়ী দেখেছিলো বালিশ থেকে নেমে এসে তার বুকের কাছে মুখ রেখে দশ আঙুলে তার ব্লাউজের গলার কাছটা চেপে ধ'রে ঘুমিয়ে আছে

উপেন্দ্র। শিশুদের মতো ?

কিন্তু কোন কোন দ্বিধা সহজে যায় না। মনে হ'লে, ক্ষমা না থাকতেও পারে আজও এ রকম সম্ভাবনা কি মনের কাছে অসম্ভব ছিলো ? মনে হ'লো সুধীরের দৃষ্টি ভীরু ছিলো। যেন ক্ষমার কাছে সে দৃষ্টি লুকিয়ে থাকতে চায়।

ক্ষমা পারে নি, ক্ষমা পারে নি। আর তা যদি না পেরে থাকে, সুধীরকে তৃষ্ণায় অকাতর করতে, ক্ষমা শুধু স্ত্রী-স্বাধীনতাই পেয়েছে আর কিছু নয়—পুরুষদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ, অর্থোপার্জনের সুবিধা।

দু'বউ একসঙ্গে খেতে বসেছিলো।

সুভদ্রা বললো, 'হ্যাঁরে, ছোটকি, একটা সত্যি কথা বলবি ?'

'অভ্যাস বড় খারাপ, দাদা, মিছেটাই মুখে আসে।'

'মিছে বলিসনে, আমি জানি। এ কি হ'লো তোর বলতো, এমন শুকিয়ে উঠছিস কেন ?'

'আহাহা, চুলে তেল দিইনি।'

'তা নয়, তোর ঠাকুরও বলছিলেন, ছোটমায়ের হাসি শুনতে পাইনা আজকাল।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ময়ী অবাক হ'য়ে গেলো, এমন বদলে গেছে চেহারা, এমন নীরস হয়েছে দৃষ্টি !

রাত্রিতে উপেন্দ্রকে সে বললো, 'একি হ'লো আমার বলো তো ?'

'কি হ'লো ? কিছুই তো হয়নি। যেমন ছিলে তেমনি বউটি আছো। একটু বা জেদি, একটু বা যেন নোতুন ধরনের, কিন্তু সব মিলিয়ে দেখলে ভালো, খুব মিষ্টি নয়, হ'লেও মনের মতো, অথবা মনের মতো মেয়ে বলতে একজনকেই জানি।'

কিছুটা রসিকতা অল্প কিছু সত্যের সঙ্গে মিশিয়ে বলতে বলতে মাঝপথে থামলো উপেন্দ্র। এরকম ভঙ্গি, এরকম দৃষ্টি রোজ থাকে না ময়ীর। সাদৃশ্যে চার পাঁচ বছরের আগেকার একটা লজ্জার ঘটনা মনে প'ড়ে গেলো। ময়ী তখন আরও ছিপছিপে ছিলো, কথা দিয়ে জয় করতে জানতো না, হেসে লঘু ক'রে দেবার মতো ঐশ্বর্য সঞ্চিত হয়নি মনে। জেদে, রাগে কাঠ হ'য়ে গিয়ে শোবার ঘরের আলোতে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গের আবরণ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠেছিলো।

পরের দিন সকালে মারি স্টোপসের কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে—সবগুলো প্রবন্ধের বই একসঙ্গে পারা যায় না ছিঁড়তে—নিয়ে গেলো ময়ী উনুন ধরাতে। ভাববে না সে। দু'একখানা প্রবন্ধের বই এদিকে ওদিকে প'ড়ে রইলো মেঝেতে। ঘুম ভাঙবার চোখে উপেন্দ্র দেখলো ময়ী স্নান শেষ ক'রে গোল ক'রে কপালে সিঁদুর আঁকছে।

সেদিন খেতে ব'সে মহেন্দ্র উপেন্দ্রর দিকে চাইলো উপেন্দ্রও ভাবলো এত আহার্য এত সুস্বাদ ক'রে রান্না হওয়ার কি কারণটা ঘটলো ?

অফিস যাওয়ার মুখে উপেন্দ্র দেখলো দরজার কাছে ময়ী। বিয়ের প্রথম দিকে যে রকমটা প্রাত্যহিক ছিলো তেমনি এগিয়ে গেলো উপেন্দ্র, ময়ীও দাঁড়ালো সূর্যমুখীর ভঙ্গিতে। উপেন্দ্রর মনে হ'লো—কি যেন জ্বলছে ময়ীর চোখ দুটিতে।

একটু পরে (একটু বা ক্লান্ত সুরে) ময়ী বললো, 'ভুলে গিয়েছিলাম, পকেটের রুমালটা দাওতো পালটে দি।'

ময়ীর দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাও যেন ক্লান্ত।

মহেন্দ্রর সঙ্গে তার ছাত্রী ক্ষমার প্রতিবেশী হিসাবে দেখা হয়েছে। সুধীরের বন্ধুর বিয়ের উপলক্ষ্য ছিলো। তা না হ'লেও যে কোনো একটা রবিবারের পার্টিতে, দেখা হ'তে পারতো। কিন্তু উপলক্ষ্যটাই এ ব্যাপারে যেন অর্থগূঢ় হয়েছে। পাত্র-পাত্রী য়ুরোপে মানুষ। পাত্রী লণ্ডন আর পারী, ফ্রেবুর্গ ও সালৎসারে ঘুরে ঘুরে বুদ্ধি ও বিদ্যাতে তার ছোটো মাথাটা পরিপূর্ণ করেছে। আর পাত্র বরফের উপরে হেঁটে হেঁটে দেশলাই বিক্রি করেছে, সাময়িক পত্রিকায় জীবন-বেদ ও বৈদিক জীবন আলোচনা করেছে, রাজনীতির কিম্ভূত দল রচনা করেছে য়ুরোপের অনেক সহরের পিছন দিকের গলিতে। অবশেষে যে পরীক্ষায় কেউ কোনোকালে ফেল করে না সেটা পাশ ক'রে ইদানীং কোলকাতার সেণ্ট মার্টিন, এ—পথে ব্যারিস্টার।

সুধীর এবং ক্ষমা যখন সঙ্গে সঙ্গে এসে মহেন্দ্রকে তার বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলো তখনই হয়তো সুভদ্রার ভয় ভয় ক'রে উঠেছিল। মহেন্দ্রের এক রকমের অবুঝপনা আছে। তার ছাত্রজীবনের সঙ্গে জড়ানো কোনো বোহেমিয়ানপনার ইতিহাস নেই, ঘড়ির কাঁটা ধ'রে অতিবাহিত যৌবনে উপ্ত হয়নি কোনো স্মৃতির অঙ্কুর—এই দুঃখেই হয়তো সে মুহ্যমান হ'য়ে পড়বে। এ রকম একটা আশঙ্কা হয়েছিলো সুভদ্রার। বিয়েটা মা দিয়ে গেলেন মৃত্যুর আগে বউকে ঘরে আনবার মোহে, তখনও মহেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলের আগে ছুটবার পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে।

সুভদ্রা মহেন্দ্রের চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে বললো, 'এত ভাবনা কেন ?'

'ভাবছি দেওঘরের কাছাকাছি শহর থেকে একটু দূরে একটা বাড়ি করলে কি রকম হয়।'

'ভালোই হয়। তোমার শরীরটা ভালো থাকে ওদিকের জলে।'

'ক্ষমাও বলছিলো বটে। সুধীর হাঙ্গামাটা নিতে চায় না। সে যেন একটু ছেলেমানুষ। দর্শনের ছাত্র, একটু হাল্‌কা হ'য়ে চলতে হয়।'

সুভদ্রা সেদিন হাসিমুখে নেমে যেতে যেতে ভাবলো, 'বেশ হয় বাড়িটা হ'লে।'

তারপর স্বস্তি বোধটার কারণ খুঁজতে গিয়ে সে অনুভব করলো মহেন্দ্র ক্ষমার

কথা তুলে যা বলবে ব'লে আশঙ্কা করেছিলো সেটা বলে নি মহেন্দ্র,—ক্ষমাকে কিম্বা অন্য কোনো ছিম-ছাম মেয়েকে সুভদ্রার সম্মুখে আদর্শ ক'রে তুলে ধরে নি কথার ইঙ্গিতে।

বিকেলের দিকে ক্ষমা এসে উপস্থিত ছেলে কোলে ক'রে। সুভদ্রার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে বললো 'বলুন তো, দিদি, কি করি। সেই থেকে কাঁদছে। পেট ব্যথা করছে, না কান—কি ক'রে বুঝবো ?'

সুভদ্রা ছেলে কোলে ক'রে, তাকে উপুর করে, চিৎ ক'রে দেখে অবশেষে বললো, 'পেটই বোধ হয়। পার্টির ঝামেলায় সময়মতো খাওয়ানো হয় নি। দাঁড়াও একটু সেঁকে দি।'

ছেলে শান্ত হ'লে ক্ষমা তাকে কোলে ক'রে চ'লে গেলো। পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে পড়লো ময়ীর এই ক্ষমাই একদিনই সুভদ্রাদের কাছে তার বইএর সেলফ্ সমেত আত্মপ্রকাশ করেছিলো।

একদিন খেতে ব'সে সুভদ্রা বললো, 'কি ভয়ই না করতাম মেয়েটাকে ! মনে হ'তো যেন ও আমার সুখের সংসারের আগুন জ্বালাতে এসেছে। এদিকে তোমার বড়ঠাকুরের বাতিক ; ওদিকে হাতের কাছে চোখের সামনে বিদুষী কন্যে। ভাবলাম, হয়েছে, আবার কলেজে ভর্তি ক'রে না দেয়।'

একটু পরে আবার সে বললো, 'বেটাছেলেরা যে কত গুমোর করে। বেশ রে'ধেছিস চচ্চরিটা। পিঠে লুটিয়ে দেওয়া একটা বেণী, চোখের কোণে লুকিয়ে দেওয়া একটু কাজলে যারা ভাবে কি স্বর্গ পেলাম।'

'বড়ঠাকুর তোমাকে আর পড়তে বলেন না ?' ময়ী প্রশ্ন করলো শান্ত স্বরে।

'বলেছিলেন টুনি হবার পরও। চোখের সামনে তুলে ধ'রে বললাম আর এই যে দ্বিতীয় এসেছে ? পালাতে পথ পেলেন না।'

'যখন তখন ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধে এমন অশ্রদ্ধাভরে কথা বলো।'

'বলিস কিরে ? শিবঠাকুরের মাথায় বেলপাতা দেবারও যে সময় পাই না। ওরাই আমার সহায়। আমাকে ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, এদের জন্যেই ভালো লাগবে আমাকে।'

মহেন্দ্রকে যেন মোটামুটি বুঝতে পেরেছিলো ময়ী। সে চেয়েছিলো সাধারণ পারিবারিক জীবনেতর অন্য কিছু, কিন্তু সুভদ্রাকে টলাতে পারে নি, অনুনয়েও নয়, অনুযোগেও নয়। আর এখন যখন সে দুটি সন্তান নিয়ে ব'সে থাকে তাকে অন্যতর জীবনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয় শুধু, ভাবাও চলে না সে কথা। হয়তো সুধীর-ক্ষমার জীবনকে মহেন্দ্র ভালো চোখে দেখেছিলো। তারা কলেজ পড়বার সময় থেকে ভালোবেসেছে, একসঙ্গে কলেজে গেছে, বেড়িয়েছে, পড়েছে—মিলনে কোথাও বাধা ছিলো না। এটাই সম্ভবত বড়ো হয়েছে মহেন্দ্রর চোখে। ব্যাপারটা এমনি হয়, নতুবা অবশ্যই মহেন্দ্র লক্ষ্য করতো এখন ডক্টর ক্ষমার প্রচেষ্টা খানিকটা সুভদ্রা হওয়ার।

মহেন্দ্রর এই ভালো চোখে দেখার মধ্যে ঘোর লাগা ছিলো কিনা সেটাও অন্য প্রশ্ন।

কিন্তু যখন মধ্য দিনের অকরুণ দৃষ্টিতে কোলকাতা উদ্ঘাটিত তখন ময়ীর অবসর। ছাদের আলসেতে ব'সে দাঁড়কাক ডাকে। শব্দ থেকে বোঝা যায় এখন ট্র্যাম-বাসগুলো লম্বা-টেনে-টেনে চলছে। পথের পাশে আরোহীর প্রতীক্ষা কমেছে কয়েক ঘণ্টার জন্য। ময়ী তখন তার শোবার ঘরের মেঝেতে চুল শুকানোর ভঙ্গিতে ব'সে কোনো বই পড়ে কিম্বা বড়জার ছেলেকে নিয়ে খেলা করে। ততক্ষণে সুভদ্রা হয়তো ঘর গুছোয়, এদিক থেকে ওদিকে টানে পালঙ্ক, টেবল-ক্লথ পালটায়. রূপোর অ্যাস্ট্রে শাড়ির আঁচলে ঘ'ষে ঝক্ ঝকে করে।

কিন্তু আজ ময়ী চিঠি লিখতে বসলো তার কুমারী জীবনের সঙ্গিনীকে। ময়ীর আগে তার বিয়ে হয়েছিলো একটি বাইশ-তেইশ বছরের ছোকরার সঙ্গে। এখন তারা সংসারী। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে কেরানী আর স্কুল-মাষ্টারদের সংসার।

বান্ধবী গত চিঠিতে লিখেছে : মোটা হ'য়ে গেছি। দাঁতে পানের কালো দাগ পড়েছে ব'লে কষ্ট হয় বটে, তার চাইতেও অনেক বেশী কষ্ট হয় যখন দিনের মধ্যে একবার শুধু সিঁদুর পরার জন্যে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। শুধু মুখের নয়, সারা দেহের পেশীগুলো শ্লথ হ'য়ে গেছে, মেদে ঢেকে গেছে। যদি বলিস এগুলো আমার অত্যাচারেরই চিহ্ন প্রতিবাদ করার কিছু নেই। মেপে মেপে চলা দূরের কথা নিজের সম্বন্ধে ভাববারও অবকাশ নেই। চার পাঁচটি ছেলে-মেয়ে, স্বামী-দেওর-শাশুড়ী নিয়ে সংসার আমার। যদি কেউ এসে প্রশ্ন করে—'আমি কে'। ছেলে বুড়ো সবাই বলবে, রান্নাঘর থেকে শোবার ঘর এই কাজগুলো যার সেই। আর ভালবাসা? সেটা কি বল্ তো? তোমাকে দূরে রেখে থাকতে পারি না—এ আমার স্বামী এখনও বলেন। কাছে পাওয়ার ইচ্ছাটাই কি ভালোবাসা নয়? মহাভারত পড়ার নাম ক'রে শাশুড়ী কাছে বসতে ডাকেন। ছেলে-মেয়েরা এখনও ঘুমের ঘোরে মা-মা ব'লে খোঁজে। ছোটোটি যে কি করে তা তুই বুঝতে পারবিনে। আর আমার লজ্জা করে রাত্রির অন্ধকারের সব কথা বলতে। সাহিত্যিক নই যে ঘুরিয়ে বলি। বিয়ের সময়ে সুমিতা বোধহয় ইসাডোরার একখানি আত্মজীবনী উপহার দিয়েছিলো। শরীর সম্বন্ধে তার কোন কোন কথা বোধহয় মিথ্যা নয়।

ময়ী প্যাড ও কলম নামিয়ে রাখলো। চিঠিখানা দ্বিতীয়বার পড়লে চিঠি লিখবার মতো কথা সহসা গুছিয়ে তোলা যায় না। তা ছাড়া চিন্তা করতে গেলে ময়ী হাঁপিয়ে ওঠে আজকাল। ক্ষমা-সুধীরদের কাছে-অনেক আশা নিয়ে গিয়ে সে একটা আঘাত পেয়েছে। তারপর থেকে সে ভেবেছিলো আর সে চিন্তা করবে না।

কি হবে চিন্তা ক'রে এই ভাবতে ভাবতে ময়ী বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলো বেলা অনেকটা প'ড়ে গেছে। সুভদ্রা উনুনের ধারে খাবার করতে বসেছে, ঝি পাশে ব'সে লুচি বেলে দিচ্ছে। উপেন্দ্র অফিস ফেরৎ অফিসের পোশাকেই সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে কোন কৌতুকের কথা নিয়ে।

'ডাকো নি কেন?' ময়ী হাসলো বটে, একটু ঝাঁজ ছড়িয়ে রইলো তার উচ্চারণে।

'তাতে আর কি হয়েছে' ব'লে সুভদ্রা হাসলো।

কিন্তু সুভদ্রার দিকেই চাইলো ময়ী। কিছু একটা অস্পষ্টভাবে তার চোখে পড়ে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। লুচিগুলো ভাজতে গিয়ে হাতের যে সামান্য গতি হয়েছে তাতেই হাতের পিছন দিকের শ্লথ পেশীগুলো থল থল ক'রে দুলছে। এ যেন তার সঙ্গিনীরই ছবি, শুধু পানের রসে দাঁত কালো হয়নি। স্বচ্ছল ঘরের বলে পরনের শাড়িটা দামী, কিন্তু সেই দামের আড়ালে ঢাকা যায় নি কুক্ষির শ্লথ বিস্তার। ব্যাপারটা একটা চকিত আঘাত দেয়ার জন্যই যেন ফুটে উঠলো।

ঝি উঠে গিয়েছিলো কাজে। ময়ী সুভদ্রার পাশে গিয়ে বসলো।

সুভদ্রা বললো, 'দেখলে, ভাই ঠাকুর পো, কেমন জিনিসটা যোগাড় ক'রে দিয়েছি, রূপ বাড়ছে বয়সের সঙ্গে।'

বউদি ও দেওরের সাধারণ হাসি-ঠাট্টা।

অন্যদিন হ'লে হয়তো ঈষৎ লজ্জাবোধ করতো ময়ী। তার মনে হ'লো : ছাই রূপ, আহারের ও স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মগুলো মানলে যা টিকে যায়। এ রূপে যাতে মানায় তেমন জীবন?

এক রবিবার। শোবার ঘরে দুপুর বেলা ঢুকে দেখলো ময়ী ছেলেকে ভুলিয়ে রাখছে উপেন্দ্র। (ক্ষমার মত ময়ীও এখন সন্তানবতী।) এমন হয় পাশেই যে লোকটি থাকে রোজ নজরে পড়ে না সে বাড়ছে বা তারও পরিবর্তন হচ্ছে। হঠাৎ একদিন নজরে পড়লে অবাক হ'য়ে যেতে হয়।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলো : ছেলেটি বিছানায় উঠে বসতে গিয়ে টলছে, কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলছে আর উপেন্দ্র ঘরময় পায়চারি ক'রে বেসুরো গলায় কবিতা আওড়ে শোনাচ্ছে তাকে। মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে গেল ময়ী।

উপেন্দ্র ছেলেটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'শুনলি তো, এবার মানে শোন। সব জিনিসেরই একটা করে অর্থ আছে। এ সবই তো হাসির কথা নয়। এই যে তোমার মা—'

'থাক, ওর মায়ের কীর্তি আর ওকে শোনাতে হবে না।' হাসির ফেনায় পা রেখে ঘরে ঢুকলো ময়ী।

ছেলেকে বুকের কাছে তুলে ধরে ময়ী ভাবলো : এত সাধ লুকিয়েছিল এই লোকটির মনে। কাজে ব্যস্ত স্বল্পভাষী এ লোকটি যে এত স্নেহশীল, এমন অনাড়ম্বর আনন্দে ভরা, কে জানতো! এটা বোধ হয় একটি পরিণতির ইঙ্গিত। হয়তো মানুষের চরিত্রগঠনের কখনও শেষ নেই, জীবনের শেষ দিন অবধি চলছে পরিবর্তন ও পরিবর্জন। ভাবতে গিয়ে মনে হ'লো শুধু দাদার ছেলেমেয়ে কটির সঙ্গে উপেন্দ্র হাসে না, সব সময়েই যেন হাসি মুখটিকে ফিরিয়ে রেখেছে পৃথিবীর

দিকে। কখনও যদি অভিমানের ছায়া ভ্রূর কাছে কালো হ'য়ে আসে সেটা অন্য কারো চোখে পড়বার আগে মিলিয়ে যায়। আর কথা বলবার ধরনও যেন বদলে যাচ্ছে। রূঢ়ভাষী কোনদিনই নয়। আগে ঝিকিয়ে ওঠা একটা আবরণ ছিলো তার চিন্তার, এখন কথাগুলো যেন সরল ও গভীর হ'য়ে আসছে। পাছে কথার ঝিলিক অন্যকে কষ্ট দেয় এই ভেবে যেন ইচ্ছা ক'রে নরম ক'রে দেয় কথার পালিশকে। কিছুদিন পরে একটি সুপরিপক্ক সুমিষ্ট বৃদ্ধ হবে নাকি ? জীবনকে খুঁজে পেলে যে ধীরতা আসে সেটা পাবে ?

মানুষের জীবনে কখনও কখনও বিশ্রামের ইচ্ছা এসে পৌঁছায়, মাঝে মাঝে নিজেকে প্রবোধ দিতে সুরু করে সে তখন : এই তো অনেক, যতটা ভেবেছিলাম, হয় নি। বোধ হয় কারো কোনদিন হয় না।

ময়ী ভাবলো একদিন : আসলে জীবনটা একটা ঘটনা মাত্র, এই যে উনুনে আগুন জ্বলছে, কখনও শিখাটা লাল হ'য়ে নেমে আসছে, কখনও বেগনি হ'য়ে লাফিয়ে উঠছে। কাঠটা পুড়ে যাচ্ছে এটাই ঘটনা, শিখাগুলো তার বাহ্যিক রূপ। বৃহত্তর জীবন, গভীরতর প্রেম—এসবও বোধ হয় বেগনি শিখা, কিন্তু শিখাগুলো তেমন দ্যুতিমান না হ'লেও জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা একদিন ঘটবে।

মহেন্দ্রের কথা মনে হয়। কি অদ্ভুত পরিবর্তন।

এ বাড়ীতে প্রথম যখন ময়ী আসে তখন মহেন্দ্র পঁচিশ ছাব্বিশের অল্প-বয়সী একজন। ময়ী শুনেছিলো সে অধ্যাপক, দেখেছিলো সোনার প্যাঁশনে চোখে সাহেবি পোশাকে কলেজে যেতে। তখন সাহেবিয়ানার ঢেউ উঠেছিলো। বাড়িতে বদলে গেল সে রূপ ; গলা-বন্ধ কোট, কোঁচানো চাদর এই হ'লো পরিচ্ছদ। শুধু দেহে নয়, মনেরও স্তরে স্তরে পরিবর্তন এসেছে। সঙ্গীত সুরুচির বিষয় বলেই হ'ক কিম্বা নিজে গান ভালোবাসত ব'লেই হ'ক, কত চেষ্টাই না সে করেছে সুভদ্রাকে গান শেখাতে। গান তোলা হয়নি ব'লে ধমক খেয়ে সুভদ্রা এক একদিন কাঁদতে বসেছে। ফরাসী ভাষা শেখার ব্যাপারটা অবশ্য হাস্যকরই হ'য়েছিলো। কিন্তু কোথায় গেলো সেই মহেন্দ্র! যে মেয়েটিকে নিজের মতো ক'রে গ'ড়ে নিতে চেয়েছিলো, অর্দ্ধেক-গড়া সেই মেয়েটির কাছে অধ্যাপক মহেন্দ্র এখন শান্তির আশ্রয় কামনা করছে।

একদিন দুপুর রোদ মাথায় ক'রে একখানা বই হাতে সুধীর এসে ডাকলো ময়ীকে, 'আসতে পারি ?'

'আসুন।'

'বড় বৌদি সুভদ্রা কোথায় ?'

'ছেলে ঘুম পারাচ্ছে।'

সুধীর শুনলো না টানাটানি ক'রে তাকেও নিয়ে এলো।

'কি ব্যাপার ?'

সুধীর বললো, 'এই মাত্র দপ্তরীর কাছে পেলাম, মাষ্টারমশাই নিজেও এখনো খবর পান নি।'

ময়ী অবাক হ'লো। অধ্যাপক বই লিখবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই, না-লিখলেই বরং অবাক হ'তে হয়। ময়ী অবাক হ'লো এইজন্যে যে সে যখন ভেবেছে মহেন্দ্র তলিয়ে গেছে তখনই যেন উঠবার সিঁড়িতে পা দিয়েছে সে।

ময়ী বললো, 'পড়ি, দিয়ে যাও বইখানা।'

সুধীর বললো, 'ক্ষমাকে এক কপি দিয়ে এসেছি তার কলেজে।'

তারপর সে এক দুপুর রোদ মাথায় ক'রে মহেন্দ্রকে চমকানি খবরটা দেবার জন্য বেরিয়ে পড়লো।

বইখানি হাতে দিয়ে ময়ী সুভদ্রাকে বললো, 'এ খানা কি দেখো তো।'

সুভদ্রা হাতে ক'রে দেখলো বইটিতে গ্রন্থকারের নামের জায়গায় মহেন্দ্রের নামটিকে। আনন্দে তার চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠলো।

ময়ী রসিকতা ক'রে বললো, 'দেখলে তো, লোকটাকে যদি তোমার ঐ স্থূল দেহ দিয়ে গ্রাস না করতে তা হ'লে আরও কত বড়ো হওয়ার সম্ভাবনাই ছিলো।'

সুভদ্রার চোখ আবার ছলছল ক'রে উঠলো। লেখাপড়ার জন্য মহেন্দ্র যতদিন তাকে যত কথা বলেছে সবগুলোই বোধ হয় তার একে একে মনে পড়তে লাগলো।

বললো সে, 'তুই, ভাই, তোর বড়-ঠাকুরের ঘর গুছিয়ে দিবি। বই খাতাপত্তর গুছিয়ে দিলেই হবে না ; তুইতো কথা বলিস, তুই অনেক লেখাপড়াও করিস, এখন থেকে সন্ধ্যার পর তুই রোজ একটু ভাসুরের কাছে বসবি। নইলে মানুষটা এ ছাই সংসার নিয়ে কি ক'রে বাঁচে বল্ ! মনের মতো একজনকে না পেলে কোনো পুরুষই বাঁচে না।'

'আমি ছোটভাইবউ, মনের মানুষ হবো কি গো ?' কথাটার এ অর্থটুকু চোখে পড়তে সুভদ্রাও লজ্জায় হাসতে আরম্ভ করলো।

ময়ীকে ভাবতে হলো : এত কোমলতা, এমনি মায়ের মতো স্নেহ লুকানো ছিল সুভদ্রার মনে ? যে সুভদ্রা বিজয়িনীর ভঙ্গিতে নিজের প্রতিষ্ঠায় বাস করে সেই সত্যি, না এখন সহসা প্রকাশ হ'য়ে পড়া সুভদ্রা ?

যা আশা করা গিয়েছিলো তার চাইতেও বেশী ঘটলো।

সন্ধ্যায় ছেলেমেয়েকে গান শেখাবার নাম ক'রে মহেন্দ্রের কাছাকাছি এক জায়গায় ব'সে সুভদ্রা গান গাইতে শুরু করলো। অনভ্যাসের ফলে সুভদ্রার গানের গলাটি ধ্বংস হয়েছে, সন্তান-প্রসবজনিত ক্ষয়ে ফুসফুসের আর ক্ষমতা নেই সুরকে পূর্ণ ক'রে তোলার। তথাপি রান্না ঘরে ব'সে ময়ীর মনে হ'তে লাগলো,—সুভদ্রার গানের সুর মহেন্দ্রর বুকের কাছে আশ্রয় নিতে, পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তে, একটি অল্পবয়সী মেয়ের মতো লজ্জাকে জয় করার চেষ্টা করছে।

ক্ষমাও এসেছিলো, বললো 'মাস্টার মশাই ধন্যবাদ দিতে এলাম। বইটি প'ড়ে ফেলেছি বিকেল থেকে ব'সে ব'সে। আলোচনাও হয়েছে সুধীরের সঙ্গে। ডক্টরেট পাওয়ার মতো নতুন কিছু বলা হয়নি বইটিতে। সুধীর বলছিলো লা গাদিয়ের যে স্থান ও দেশের বায়োলজির লিটারেচরে সেটা আপনার প্রাপ্য হয়েছে এদেশে। আমি অতটা বলি না। তা হ'লেও বিজ্ঞানের বই সাধারণের বুদ্ধির আওতায় এনে দেওয়ার প্রথম সম্মান আপনার।'

এই ব'লে ক্ষমা আর একটু খুঁটিনাটি আলোচনা করলো। অবশেষে বললো, 'কিন্তু এত সব করলেন কখন ?'

মহেন্দ্র কিছুই বললো না। গড়গড়ার নলটা—এটা ধরেছে মহেন্দ্র মেদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—আরও একটু আমিরী চালে ধ'রে অতি নরম কুশনে পিঠ রেখে মৃদুমন্দ হাসতে লাগলো।

কোথায় প্রতিভা এ খোঁজ করতে গিয়ে—প্রতিভা নেই তার, সাধারণ সে, এই ব'লে দুঃখ করতে গিয়ে যে সব কথা কখনও মনে হয়েছে, তার কিছু কখনও লিখে রেখেছিলো মহেন্দ্র ; তারই কয়েকটি ছেঁড়া ছড়ানো পাতা যোগ ক'রে সুধীর একখানা বই করেছে, এতে মহেন্দ্রর কিই বা বলবার আছে। বইখানিতে তার যে মনের ছাপ আছে সে মন এখন তার নেই। এখন সত্য বোধ হচ্ছে এই নরম শয্যায় এই মধুরগন্ধি অম্বুরিটি। পৃথিবীতে বাঁচার জন্য সঞ্চয় করতে আর সাধ যায় না, যেমন দুঃখ নেই সঞ্চয় হয়নি ব'লে। ভালো লাগছে ক্ষমার ধন্যবাদ দিতে আসাটা। উপেন্দ্র, ময়ী, ক্ষমা, সুধীর এরা সবাই তার কাছে এসে বলেছে, তুমি কিছু একটা করেছো। এটা তার সন্ধ্যাটিকে খানিকটা রসাল, খানিকটা সবল ক'রে দিচ্ছে। এটাই কি তার সঞ্চয় ?

খাবার ঘরে গিয়ে দেখলো মহেন্দ্র উপেন্দ্রর উৎসাহের আর খানিকটা—এত আয়োজন করেছে। ক্ষমাকে বাড়ী যেতে দেয়নি। সুধীরকেও ধ'রে এনেছে।

মহেন্দ্র হাসিমুখে বললো, 'ব্যাপার কি রে ?'

উপেন্দ্র বললো, 'মানে, বইটি লিখে কিছু টাকা পাওয়া যাবে, তখন তার সৎ ব্যয়ও করা উচিত।'

সুধীর হেসে বললো, 'আগাম হ'লো যে ?'

উপেন্দ্র বললো, 'আগাম সব জিনিসই মধুর। ছেলেকে স্কুলে দিয়ে ভাবি ছেলে বড় হ'য়ে সুধীরবাবুর মতো বিদ্বান্ হবে, আনন্দটা তখনই হয়। ছেলে বড় হ'য়ে কি হনুমান হবে, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করলে আনন্দ হয়, বলুন ?'

উপেন্দ্রর ধরনটাই এই, ভাবলো ময়ী। লোকটি কোলাহল ক'রে নিজের কোমল বৃত্তি জাহির করে না, তার উদাস দৃষ্টি দেখে মনে হয় না কখনও সংসারের খুঁটিনাটি জিনিসে এত তার আকর্ষণ, এত গভীর আস্থা তার জীবনের উপকরণে। মনে হয়, লোকটি যেন খুশী হ'তে শিখেছে সাধনা ক'রে। উচ্ছল আনন্দ নয়,

রসাল স্বল্পপ্রকাশ গভীর খুশি। প্রধান হওয়ার কলা-কৌশল সে আয়ত্ত করেছে। পৃথিবী যাদের কচিৎ আশীর্বাদে নন্দিতা এমন কোন বৃদ্ধ সে হবে। সংসার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান যাদের চোখের কোণে হাসি হ'য়ে ফোটে, ঠোঁটের কোলে ছড়ার ছন্দে স্পন্দিত হয় এমন এক ঠাকুরদাদা হবে সে।

সেদিন রাত্রিতে একটি সাধারণ মেয়ের মতোই বললো ময়ী, 'চোখ বোঁজো তো, গরম লাগছে, জামাটা খুলবো।'

উপেন্দ্রর কাঁধের কাছে মাথা রেখে ময়ী ভাবলো : জীবনের একটা প্রান্ত যেন মহেন্দ্র ধরতে পেরেছে। বেঁচে থাকার সার্থকতা কি এই ধরতে পারাটুকু ? কিম্বা এই ধরার জন্য পথের ধুলোয় যে ক্লান্ত পদচিহ্ন রেখে মানুষ ছুটে চলেছে সেগুলিই সার্থকতা ?

নিজের কথাও সে ভাবলো : লজ্জায় কানের পাশ দুটি লাল হ'য়ে ওঠে যখন মনে হয় স্বাস্থ্যমণ্ডিত দেহটি এখনও উপেন্দ্রর উপাসনার বিষয় হ'য়ে আছে। সাধনা কি এর জন্যই ? মনটা এখনও ভালোবাসার আঁধার ও আলোকে শঙ্কায় ও খুশীতে বিহ্বল হ'য়ে ওঠে উপেন্দ্রের সান্নিধ্যে। এই কি তার বেঁচে থাকার সার্থকতা ? কিম্বা সফলতা এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের প্রতিদিনের ইতিহাস ?

রাগ ক'রে সে সঙ্গিনীকে অনেকদিন চিঠি লেখে নি, তার কথাও মনে পড়লো। একটা মানুষের সাধারণ কতকগুলি শিশুকে লালিত করতে তার সঙ্গিনী জীবনটাকে ব্যয় ক'রে দিলো,—এই অভিমান হয়েছিলো ময়ীর। কিন্তু সঙ্গিনী পাল্টা অভিমান করে নি। অনেক দেরীতে হ'লেও লিখেছে সে। অন্যান্য খবরের মধ্যে এটাও জানিয়েছে সে, বড় ছেলে এবার কোলকাতায় পড়তে আসবে, গরীবের সংসারে টানাটানি হবে। লিখেছে সে : আমি বলেছিলাম—কোলকাতায় তোদের এক মাসি আছে, রাণীর মতো। সে তোদের মায়ের চাইতে কম ভালোবাসবে না। শুনে বড় ছেলেটা তবু আনমনা হয়, ছোটটা রুখে ওঠে। সে বলে—আমি চালাবো দাদার খরচ। আমার ভয় করে, ভাই, এমনি দুর্বল, দুটি ছাত্র পড়িয়ে দাদার খরচের কিছুটা জোগাড় করছে, থাইসিস বা কিছু একটা ধ'রে না ফেলে। আমি কিছু বললে বলে—তুমি বেঁচে থাকো, মা, তুমি গায়ে হাত বুলিয়ে দিও একটু, আমরা পারি না কি ?

সেই পুরনো কথা।

তবু সোহাগে, ঘুমে চোখ যখন মুদে আসছে, ময়ী সঙ্গিনীর কথা বললো উপেন্দ্রকে। বললো সে : 'ওর সংসারটা একবার দেখতে ইচ্ছা করে। ও কি সার্থক হ'লো ?'

তারপর তার নিটোল ঠোঁট দুটো কাঁপলো কোন অভিমানে যা স্নিগ্ধ অলস অনেক গভীর থেকে উঠে আসা অশ্রুর মতো হ'তে পারে।

চৈত্র, ১৩৬৬

সাদা মাকড়সা

তুমি যে প্রশ্নটা করেছো সোজাসুজি তার উত্তর দেওয়া যায় না। কে কখন কি কাজ করে, কেন করে এ যদি বলা গেলো তবে পৃথিবী সম্বন্ধে সব বলা হ'লো, সীমাবদ্ধ করা হ'লো। মানুষের মনকে কি কখনও পরিসীমায় বর্ণনা করা যায় ?

লাভ-ক্ষতির হিসাবে যদি অর্থনীতি বড় হয়, এটা তবে আমার লোকসানের কারবার। স্বাধীন ব্যবসা ব'লে একে যতই তারিফ করি, এতে ভিতসমেত ব'সে যাবার ধ্ব'সে যাবার ভয় আছে। তোমাকে চিঠি লিখতে লিখতে আমি অনুভব করছি (অন্য কোনো কোনো সময়েও করি) : চা-বাগানের ম্যানেজারির বেতন-ভাতা-বোনাস এবং অন্যবিধ পাওনা-যুক্ত চাকরি নিশ্চয়ই আরামপ্রদ ছিলো। একজোড়া মধ্যবিত্ত প্রাণের পক্ষে যথেষ্ট ছিলো জীবন।

তুমি ভাবতে পারো কিছু একটা ঘটেছে, কোনো পীড়াদায়ক ঘটনা। কিম্বা কণ্ট্রাক্টের ব্লুপ্রিণ্টে ছিলোনা এমন কোনো গর-হিসাবী পাহাড় মাথা তুলেছে আমার রাস্তায়। আর সেইজন্যই আমার এই দুঃখের সুর। তা নয় কিন্তু।

বহুদিন আগে যখন ইংরেজি উপন্যাস পড়ার মতো মনের অবস্থা ছিলো, সে সময়ে (এবং একথা মনে আনার মতো মধুর স্মৃতি কি কিছু নেই ?)—একখানি বই আমাদের ভালো লেগেছিলো। মধ্যবিত্ত জীবনের প্রৌঢ় প্রতিষ্ঠার মধ্যে কোথায় যেন কিশোর প্রাণ লুকিয়ে থাকে ; কখনও যৌবনের চপলতায় সে উৎসারিত হ'তে চায়, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠার যে রেশম-গুঁটিতে সে প্রাণ আবদ্ধ, কেটে বেরুনোর পক্ষে তা প্রৌঢ়ের কাছে অত্যন্ত শক্ত। তবু কর্মস্থল, শেয়ার-বাজার ও ক্লাবে ছড়ানো কিছু মর্যাদায় মিশানো দিনের স্বল্প এক অবকাশে একমুঠো এক ফুলের মাঠ দেখে প্রাণ চঞ্চল হয়, আর উল্লেখ করতে পুরুষজাতীয় পক্ষ থেকে লজ্জা অনুভব করছি,—ধোপাদের দড়িতে শুকাচ্ছে এমন স্ত্রীলোকের পরিধেয় দেখে বেহায়া মেয়ের কথা কল্পনা করতে থাকে।

পাহাড়ী রৌদ্রে ক্লান্ত হ'য়ে বড় একটা পরিচ্ছন্ন পাথরে বসেছি। তাঁবু থেকে চার পাঁচশ' গজ এগিয়ে আর রাস্তার যে অংশটায় সিমেণ্টের সঙ্গে চাকা চাকা পাথর মিশিয়ে কজোয়ে গেঁথে তোলা হ'চ্ছে তার থেকে প্রায় ততোটা পিছনে। সম্মুখে

রাস্তা। বাঁ দিক দিয়ে একটা প্রাকৃতিক পাকদণ্ডীর পথে নেমে গেলে একটা পাতা ঢাকা ঝরনার জল তির্‌তির্‌ করে ব'য়ে যাচ্ছে। পাথরের খাঁজে খাঁজে মরচে রঙের জল। জলে পাতা পচে অমন সর প'ড়ে যায়। ঝরনাটার ধারে দু'একটি বড় গাছের গোড়ায় মস্‌ ও ফার্ন জাতীয় কিছু আগাছা। সেখানে সূর্যালোক নেই। বোধ হয় সেখানে নেমে গেলে ঠাণ্ডায় গা শিরশির ক'রে উঠবে। ঐ ফার্নগাছগুলির শীতলতায় ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। ঘড়ির কাটায় এখন দু'টো বাজে দিন। ডানদিক থেকে বহু শ্রমিকের মিলিত কোলাহল কখনও ভেসে আসছে।

পাথরটার পাশে যেখানে আর একটা পাথর লেগেছে সেই সন্ধিস্থলে উড়ন্ত আবর্জনা জ'মে জ'মে সারবান দোআঁশ মাটি তৈরি হয়েছে। কোথায় ছিলো রডোডেন-ড্রনের বীজ, উড়ে এসে সেই মাটিটুকুতে কিশোর একটি গাছ হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু পরিপূর্ণ সার্থকতা পাবে এমন ভরসা করি না। শিকড় প্রবেশ করিয়ে দু'পাশের পাথর দু'টি ফাটিয়ে ধুলো-ধুলো করতে পারলে হয়তো বা সম্ভব ছিলো। গাছটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, দু'টি মাকড়সা চোখে পড়লো। ক্রীড়া অবসান হ'লে তাদের পুরুষটি পাথরের উপরে আছড়ে পড়লো। ভাবলাম মরে গেছে, কিন্তু তার চাইতেও করুণ : ছ'পায়ের চারখানাই ভেঙে গেছে ; প'ড়ে যাচ্ছিলো বলেই গতি, পড়তে পড়তে যে গতি।

টেবল্‌ল্যাম্পের আলোয় ব'সে দুপুরের এই ব্যাপারটা থেকে আমার মনে হচ্ছে জীবনটাই একটা স্ত্রী-মাকড়সা। কিন্তু তারা কি সংখ্যায় একাধিক ? সমাজ-আবদ্ধ জীবন থেকে নতুবা কে আমাকে বাইরে টুইয়ে আনলো ? সমাজ জীবনের উপমা যদি মাকড়সা হয় তবে একি দ্বিতীয় একটি ?

তার স্বরূপ নিজের ক্ষেত্রে বুঝতে পারছি না বটে, গোকুলের ক্ষেত্রে পারি যেন।

আমাদের সেই গোকুলই বটে। অবশ্য তাকে আমি মনে করিয়ে দিইনি ডাকঘরে আমার কাছে লেখা তোমার চিঠিগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য সে তখন কি রকম ক'রে ছুটতো। আমার তাঁবুর পাশে ওর তাঁবু, কিছু না ব'লে এইটুকু অধিকার ওকে আমি দিয়েছি। দুপুরে রোদের কথা বলেছি, এখন হাড় কাঁপানো শীত। রাত দশটা হয়েছে। এ জায়গাটায় তাঁবু ফেলেছি কিন্তু ক্যাম্প করার মতো নয়। কি করা যায় বলো, দু'তিন দিকে পাহাড়ের দেওয়ালের মাঝখানে একফালি অধিত্যকা সর্বত্র পাওয়া যায় না। কাছিমের পিঠের মতো এ জায়গাটা। ক্রমশ উঁচু হ'য়ে সামনের চূড়ার দিকে উঠে গেছে। আমার রাস্তা এখন এই চূড়াকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে। ন্যাড়া পাহাড়ের গায়ে দু'একটা বার্চগাছ মাত্র আছে। হু-হু ক'রে বাতাস বইছে। পাহাড়ী শীতের স্রোত তৈরি হচ্ছে। গন্‌গনে আগুনের ধারে ব'সে চিঠি লিখছি। একটি মজুর মাঝে মাঝে এসে আগুন উস্কে দিচ্ছে। চরাচর নিস্তব্ধ। ঝিঁঝিঁ'র ডাকও শুনছি না। আমার না হয় চিঠি লেখার তাগিদ আছে, গোকুলের কি কাজ ? উকুন ও পিসুপোকা সমেত কম্বল মুড়ি দিয়ে মজুরের দল তাদের

ছোটো ছোটো তাঁবুতে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি গোকুলের তাঁবুতে আলো জ্বলছে। ওর ছায়া তাঁবুর দরজার সামনে নড়ছে। আমি না দেখেও ব'লে দিতে পারি, সারাদিনে কতজন মজুর কত ঘণ্টা কাজ করেছে এবং তার দরুন কত তাদের পাওনা হ'লো এই হিসাব জুড়ছে সে। অত্যন্ত শীতে একভাবে ব'সে থাকতে পারছে না, সেজন্য মাঝে মাঝে উঠে পায়চারি করছে। কিন্তু আমার অন্যান্য টাইমকিপাররা এরকম করে না।.তারা দিনের বেলাতেই তাদের কাগজ নিয়ে বেড়ায়, কাজ হচ্ছে আর টুকে যাচ্ছে। সে সময়ে গোকুলও হিসাব টোকে কিন্তু তার চাইতেও বেশী নজর রাখে কাজের দিকে। কাজ না করলে মজুরদের ধমকায় না; হেসে, গল্প ক'রে, কখনও বা চা এগিয়ে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। এমন নিরলস কর্মী খুব একটা দেখি নি। ওর শ্রমিকদের প্রতি মানবসুলভ ব্যবহারের ফলে অভিজ্ঞ মজুররা ফাঁকি দিচ্ছে। আর তার কাজের উপরে আত্যন্তিক ঝোঁক দেখে আমার মনে হয়েছিলো কাজের হেরফের ক'রে অন্য টাইমকিপারদের চাইতে সে বেশী ভাগ বসাচ্ছে মজুরদের মজুরী থেকে।

কলেজে পড়ার বয়স গোকুলের। যদি তোমার সেই সম্পর্কের খুড়ো বেঁচে থাকতেন তবে বোধ করি ও কলেজেই পড়তো।

সংসারে জড়িয়ে প'ড়ে এই প্রথম যৌবনেই গোকুল নিজস্ব ব'লে কিছু ধ'রে রাখতে পারলো না। ওকে ডেকে আমি বলেছিলাম,—দামী না না হ'ক, কম দামী একটা গ্রেটকোট করিয়ে নিও। এত শীত সইবে না।

খবর নিয়ে জেনেছি ও মাইনার টাকা এক পয়সাও নিজের জন্য খরচ করে না। আমার ফার্ম থেকে মজুরদের জন্য যে খাবারের ব্যবস্থা করেছি সেটাই ওর একমাত্র আহার্য। ক্যাণ্টিন থেকে কেউ কোনোদিন তাকে কিছু কিনতে দেখেনি। পরিজন-হিতৈষণার কুক্ষিগত হয়েছে ও, তাতে আর সন্দেহ নেই।

কিন্তু ওর পাগলামিও আছে। মার্কসবাদী কাগজপত্রে ওর নেশা আছে। ইতিমধ্যে এক কৌশল ক'রে ও মজুরদের মজুরী দৈনিক দু'পয়সা বাড়িয়ে নিয়েছে। খানিকটা তর্ক করেছিলো সে এ বাবদে।

মনে হচ্ছে এই এক দ্বিতীয় ঊর্ণনাভ ওকে পাকে ফেলেছে।

শীত আর সহ্য হয় না। আগুন-পরিচারককে পাঠিয়ে দিলাম গোকুলকে নিরস্ত করার জন্য। কোনো মাকড়সার পীড়নে ঘুম বর্জন করা মহাপাপ।

ব্যালেণ্টাইনের কথা মনে আছে? তার চেহারা হয়তো তোমার মনে পড়ছে না। তোমার বহুদিন ধারনা ছিলো ম্যাগদালেন চা-বাগানের ম্যানেজারি আমি ছেড়েছিলাম ব্যালেণ্টাইনের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে। সেই ঝগড়ার মতো ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু-কিছু তোমার কাছে গোপন করেছি। তুমি এত সব জানলে তোমার মন খারাপ হ'তো। চা-বাগান সম্বন্ধে, যেখানে আমার কৈশোর ও যৌবন কেটেছে, একটা কুৎসিতের ধারণা হ'তো তোমার, ভবিষ্যতের শান্তি বিঘ্নিত হ'তো।

ব্যালেণ্টাইন চা-বাগানে কাজিন সাহেব নামে বিখ্যাত হয়েছিলো। সে চা-বাগানের মালিক দ্বিতীয় জনের সময়েও মাঝে মাঝে আসতো চা-বাগানে। তখন আমার ধারণা ছিলো দুঃস্থ আত্মীয় হিসাবে আর্থিক সাহায্য পাওয়াই তার উদ্দেশ্য। সে চা-বাগানে প্রায় পাকাপাকি থাকবার ব্যবস্থা ক'রে নেয় দ্বিতীয় জনের পুত্র প্রথম হ্যারল্ডের আমলে। দ্বিতীয় জন যখন যুদ্ধ লাগতে-না-লাগতে দেশপ্রেমের প্রেরণায় চা-বাগানের ভার ছেলেকে দিয়ে সিভিক-গার্ডে কাজ করার জন্য হোমে চ'লে গেলো তখনই হ্যারল্ডের সঙ্গে ব্যালেণ্টাইন এসেছিলো। প্রায় মাস ছয়েক ছিলো এক নাগাড়ে।

ব্যালেণ্টাইন ও আমার পূর্ব পরিচয় ছিলো। দ্বিতীয় জনের আমলের মাঝামাঝি সময়ে আমি যখন চা-বাগানের হেড্ গুদাম বাবু ছিলাম তখন সে এলে আমাকেই তার ঘোড়া-দাবড়ানোর সঙ্গী করতো। কারণ হ্যারল্ড তখন তার সিমলার স্কুল থেকে প্রায়ই ছুটি পেতো না।

দ্বিতীয় জন চা-বাগানের ভার হ্যারেল্ডের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে নি, আমার হাতেও অনেকটা কার্যকরী উপায় গ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়ে গিয়েছিলো। চা-বাগান সম্বন্ধে যা কিছু জানাবার সেটা আমিই হ্যারল্ডকে জানাবো, আর হ্যারল্ড ছাড়া আর কেউ যেন চা-বাগানে নাক গলাতে না পারে—এই দু'টি নির্দেশও সে আমাকে দিয়ে গিয়েছিলো। এর ব্যত্যয় হ'লে সে নাকি কবর থেকে উঠে এসেও আমাকে আঘাত করবে। অবশ্য তার কিছু আগে মামার উত্তরাধিকার সূত্রে আমি চা-বাগানের ম্যানেজার হয়েছি।

চা-বাগানের অবস্থাটা তখন এই রকম ঃ শীত পড়েছে, চা-বাগানের অটম্ লিবস্ উঠে গেছে, কাজে ঢিলে পড়েছে ; ম্যানেজার সাহেবের বাংলো এবং সাহেব-মালিকের কুঠির মাঝখানের বড়ো লনটায় টেনিসের নেট পড়েছে। হ্যারল্ড ও ব্যালেণ্টাইন বিকেল হওয়ার আগেই লনে নেমে পড়তো। কখনও কখনও তারা আমাকেও ডাকতো। টেনিসে যত সময় ব্যয় হ'তো তার চাইতে বেশী হ'তো কাগজ খুলে যুদ্ধের আলোচনায়। লনের পাশে সবুজ রঙ্ করা বেতের গভীর নিচু চেয়ারে ব'সে কখনও ওরা জার্মেনিকে নস্যাৎ করতো, কখনও বা পরাজয়ের উত্তেজনায় ওদের মুখের চেহারা বদলে যেতো। ওদের সম্মুখে বেতের টিপয়ে হালকা মদ থাকতো সে সময়ে।

কিন্তু এরকম অবস্থা বেশী দিন চললো না। ভারতে অবস্থানকারী ইংরেজ হিসাবে ব্যালেণ্টাইনের ডাক পড়লো রাজকীয় ভারতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে। যেদিন চিঠিটা এলো সে রাত্রিতে মালিকসাহেবের কুঠির ব্যাঙ্কেট হলের বারে আমি, হ্যারল্ড ও ব্যালেণ্টাইন প্রায় রাত ভোর ক'রে দিয়েছিলাম নানা আলাপ আলোচনায়। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী বাগান প্রায় বারো মাইল দূরে ও সিকি মাইল উঁচুতে। সেখান থেকে বাগানের খোদ মালিক এসেছিলো। সেদিন আমার

অনুভব হয়েছিলো, বীর দেশ-প্রেমিক ইংরেজেরাও যুদ্ধে যেতে ভয় পায়। তাদের বন্ধুজনের মুখও শুকিয়ে যায়। সেদিন আলাপে আলাপে জানতে পারলাম ব্যালেণ্টাইন বুরকি ও এডিনবরার গ্রাজুয়েট। সে এঞ্জিনিয়ার হিসাবে যুদ্ধে যাচ্ছে। লোকটা যে এত করিৎকর্মা তা জানতাম না। ভেবেছিলাম লালমুখো হোঁৎকা গোরাদের আর একটি হবে। এতদিন চা-বাগানে গড়াতো মদ, নভেল আর আলস্য নিয়ে।

ব্যালেণ্টাইন চ'লে গেলে হ্যারল্ড চা-বাগানে মন দিলো। একথা আমার পরিচিতরা সকলেই স্বীকার করবে দ্বিতীয় জন নিজে থেকে যা পারে নি, হ্যারল্ডের রাজ্যে তাও সম্ভব হ'লো। বছরের শেষে হিসাব নিয়ে অভূতপূর্ব লাভের সন্ধান পাওয়া গেলো। হ্যারল্ড নিজে থেকে আমার জন্য একটা মোটর আনিয়ে দিলো। কিন্তু এসব বছরের শেষে; তার আগে হ্যারল্ড ও আমি যেন পুরনো কাগজের মধ্যে সাপ দেখে চমকে উঠলাম।

দ্বিতীয় জনের আমলে একাউণ্ট্যাণ্ট ও ম্যানেজার একই ব্যক্তি ছিল, এবং ব্যক্তিটি আমার মাতুল। কাজেই সত্যের উদ্ঘাটনে আমি এবং হ্যারল্ড প্রায় সমান লজ্জিত হলাম। খরচের ঘরেই বেশী গোলমাল। অনেক স্থাবর সম্পত্তি অর্জনের ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে, এমন কি নতুন একটি কলঘর স্থাপনের ইতিহাস আছে কিন্তু সে সব সম্পত্তি ও কলঘর স্বপ্নসৌধ মাত্র। মালিক ও ম্যানেজারের সহযোগিতা ছাড়া এরকম হিসাব খাড়া করা যায় না।

হ্যারল্ডের বয়স তখন বছর কুড়ি হবে। হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যবান ছেলে, যদিও বলে রাখি: দেখলে একজন পুরো মানুষ ব'লেই মনে হয়। কিন্তু ঠোঁট দুটি ও গাল আপেল রঙের, ঠোঁটের উপরে কমলালেবু রঙের গোঁফের রেখা। চোখ দুটিতে দুষ্টুমি ছিলো, বজ্জাতি ছিলো না।

ব্যাপারটা বিস্ময়েরও বটে। নিজের উঠোনে কে গর্ত খোঁড়ে, সখ ক'রে কে বাগানে লাগায় বিছুটি? কিন্তু হ্যারল্ডের কথায় আমি বুঝতে পারলাম এ সবই করা হয়েছে বাগানের হিস্যাদার তার এক পিসি এবং কাকার এক মেয়েকে ঠকানোর জন্যে।

গভীর রাত্রিতে হ্যারল্ডের শোবার ঘরে ব'সে পরামর্শ হ'লো।

'বোনার্জি, কি উপায়?'

'উপায় এই, যে সব কাল্পনিক খরচ আছে সেগুলোকে সত্যে পরিণত করতে হবে—কলঘর, সম্পত্তি সব।'

'তুমি কি মনে করো, প্রকাশ পাবে না?'

'কাগজপত্র কিছু জাল করতে হবে। প্রকাশ পাবে এক সময়ে কিন্তু ডিবিডেণ্ড সময় মতো পেলে হিস্যাদার সহসা গোলমাল করে না ত।'

'তুমি আমাদের জন্যে এত করতে যাবে কেন?'

'আমার মামার জালিয়াতি টাকার জন্যে। কিন্তু কেন বলো তো ম্যানেজিং পার্টনার জনের এত টাকার খাঁকতি হ'লো ? তোমার মা তো শুনেছি পাদরির মেয়ে, অত্যন্ত স্বল্পব্যয়ী, তোমার জন্যও লাখ-দু-লাখ কিছু খরচ হয়নি।'

হ্যারল্ডের রক্ত এখানে চিড়বিড় ক'রে উঠে থাকবে। কিন্তু সে সামলে নিলো। কোনো কোনো সময়ে ম্যানেজারকে বন্ধু ব'লে মানতে হয় অবস্থার বিপাকে।

সে বোধ হয় দ্বিতীয় জনের এ সব ব্যাপারের কারণটা জানতো কিন্তু জানলেও সব কথা বলা যায় না।

সেদিন থেকে হ্যারল্ড এবং আমি বাগানের ব্যাপারে প্রায় একাত্মা হ'য়ে গেলাম।

কিন্তু ব্যালেণ্টাইনের কথা বলছিলাম।

একদিন হ্যারল্ডের সঙ্গে কথায় কথায় ব্যালেণ্টাইনের কথা উঠে পড়লো।

'ব্যালেণ্টাইন ডিবিডেণ্ডদারদের কেউ নয় তো ? সে তো 'কাজিন' শুনি।

'না।'

'তাকে এসব কিছু বলো নি তো ?'

'পাগল নাকি। তবে ওর কিন্তু পার্টনার হওয়ার লুকনো সাধ আছে।'

বস্তুত ব্যালেণ্টাইন চা-বাগানের খুঁটিনাটি ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহশীল। দ্বিতীয় জনকে সে ভয় করতো কিম্বা তার কাছে পাত্তা পেতো না ব'লে সে তার আমলে চুপ ক'রেছিলো। কিন্তু ভরসা এই সে তখন যুদ্ধের দরুন দূরে আছে।

মানুষ যেটাকে ভয় করে সেটার যেন আগে-আগে ঘটে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে। যুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। একদিন এক ইয়াংকি জীপে চেপে ব্যালেণ্টাইন উপস্থিত। সে একা নয়, সঙ্গে দুজন ইয়াংকি সেনানী। তাদের দু'জনই বরং হ্যারল্ডের সমবয়সী, সবেমাত্র এই দশকের ঘরে এসেছে। ব্যালেণ্টাইন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ।

হ্যারল্ড আমার সঙ্গে লুকিয়ে কোথাও পরামর্শ করবে এমন উপায়ও রইলো না। দিনরাত ব্যালেণ্টাইন তার বন্ধুদের নিয়ে চা-বাগানের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইয়াংকিদের চায়ের খুঁটিনাটি বোঝাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাজে অবৈজ্ঞানিক খবরও দিচ্ছে। হ্যারল্ড দলের সঙ্গে থেকেও নেই। নেহাৎ অতিথি, তাই সকলের পিছনে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সে। টেনিস লনে, যেখানে সেখানে ঘাসের উপরে শীতের দুপুরে গড়ালো তারা। যে জঙ্গলে হরিণও নেই সেটাকেই বাঘের খোঁজে চ'ষে বেড়াতে লাগলো সারারাত। আর হ্যারল্ডের বাপের আমলের মদের ভাণ্ডার নিঃশেষ হ'তে লাগলো।

তারপর একদিন ঘটনাটা ঘটলো। পরের দিন ইয়াংকিদের সঙ্গে ব্যালেণ্টাইন চ'লে যাবে, ছুটি ফুরিয়ে গেছে। কাজেই তারা স্থির করলো পৃথিবী ছিঁড়ে ছিঁড়ে, বাতাস নিঙড়ে আনন্দ সংগ্রহ ক'রে নেবে। এমন হ'তে পারে, জীবনে এই শেষবারের

মতো আনন্দ করার সুযোগ পাচ্ছে তারা। সারাদিনে এক মিনিটের জন্যও বন-জঙ্গল-ঝর্ণা ছেড়ে ঘরে এলো না তারা। রাত্রিতে বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা ছিলো।

আহারের সময়ে নারীদের কথা উঠলো। বিশ-বাইশ বছরের গুটি-কয়েক অনভিজ্ঞ তরুণ। যুদ্ধে ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় তাদের সব বৃত্তিকে অসহিষ্ণু করেছে। বারোমিশেলি সঙ্গ তাদের কিছু ভাষা উপহার দিয়ে থাকবে। তাদের অভিজ্ঞতাকে সেই অশ্লীলতা দিয়ে বিবৃত করতে গিয়ে তারা নিজেদের অজ্ঞাতে যে আর্তি ফুটিয়ে তুলছিলো সেটা কখনও হাস্যকর কখনও বেদনাতুর হ'য়ে উঠলো। তবু রমণী, গৃহ-সন্তান, একটি শান্ত পৃথিবীর মোহ তাদের কাল্পনিক অভিজ্ঞতার মিথ্যা গল্পগুলো থেকে প্রকাশ পেতে লাগলো। তাদের কথায় ফুরিয়ে যাবার আক্ষেপও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হ'লো। মৃত্যু-প্রেত যখন সম্মুখে ও পিছনে তখন নারীর সুকুমার দেহই প্রাণের একমাত্র অশ্বাস এমন একটা দার্শনিক মতের অস্ফুট আভাস ছিলো তাদের আলাপে। প্রেমহীন কামনাতেও একটি লিরিক সৌরভ থাকতে পারে, এটা সেই প্রথম আমার সন্দেহ হয়েছিলো।

তারা ভারতের অ কাশ বাতাস গাছপালা প্রভৃতির সৌন্দর্য নিয়েও আলোচনা করেছিলো এক সময়ে। তাদের সেই আলোচনায় আন্তরিকতা ছিলো। ভারত পৃথিবীর অংশ, পৃথিবী মধুময়। ডেজার্টের আঙুর চুষতে চুষতে এই দুটি আলাপের ধারা সম্মিলিত হ'য়ে আলাপটি ভারতীয় নারীদের পরিচ্ছদের রুচিতে কিম্বা রুচিহীনতায় পৌঁছলো। এদের মধ্যে একজন ছাত্রাবস্থায় কিছুদিন এক চিত্রকরের বাসন ধোলাই-এর কাজ ক'রে থাকবে। কাজেই তার ধারণা ছিলো চিত্রাদি সম্বন্ধে তার কিছু বক্তব্য আছে। সে-ই আলাপটাকে পরিচ্ছদের রুচি থেকে গঠনগত দৈহিক রূপে নিয়ে এলো। খেয়াল হ'লো, প্রস্তাব উঠতেই সেটা প্রায় সর্বসম্মত হ'লো, ভারতীয় নারীর রূপ বিচার ক'রে দেখতে হবে। আমার মনে হয় আলাপটা জার্মেনিতে কিম্বা আমেরিকায় হ'লে তারা সেই দেশের নারীদের সম্বন্ধেই জানতে চাইতো।

ব্যালেণ্টাইন হ্যারল্ডের নাম ক'রে এই সন্ধিক্ষণে ম্যাগদালেনকে ডেকে পাঠালো। কারণ চা-বাগানের এক্তিয়ারে ম্যাগদালেনের মতো সুন্দরী আর কেউ ছিল না।

আমাদের দেশীয় ব্যাপার হ'লে আমরা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণের কথা বলতাম; কিন্তু পয়সা দিয়ে যে দেশে মডেল-ম্যানিকিন পাওয়া যায়—সে দেশের লোক ওরা। একটা ডিভ্যানের উপরে প্রস্তরীভূত ম্যাগদালেনের চারিদিকে খাবার টেবিল সাজানো রুপোর বাতিদানগুলো সাজিয়ে ওরা বিবসনা ম্যাগদালেনকে নিয়ে আলোচনা করলো।

আমি ম্যাগদালেন আসতেই বিদায় নিয়েছিলাম। শুনেছি হ্যারল্ডও মাতাল হবার ভান ক'রে টেবিলে রাখা দুই বাহুর গভীরে মাথা রেখে মটকা মেরে

পড়েছিলো। আর ব্যালেণ্টাইন ইয়াংকি বন্ধুদের পিছনে দাঁড়িয়ে রিভলবার ধ'রে রেখেছিলো। ম্যাগদালেনের চোখের সামনে পাছে মর্ডেলি ভঙ্গিতে থাকতে সে অস্বীকার করে। হ্যারল্ড কয়েকদিন পরে বলেছিলো—আর কিছু নয়, বোনার্জি, সেই রাত্রিতে আমার ডিনার জ্যাকেটের নিচে সোয়েটার ছিলো। কি দুর্জয় শীত! ম্যাগদালেন যে পরদিন নিউমোনিয়ায় মরে যায়নি, এটাই আশ্চর্য।

যাক সে কথা। পরদিন দাবানলের মতো একটা আক্রোশ ছড়িয়ে প'ড়ে। ত্রিশ বছরে সেই প্রথম ধর্মঘট হলো চা-বাগানে। সে ধর্মঘট হ্যারল্ড থামিয়েছিলো। কিন্তু দু'একজন মজুর প্রাণ দিলো, আর ব্যালেণ্টাইন ডান গালের উপরে টাঙির একটা দাগ নিয়ে পালালো। টাঙিটা সবটুকু নামবার আগেই টাঙিচালকের কপালে রিভলবারের গুলি লেগেছিলো।

একথা বলবার কারণ বলি শোন।

দিন দশেক আগে সকালে বিছানায় ব'সে গায়ে কম্বল জড়িয়ে উঠি-উঠি করছি, বাইরে কোলাহল শুনলাম। এ কোলাহলে আমি অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছি। এই সময়েই ডাকবিলি করার লোকটি আসে। স্টোরকিপারের ট্রাক আসে, কখনও কখনও আসে সৈন্য-বাহিনীর ওভারসিয়ার, এঞ্জিনিয়াররা বদলি হ'য়ে। দিনের অন্য সময়ে শত্রুবিমানের পক্ষে কনভয়গুলোকে খুঁজে বার করা যদিবা সম্ভব হয় সকালের কুয়াশা ভেদ ক'রে উপর থেকে তাদের দেখা যায় না। ট্রাকগুলো পরিচিত পথে আলো জ্বেলে ধীর মন্থর গতিতে উঠে আসে। সেই কোলাহল ছাপিয়ে পরিচিত একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

প্রাতরাশের সময়ে গোকুল যাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল সে ব্যালেণ্টাইন। তিন বছর পরে ক্যাপ্টেন ব্যালেণ্টাইন। পথের তদারক করতে এসেছে, কনট্র্যাক্‌টের কাজ কিভাবে এগোচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে খবরদারি করবে। তার সঙ্গে আলাপ ক'রে বুঝলাম A2 সেক্‌সনে গ্যারিসন্ এঞ্জিনিয়ার মেজর 'কার'-এর পরিবর্তেই সে এসেছে।

চা বাগানের জন্‌দের কথা মনে পড়ে গেল। হ্যারল্ডের চিঠি পেলাম আকস্মিক-ভাবে। চা-বাগান ছেড়ে আসবার দু বছরেরও পরে এই সংযোগ। ম্যাগদালেন দ্বিতীয় জনের হোমে যাওয়ার পর কিছুদিন চা-বাগানের গেটগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো। ব্যালেণ্টাইন সেই ব্যাপারটা ঘটিয়ে দেওয়ার পর ম্যাগদালেন হ্যারল্ডের কুঠিতে আশ্রয় নিয়েছিলো। এ ব্যবস্থাটার মূলে আমারই পরামর্শ ছিলো—পুলিসের গোলমাল থেকে তাকে দূরে রাখবার জন্য। ম্যাগদালেন কুঠিতে অধিষ্ঠান হওয়ার পর জেন তাদের সেই বাংলায় ফিরে গিয়েছিলো। তার মদের খরচটা ম্যাগদালেন হ্যারল্ডের ঘরকন্নার খরচের মধ্যে থেকে চালায়। হ্যারল্ড লিখেছে ঃ ম্যাগদালেনকে সে বুঝতে পারছে না। চা-বাগানের অবস্থা ভালো নয়। পিসি ও কাকার ছেলেরা খোঁজখবর নেওয়ার জন্য চিঠিপত্র দিচ্ছে। স্নায়ুগুলো তার ফলে চ'ড়েই থাকে। হ্যারল্ড মদ ধরেছে। তার নিজের ভাষায় সে মাঝে মাঝে বোতল নিয়ে মেঝের ম্যাটিঙে আশ্রয়

নেয়। আর এক বিশেষ রাত্রিতে ম্যাগ্‌দালেন দ্বিতীয় জনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ খুলে না বললে কি হ'তো তা বলা যায় না।

কিন্তু আনুপূর্বিক বলি।

প্রথম জন্‌কে আমি দেখেছি দূরে দূরে থেকে। তখন আমি আট-ন' বছরের স্কুলের ছাত্র ছিলাম। মামার বাড়ি বলতে চা-বাগান। আমার পক্ষে মামার কাছে যাওয়াটা ঠিক সখের বিষয় ছিলো না। আমাদের গ্রামে স্কুল ছিলো না, দাদা বিদেশে থেকে পড়ছেন। দু'জনকেই বিদেশে রেখে পড়ানো সম্ভব কিনা এসব বিষয়ে মা-বাবা ও মামা পরামর্শ করেছিলেন। মামা নিঃসন্তান ছিলেন এবং চা-বাগানের হোমরা চোমরাও বটে।

মামার চা-বাগানে যাওয়ার জংসন স্টেশনেই আমি প্রথম জন্‌কে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করি। অবশ্য তাকে তখনই প্রথম জন্‌ ব'লে চিনতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

ঘটনাটা আজও আমার চোখের সম্মুখে ভাসছে বলতে পারি। তখন সারা দিনের রোদটা প'ড়ে গেছে। ছাদ-ঢাকা প্ল্যাটফর্মে গাড়ি দাঁড়ালে পৃথিবীটাকে স্নিগ্ধ বোধ হ'লো। গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বার ক'রে এদিক ওদিক লক্ষ করছিলাম। প্রথম শ্রেনীর গাড়িগুলোর কাছে সোরাবজির কাঁচা এবং পাকা দাড়িওয়ালা বোয়রা ট্রে নিয়ে ছুটোছুটি করছে। না ক'রে কি উপায়। পর পর কয়েকখানা প্রথম শ্রেণীর কামরায় একাধিক যুরোপীয় যাচ্ছে চা-বাগানের অঞ্চলে। একটির জানলার কাছে একজন বোয় ধমক খেয়ে দাঁড়াতেই সেই জানালা দিয়ে একটি য়ুরোপীয়ের বুক পর্যন্ত দেহটা বেরিয়ে এলো। বোয় অন্য একটা গাড়ি দেখিয়ে কি বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু সাহেব বোয়ের পাকা-পাকা দাড়িগুলো ধ'রে ঝাঁকি দিয়ে গালাগালির তুবড়ি ছুটিয়ে ট্রেটা কেড়ে নিলো। লোকটির দিকে আমার বালক মন আকৃষ্ট হয়েছিলো, জবরদস্ত্‌ সাহেব বটে। চা খেয়ে সাহেব চুরুট খাবার জন্যে গাড়ি থেকে নামলো। এবার তাকে পুরোপুরি দেখার সুযোগ হ'লো আমার। লোকটি সাধারণ ইংরেজের তুলনায় বেঁটে এবং মোটা, খাকির সার্ট ও জাঙ্গিয়া পরা, গায়ের রং কাঁচা ট্যান-করা চামড়ার স্যুটকেসের মতো কিন্তু দানাদার। মনে রাখবার মতো তার দাড়ি গোঁফ, মাথার টাকের চৌহুদ্দির চুলগুলো, সেগুলোর রঙ্‌ নতুন পয়সার মতো। এই প্রথম জন্‌। বুল্‌ জন কিম্বা জন বুলও বলা যায়।

জনবুল বা প্রথম জন্‌ জাহাজে কাজ করতো ব'লে পরে শুনেছি। জাহাজের চাকরি ছেড়ে ম্যাগদালেন চা-বাগান স্থাপন করে সে প্রায় একক চেষ্টায়। প্রথম বছর দশেক কলঘর ছিলো না, বাবুরাও দু'একজন মাত্রই ছিলো। একেবারে প্রথম দিকে হিসাব নিকাশ থেকে কাঁচা চা-এর পাতা অন্য বাগানে বিক্রি ক'রে আনার কাজ পর্যন্ত একা একা সে করতো। এসব অবশ্য শোনা কথা।

এমন কি ম্যাগদালেন সম্বন্ধে তোমার প্রশ্ন মেটাতে যা বলবো সেটাও গোড়ার দিকে শোনা কথা। যদিও ম্যাগদালেনের মা জেন্‌কে এবং তার বাবা ঠাকুরা সিংহকে

আমি দেখেছি। আমি যখন প্রথম চা-বাগানে গেলাম তখন ম্যাগদালেনকে তার রোগা রোগা হাত পা নিয়ে বাগানের লনে, কুলিদের বস্তিতে, স্কুলের কাছে, খেলার মাঠে সর্বত্র একটা রঙীন পোকার মতো ঘুরে বেড়াতে দেখতাম। তার জামা কাপড় খুব উঁচু দরের ছিলো না। আমার যেন মনে পড়ছে তার এক জোড়া কেড্‌স জাতীয় জুতো ছিলো সে সময়ে, আর কালো লালে মিশানো একটা ফ্রক। অন্তত এটাই যে সে বেশী পরতো তা আমি বলতে পারি।

ম্যাগদালেন সম্ভবত আমার সমবয়সী ছিলো। প্রথম প্রথম তাকে আমি মালিকদের একজন ব'লে জানতাম এবং দূরে দূরে তাকে এড়িয়ে চলতাম। লোভও ছিলো তার সঙ্গে মিশবার, কারণ চা-বাগানে নয় শুধু আমাদের নিজেদের গ্রামেও তার মতো কোন সুন্দরী মেয়েকে আমি দেখিনি। তার গালদুটো তখন লাল ছিলো, আর চুলগুলো ছিলো নতুন ঝক্‌ঝকে তামার পয়সার রঙের। তার গালে হিম-বাতাসের ফাট ধরেছিলো, চুলেও হয়তো অযত্নের আঠা ছিলো কিন্তু সে সব লক্ষ্য করার মতো নৈকট্যও তখন অচিন্ত্য ছিলো।

প্রথম যেদিন ম্যাগদালেন ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলো নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিলাম।

আমার কথায় কোনো অসঙ্গতি নেই। তার সেই অতি-পরিচিত কালো-লাল ফ্রক্ ও কেড্‌স জুতো আমার এখনকার চোখে দারিদ্র্য ও অনাদর সূচনা করলেও আমার বাল্যকালে ধন্য হবার পক্ষে বাধা ছিলো না। সে কার মেয়ে, মালিক পক্ষের সঙ্গে কি সম্বন্ধ, এসব বিচারও পরে করেছি। আমার তখনকার মনোভাবের সর্বাপেক্ষা নির্ভুল দিগ্‌দর্শক একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমার লাটিমটা নিয়ে নিঃসঙ্গ মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, ম্যাগদালেন হুপ ক'রে সে লাটিমটা নিয়ে চ'লে গেল। আমরা অনেকটা রাস্তার কুকুরের মতো মানুষ হচ্ছিলাম। অন্য কেউ হ'লে লাটিমটার জন্যে অত্যন্ত হিংস্রভাবেই তাকে আক্রমণ করতাম। চার পাঁচ দিন পরে জলপাইতলা দিয়ে মনমরা হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি লাটিমটা এসে পড়লো আমার পায়ের কাছে। চেয়ে দেখলাম গাছের একটা ডালে ব'সে ম্যাগদালেন পা দোলাচ্ছে।

ম্যাট্রিক পাস করার পর কিছুদিন গ্রামে থেকে মামার ডাক পেয়ে আবার চা-বাগানে ফিরে গেলাম। তখন পৃথিবীটা আমার চোখের সম্মুখে বদলাতে সুরু করেছে। সে সব তরল দিনগুলোর আড়াল থেকে সংসারের কঠিন দিন দু'একটি ক'রে আমার জীবনে অনুপ্রবেশ করতে সুরু করেছে। কলেজে পড়া হবে না এ কথা যেদিন স্থির হ'লো, কিম্বা যেদিন জানতে পারলাম নিঃসংশয়ে ম্যাগদালেন মালিক পক্ষের সঙ্গে যে নোংরা সূত্রে আবদ্ধ সে সংযোগকে অস্বীকার করাই উচিত, এমন ধরনের দিনগুলোর অনুপ্রবেশের কথাই বলছি।

আমি জানতে পেরেছিলাম ম্যাগদালেনের মা জেন ম্যাগদালেনের মতো মেমসাহেব নয়। তারা ক্রিশ্চান বটে, ভারতীয়ও বটে কিন্তু তারা আমার পরিচিত

কোনো ক্রিশ্চান সম্প্রদায় কিম্বা ভারতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে না। এখন আমার মনে হয় তাদের জাত ছিল 'চা-বাগানী'। আদিতে জেনের পূর্ব পুরুষ ও পূর্ব-নারীদের মানবগোষ্ঠীর কোন শাখাতে সম্বন্ধ ছিলো এ খুঁজে বার করা আর সম্ভব নয়। ভাষা, আকৃতি, পরিচ্ছদ, ধর্মাচরণ সব কিছুতেই চা-বাগানের ছাপ পড়েছে। সেই এক অদ্ভুত সংস্কৃতির মধ্যে হিমালয়, লুসাই, রাজমহল, বিন্ধ্য পাহাড়ের আচার-অনাচার-গুলো অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গেছে। জেনকে আমি যখন দেখেছি তখনও তার বয়স যৌবন সীমাতেই আছে। তখনও তার দেহবর্ণ চাঁপার মতো ছিলো। সাধারণ শ্রমিক রমণী ছিলো না সে, কিন্তু তার পরিচ্ছন্নতা ও রুচি অসাধারণ শ্রমিক রমণীর পক্ষেও অসাধারণ ছিলো।

জেনের স্বামী ঠাকুরা সিম্বার ধর্মমত ইত্যাদি আমার কাছে আরও দুর্নির্ণেয়। কেউ বলে সে মণিপুরী, কেউ সংশোধন ক'রে বলতো মণিপুরী নয়, কাছারী। যে একটু বেশী জানার দর্প রাখে সে বলে—লুসাই পাহাড়ের এক চা-বাগানে ওর বাবা এর আগে ছিলো বটে, আসলে ওরা নাগা। কেউ যদি বলতো নাগা নয়, দাফলা কিম্বা আবর, কিম্বা প্রকৃতপক্ষে সদিয়া সীমান্তের ওপার থেকে আসা চাইনিজ ছিলো তার মাতৃগোষ্ঠী—আমার তর্ক করার কিছু নেই। ঠাকুরা সিম্বা কেমন ক'রে একটা নাম হয় তাও জানিনা। আমার মনে আছে ঠাকুরা সিম্বার মাথায় মধ্যদেশীয়দের মতো একগোছা শিখা ছিলো। সে প্যান্ট কোট পরতো না, জেনকে ভালোবাসতো, মদ গাঁজা খেতো। সে অত্যন্ত অলস ছিলো এবং প্রকৃতিতে অত্যন্ত হিংস্র ছিলো। আমি তাকে জ্যান্ত হাঁস মুরগীর পালক ছাড়াতে ছাড়াতে সেগুলোকে একতাল কম্পিত মাংসে পরিণত করতে দেখেছি, এমন কি একটি পাঁঠাকে গলা টিপে শ্বাসরোধ ক'রে মেরে ফেলতে। শেষদিকে সে কাজকর্ম কিছুই করতো না। প্রকাশ্যে সে একজন কুলির মেট ছিলো, কিন্তু কুলিদের সঙ্গে যাওয়া দূরের কথা, ঘর থেকেই সে অধিকাংশ সময় বা'র হ'তো না। যখন হ'তো তার কোমরে ঝোলানো থাকতো হাত দেড় দুই লম্বা লোহার খাপে ভরা ভোট-তরোয়াল বা তিব্বতীয় ধরনের ছোরা, মুখে থাকতো ঘাসের ডাঁট। সে সর্বত্র থুথু ফেলতো এবং তার অমার্জিত লালচে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়তো। বিশেষ ক'রে আমাকে দেখলে তার ট্যারচা চোখ দুটি বিরলরোম ভ্রূর তলে আরও বাঁকা হ'য়ে যেতো—অন্তত এরকম একটা অনুভব যে আমার হ'তো, তা আমার মনে পড়েছে।

লোকে যেদিন এই লোকটির সম্মুখেই আমাকে বললো তোমার ম্যাগদালেনের বাবা, তখন সে হাসলো বটে, তার গোঁফহীন ঠোঁট দুটি বিস্তৃত হ'লো অন্তত। আমার মনে হয়েছিলো সন্তানত্ব কারো কারো জীবনের অভিশাপ হ'তে পারে। এবং যেদিন আমি বুঝতে পারলাম, প্রকাশ্যে কেউ না বললেও, প্রথম জন-ই ম্যাগদালেনের জনক, আমি যেন সেই বেআইনী পরিচ্ছন্নতায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলাম।

ম্যাগদালেন প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র শিক্ষার সুযোগ পায় নি। চা বাগানের

কাছাকাছি একটিমাত্র স্কুলে মজুরদের ছেলেমেয়েরা আর চা বাগান থেকে কিছু দূরে যে বড়ো স্কুলটি তৈরী হ'য়ে উঠেছিলো সেখানে চা-বাগানের ভদ্র শ্রেণীর কর্মচারীদের ছেলেরা পড়তো। ম্যাগদালেন কাছের স্কুলের মতো নিচুতে নামতে পারলো না, দূরের স্কুলের মতো উঁচুতে উঠতেও পারলো না। সে এ-বি-সি শিখেছিলো কিনা সন্দেহ। কিন্তু তার মুখে যে-কোনো ভাষার চাইতে সহজে ইংরেজিই আসতো। অবশ্য সে সরলরেখা বা বিন্দু সম্বন্ধে কোন কিছুই জানতো না। সে জানতো না অশোক কিম্বা আলফ্রেড কোন দেশের রাজা ছিলেন, কিম্বা আদৌ রাজা ছিলেন কিনা। কিন্তু সে জানতো নখ পরিষ্কার রাখতে হয়, স্নান করার সময়ে গাত্রমার্জনা করতে হয়, সকালে বিকেলে মুক্ত বায়ুতে বেড়ানো ভালো। সে আরও জানতো কাউকে অনুরোধ ক'রে যত সহজে কাজ করিয়ে নেওয়া যায় হুকুম দিয়ে তা যায় না। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি ঝগড়ার সূত্রপাতেই কাজ আছে ব'লে উঠে যাওয়া যে একান্ত প্রয়োজন এও সে জানতো, যেমন জানতো ধন্যবাদ দিতে। সর্বোপরি সে জানতো প্রয়োজন হ'লে সে চোখে বিদ্যুদ্ভাস আনতে পারে। অন্যসময়ে তার দৃষ্টিতে বয়ঃসন্ধির বিস্মিত সারল্য আয়ত হ'তো।

কিন্তু সে সকলের চোখে আদর্শ মহিলা ছিলো না। সে প্রথম জনের কুঠি থেকে সাবান চুরি করেছিলো আর একটা আধ-পুরনো তোয়ালে, আমাদের স্কুলের ছেলেরা যেমন পেয়ারা চুরি করতো। সাবান চুরি করার জন্য প্রথম জন্ ম্যাগদালেন-কে ঘুষি মেরেছিলো, চার পাঁচদিন তার ঠোঁট দুটো নীল হ'য়ে ফুলে ছিলো। সে আর একবার প্রথম জনের বিছানা-ঢাকার ফুলদার ব্রোকেড চুরি ক'রে জামার মাপে কেটে ফেলেছিলো। সেদিন ঘোড়ার চাবুক দিয়ে প্রথম জন্ শাসন করেছিলো তাকে। তার হাত পা কেটে কেটে গিয়েছিলো চাবুকে।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে ম্যাগদালেনের কিছু কিছু খবর পেয়েছিলাম। চা-বাগানের পাশে একটা ছোট নদী ছিলো। বর্ষাকালে ছাড়া অন্য সময়ে বড়ো বড়ো পাথরের টুকরোয় লুকনো একটা সংকীর্ণ ঝরনা হ'য়ে থাকতো সেটা। তীরে কয়েকটা জলপাই গাছ ছিলো। একটা দুটো কাঠ-বাদামের গাছও বোধ হয়। দুপুরে এখানে চা-বাগানের ধোপা দড়ি টাঙিয়ে কাপড় শুকাতো। ধোপারা চ'লে গেলে কাঠবিড়ালিরা আসতো। আর সেখানে সাদায় লাল ছোপ দেওয়া একটা বুড়ো পাহাড়ী গাই জাবর কাটতো। সেখানে গিয়ে আমি বসতাম অনেক সময়ে। তেমনি বসেছিলাম, এমন সময়ে ম্যাগদালেন এলো। কোন কথা থেকে আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম এতদিন পরে মনে পড়ার কথা নয়। ম্যাগদালেন এক সময়ে কাঁদতে কাঁদতে তার সর্বাঙ্গের চাবুকের দাগগুলো দেখিয়েছিলো। ভাল কথা, দৃশ্যটা মনে পড়ায় আমি মনে স্থির করেছি উত্তপ্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিলো সে, উত্তেজিত হ'লে লজ্জা-সঙ্কোচ ব'লে কিছু তার থাকতো না।

প্রথম জন্ সম্বন্ধে অনেক কুৎসিত কথা ব'লে অবশেষে সে বললো,—তার মা

জেনের সঙ্গে প্রথম জনের ভাব আজই শেষ হবে। আজ এক হাত হ'য়েই যাবে। জেন বলেছে তারা আর এই চা-বাগানে থাকবে না, দেশে চ'লে যাবে। কোথায় তাদের দেশ ? জেন মিথ্যা ছেলেভুলানো গল্প বলেছে কিনা ? না, তা নয়। জেন নিজেও কোনোদিন যায় নি। কিন্তু তা হ'লেই মিথ্যা হ'য়ে যায় না। 'তিন রাজার তিন নিশান পোঁতা আছে।' সেই নিশানকে পিছনে রেখে দাঁড়ালে ডুবন্ত সূর্যের আলোয় সেই দেশের প্রথম পাহারাদার জঙ্গল চোখে পড়ে। সেই পাহাদারের পর নদী, নদীর পরে পাহাড়। সেই পাহাড় বেয়ে উঠলে যে দেশ সেই দেশ জেনদের। জেন তার ঠাকুরমার মুখে শুনেছে এবং জেন নিজেই ম্যাগদালেনকে বলেছে।

বলা বাহুল্য জেনরা চ'লে যায় নি। না চ'লে যাওয়ার অন্য অনেক কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে প্রথম জনের ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন দেখা দিলো। ম্যাগদালেনকে চড়চাপড়টা মারলেও আদর করতো সে। জেনের জন্যে আনা ছাপা-ছিটের গাউন ম্যাগদালেনের গায়ে উঠলে প্রথম জন্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতো না। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে পড়ছে। লোকে বলতো নিজের মেয়েকেও ওভাবে আদর করা বিসদৃশ। তখন সে স্ত্রীলোক হয়েছে তো বটে।

প্রথম জনের পুত্র দ্বিতীয় জনের আমলে ম্যাগদালেনের বয়স ছিলো সতের থেকে ত্রিশ। এবং একথা প্রথম দিকে চাপা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সকলেই জানতো দ্বিতীয় জন ম্যাগদালেনকে উপপত্নী হিসাবে গ্রহণ করেছে। এ সংবাদটা এত পরিজ্ঞাত ছিল সকলের যে এ নিয়ে কেউ আলাপও করতো না। ম্যাগদালেন-কে দ্বিতীয় জনের পাশে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে সকলেই দেখেছে, যেমন দেখেছে তাকে দ্বিতীয় জনের শিকারের সাথী হতে। শেষদিকে চা-বাগানের ব্যাপারেও দ্বিতীয় জনকে ম্যাগদালেনের সঙ্গে পরামর্শ করতে দেখা যেতো। তাই ব'লে মনে ক'রো না ম্যাগদালেন মালিক কুঠিতে কোনদিনই স্থান পেয়েছিলো। সেখানে হ্যারল্ডের মা রেনির অপ্রতিহত প্রতাপ ছিলো। এবং সে যখন গরম পড়লে সিমলায় চ'লে যেতো কিম্বা হোমে তখনও সেখানে প্রৌঢ়া গৃহকর্ত্রী জেনই রাজ্য চালাতো। ম্যাগদালেন থাকতো মজুর বস্তির শেষে পাহাড়ের গায়ে সেই নিঃসঙ্গ পুরনো বাংলোয়। কাঠের পাটাতনের উপরে শ্যাওলায় কালচে হ'য়ে আসা সাদা সেই বাংলোটি প্রথম জনের আমলে তৈরী হয়েছিলো ম্যাগদালেনের মা জেনের জন্যে। দ্বিতীয় জন্ বন্দুক কাঁধে খরগোস বধে বেরিয়ে শিস্ দিতে দিতে কোনো কোনো বিকেলে আসতো এই বাংলোয়। কিন্তু হরিণ কিম্বা শুয়োর শিকারের সুযোগ এলে জন্ ও ম্যাগীকে দেখা যেতো চা-বাগানের লনের উপর দিয়ে পাশাপাশি দুটি বে-রঙের ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে যেতে। তখন ম্যাগীকে অত্যন্ত উদ্ধত এবং মালিকী ভঙ্গিতে ঘোড়ায় সওয়ার হ'তে দেখা যেতো। আমার এরকম একটা স্মৃতি আছে ঘোড়া দুটি যেমন দাঁড়িয়ে থেকে চলার জন্যে অধৈর্য প্রকাশ করতো নিকেলের

সাজগুলো পিয়ে তেমনি ম্যাগীও করতো ঘোড়ার পিঠে ব'সে তার লাল চুল ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে কপাল থেকে সরিয়ে।

আমার মনে পড়ছে কখন যেন শুনছিলাম যে ম্যাগীর চুলের বাল্যের সেই ব্রোঞ্জ রঙ্ একসময়ে ক্রমশ ময়লাটে খড়ের রঙ্ নিয়েছিলো। ম্যাগী তখন চুলগুলোকে মেহেদি দিয়ে রাঙিয়ে লাল টকটকে করেছিলো আবার। ইংরেজ মেয়েরা এ কৌশল জানে কিনা সন্দেহ।

পিতা থেকে পুত্রে। দ্বিতীয় জন্‌ও তার ঘোড়ার চাবুক ব্যবহার করতো। এবং একদিন আমিই তার প্রমাণ পেলাম।

অত্যধিক গরম পড়েছিলো। রেনি পাঁচ ছয়দিন আগে সিমলায় পালিয়েছে। দ্বিতীয় জন্ নিজে মোটর চালিয়ে তাকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসেছে। ফিরে এসে চা-বাগানের দরজায় ম্যাগীর সঙ্গে দ্বিতীয় জনের সাক্ষাৎ হ'লো। তারপর থেকে চার পাঁচদিন রোজ তারা শিকারে বেরুলো। অন্যান্যবার যা দেখা যায় নি, এবার ম্যাগীর হাতে তেমন একটা হাল্কা ধরনের শট্‌গান দেখা দিয়েছিলো।

এরকম একটা দিনের বিকেলে স্নান করার অপ্রাত্যহিক একটা ইচ্ছা অনুভব ক'রে আমি চা বাগানের পিছনের ঝরনাটার স্বচ্ছ জলে স্নান করতে গিয়েছিলাম। লোক পরম্পরায় শুনেছিলাম ভিজে বালি ও পায়ের-পাতা-ডোবা জলের স্রোত ধ'রে চললে বর্ষায় নদীটা যেখানে পাক খায় এবার নাকি সেখানে একটা স্বচ্ছ জলের দহ পড়েছে দেখা যাবে। স্নানের চাইতেও দহটাকে উপভোগ করার ইচ্ছাই বেশি ছিলো আমার।

স্নান ক'রে উঠে বাগানের দিকে আসছিলাম। পশ্চিমের আকাশ তখন বটিচেলির ব্যবহার করা লাল রঙে ছেয়ে গেছে। আমার ছোটোবেলাকার জলপাই গাছগুলো এখন আরও বড়ো হয়েছে। কাঠ-বাদাম গাছ দুটির একটি ঝড়ে প'ড়ে গেছে, অন্যটির গোড়া থেকে দু'তিন হাত উঁচুতে একটা গর্ত হয়েছে। একটি কাঠ বিড়ালি তা থেকে উঁকি দিচ্ছে ব'লে আমার ধারণা হয়েছিলো যেন। অবশ্য সেটা একটা শুকনো পাতাও হ'তে পারে। একটা কুকুরের গলার বাকলসে বাঁধা ঘুণ্টির শব্দে ঠাহর ক'রে দেখলাম জলপাই সারির তল দিয়ে ম্যাগদালেন মাথা নিচু ক'রে হেঁটে আসছে, আর তার কালো পুডল্‌টা শিকল থেকে ছাড়া পেয়ে তার আগে আগে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে।

অভ্যাসমতো বললাম, 'হ্যালো।'

ম্যাগদালেনকে খানিকটা সমীহ সকলেই করে, আমাকেও করতে হ'তো, কারণ সেটা তখনও হ্যারলডের যুগ নয়। এবং এটা ম্যাগদালেন বুঝতো ব'লে সে আমাদের সম্ভাষণে গ'লে যেতো না, গাম্ভীর্য রাখতো। কিন্তু সে নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধেও সজ্ঞান ছিলো ব'লে বিদ্রূপ আকর্ষণের ভয়ে কখনও উন্নাসিক হ'তো না।

সে সাধারণত হেসে কিম্বা হা-ডু-ডু ব'লে চ'লে যায়। আজ সে দাঁড়িয়ে পড়লো।

আমি বললাম, 'তোমাকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে।'

'যেন তার যথেষ্ট কারণ নেই!'

কারণ শুনবার আগ্রহ আমার প্রকৃতপক্ষে ছিলো না, কিন্তু অপর পক্ষ জানাতে উৎসুক ছিলো। সে বললো, 'তোমার মনে পড়ে, বোনাজি, অনেকদিন আগে এই জলপাই গাছগুলোর তলাতেই আমার সারা গায়েয় দাগগুলো তোমাকে দেখিয়েছিলাম?'

জলপাই গাছগুলো দেখে অন্তত মনে পড়ে নি সে ঘটনা আমার মনের কাছে এত দূরে ছিলো। কিন্তু মনে করিয়ে দেওয়াতে বললাম, 'তা মনে পড়ে, দুষ্টু ছিলে তখন।'

'আর এখন?'

'এখন নিশ্চয় বুদ্ধি হয়েছে।'

'এগুলো তা হ'লে কি?'

দেখলাম ম্যাগদালেনের বাহুতে চাবুকের দাগে দাগে দু'এক জায়গায় রক্ত শুকিয়ে আছে। আমার মনে তবু করুণা এলো না। তখন মনে হয়েছিলো নোংরা মেয়ের চাইতে বেশী নয় ম্যাগদালেন। কিন্তু কৌতূহল হ'লো। ভাবলাম হয়তো টাকা পয়সা চুরির চেষ্টা করেছিলো। তার হয়তো মনে পড়েছিলো ছোটবেলায় তার এরকম শাস্তি হ'তো চুরির জন্যে এটা অনেকেরই জানা আছে। পাছে সেরকম কিছু কল্পনা ক'রে নেই সে জন্যে সে বললো—'এবং এত সব কেন? না—রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো একটা ভিনেএটে হাত দিয়েছিলাম। আমার বাংলোয় যখন তাকে কোট পরিয়ে দিচ্ছিলাম তখন সেই হাতির দাঁতের ভিনেএট্টা প'ড়ে গিয়েছিলো। তুলে দিয়েছিলাম, তুলে দিতে দিতে নিজের চোখের সম্মুখে ধরেছিলাম।'

'জনের স্ত্রী?'

'কখ্খনো না। হ্যারলডের মাকে আমি চিনি। এ মেয়েটি খুব সুন্দরী, খুব বড়ো ঘরের। বিলেতেই থাকে। আর এর পিছনে অজস্র টাকা খরচ করছে জন্। হ্যারলডের মা রেনি এবার সিমলা থেকে ফিরলেই আমি ব'লে দেবো। বলো ফটোতে আমি হাত দিলেই কি তা অপবিত্র হ'য়ে যায়? সে তো অন্য আর একজনের স্ত্রী।'

'সে জন্যে নয় সম্ভবত। বোধ হয় রুপোর ফ্রেমে দাগ লাগে আঙুলের।'

'তুমি ভেবেছ রুপোর? নিকেল, নিকেল। আর হাতির দাঁতও নয়। কোনো বুড়ী গাইয়ের মরা হাড়ে তৈরী। আর তখনও আমার বালিশে জনের মাথার ছাপটা সমান হয় নি।'

খানিকটা সময় চুপচাপ। আমার একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিলো। আমার মনে হচ্ছিলো কেউ যদি আমাদের এখন আবিষ্কার করে, কি ভাববে। চারিদিকে সন্ধ্যার

নির্জনতা নেমে এসেছে। আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ম্যাগ্‌দালেনের কথাগুলো যতই চাপা গলায় হ'ক, তা উত্তেজনায় আতপ্ত, অশ্রুহীন নিরুদ্ধ-প্রায়। সে যদি দ্বিতীয় জনের স্ত্রী হ'তো তা হ'লে যে রকমের পরিস্থিতি আমার বড়ো গলা ক'রে বলার মতো হ'তো, ম্যাগ্‌দালেনের ক্ষেত্রে সেটাই গোপন করার মতো হ'লো।

কিন্তু তাকে একেবারে উপেক্ষা করেও যেতে পারি নি। সম্ভবত সে এবং আমি এবং সকলেই এই চা-বাগানের আশ্রিত জীব—এই স্বাজাত্যবোধ আমার চিন্তার কোথাও লুকিয়ে ছিলো।

ম্যাগ্‌দালের বললো এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই কথাটা আমারও মনে পড়েছিলো, 'আচ্ছা, বোনাজি, তিন রাজ্যের নিশান একই জায়গায় পোঁতা এ বোধ হয় রূপকথা, না ?'

'না, অসম্ভব কি, পাশাপাশি তিনটি রাজ্য যদি একই জায়গায় এসে মেশে তবে তা হ'তে পারে।'

সে তিক্ত হেসে বললো, 'তা আমিও বুঝি। পৃথিবীতে এ রকম কোথায় আছে ?'

আমার ভূগোলের জ্ঞান বলার মতো না হ'লেও লাল রঙে আঁকা ভারতের মানচিত্র আমার মনে পড়লো। এবং অন্তত তিন জায়গায় ভারতের সীমান্তে এরকম সম্ভব ব'লে মনে হ'লো। সদিয়া লেডোর দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে ব্রহ্ম, চীন ও ভারত একই বিন্দুতে মিশেছে। কথাটা বলতে বলতে আমিও বিস্মিত হ'য়ে ভাবলাম তা হ'লে ম্যাগ্‌দালেনের পূর্বপুরুষ কি সদিয়ার কাছে হিমালয়ের কোনো লুকানো গ্রাম থেকে এসেছিলো ?

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি ভাবলাম,—তা হ'লে কি তার অপমানিত হওয়ার মতো আত্মা আছে—যে আত্মা নিজের চিরকালের জন্যে হারানো জন্মভূমির জন্যে কাঁদছে ?

দূর হ'ক গে, ব'লে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে একটা কলরব কানে এলো। বেতনের দিন রাত্রিতে কখনও কখনও হল্লা হয়, মাঝে মাঝে গান বাজনার আসরের সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু এ কলরবটা নতুন ধরনের। আমার ব্যক্তিগত চাকর বাবুলালকে ডেকে পাঠিয়ে দিলাম খবর করতে। ব'লে দিয়েছিলাম বিশেষ কিছু বলার না-থাকলে রাত্রিতে খবর দেওয়ার চেষ্টা যেন না করে। সে দু'এক ঘণ্টা বাদে ফিরে এলো খবর নিয়ে। অস্বস্তিতে ঘুম পাতলা ছিলো। পায়ের শব্দে জেগে বললাম, 'কি রে এত দেরি ?'

'তামাশা।'

'কি তামাশা ?'

'ম্যাগ্‌দালেন মেম খড় দিয়ে এক মানুষ তৈরী ক'রে আগুনে পোড়ালো আর কুলিদের মেট থেম্বা ফুদং লামাদের মতো চুঙ্গি টুপি প'রে ব'সে দসাং থাসাং ক'রে মন্ত্র পড়ছিলো।'

মনের মধ্যে খচ্ করে উঠলো। কিন্তু একটা অমায়িক হাসি টেনে এনে বললাম, 'ঘুমোগে যা। যত সব জঙ্‌লি।'

এই চা-বাগানের ধর্ম—লামার মন্ত্র, তান্ত্রিক অভিচার, খ্রীষ্টানী হোত্রী।

কিছুদিন পরে এক সকাল দশটায় স্টেশন থেকে ফিরছিলাম, মাটির পথের দু'ধারে বুক সমান উঁচু আগছার জঙ্গল। মোড় নিতে একদল ভেড়া-দুম্বার পিছনে পড়লাম। ধুলো থেকে বাঁচবার জন্যে আগাছার জঙ্গলের একটা গলি পথে গাড়ীটাকে ঢুকিয়ে দিলাম। সামনে একটা অনাবাদী মাঠ, কখনও সেটায় গলফ্ চলে. সেটা পার হ'লেই ভেড়ার দলের আগে গিয়ে রাস্তায় ওঠা যাবে। হঠাৎ দু'তিনটে হাউণ্ডের ইয়াপ্ ইয়াপ্ শুনে বুঝলাম কোনো জন্তুকে তাড়া করেছে তারা। দিকটা ঠিক করার জন্যে এদিক ওদিক চাইতে পরিষ্কার মেয়েলি গলার উঁচু হাসি কানে এলো। তারপর অবশ্য ম্যাগীর লাল মাথা আর দ্বিতীয় জনের শিকারের টুপি সমেত তার জ্যাকেটের পিঠও চোখে পড়লো।

কিন্তু হ্যারলডের চিঠির কথা বলছিলাম। অত্যন্ত তীর্যক ভাষায় দ্বিতীয় জন্ ও ম্যগ্‌দালেনকে কষাঘাত করেছে হ্যারলড্, নিজেকেও বাদ দেয়নি। অবশেষে লিখেছে : বোনাঁজি, এই এত বড়ো পৃথিবীটায় আমার সব কথা ব'লে একই আগুনের পাশে বসতে পারি এমন বন্ধু তুমিই আছো। যদিও এখনও তোমাকে মনে মনে বর্বর জাতীয় একজন ব'লেই চিন্তা করি।

তারপর আবার দ্বিতীয় জন্‌কে টেনে এনে বলেছে : তার খবর সে পেয়েছে। হ্যারলডের মা তাকে ডাইভোর্স করেছে কিন্তু দ্বিতীয় জনের ভাগ্যের কিছু উন্নতি হয় নি। সে তার কল্পলোকের লেডি টাইটেনিয়ার সঙ্গ পাচ্ছে বটে, ঘর বাঁধবার কোন সুযোগই পাবে না। লেডিরা ভিন্ন জাতে বিয়ে করে না। তার মা রেনি লিখেছে : বুড়ো এর চাইতে ম্যাগীকে নিয়ে যেমন শিকারে যেতো সেই ভালো ছিলো। তাতে অন্তত আমি আর তুমি বঞ্চিত হই নি। তাকেও অবশ্য আমরা বঞ্চনা করি নি। কিন্তু আরও কিছু লিখবার আগে, আমার জানা দরকার তোমার জনককে ডাইভোর্স করার পরেও এখনও তোমার কাছে আমি মা কি না। অবশ্য আমি তোমাকে জনের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইনে। তার বাবা দ্বিতীয় জন্‌ও লিখেছে : রডি যা ঘটে গেছে তার আর চারা নেই। আমার ইচ্ছা তুমি আমার এবং রেনির দু'জনেরই থাকো।

দ্বিতীয় জনের বয়স এতদিনে পঞ্চাশে উঠলো বোধ হয়। ইংল্যাণ্ডে, শুনেছি, আজকাল ব্লিথস্‌ক্রিগের দৌরাত্ম্যে মানুষের প্রাণমূল বিশীর্ণ। সেই দেশের থেকেই এই কাহিনী। হ্যারলডের চিঠি পড়তে পড়তে মনে হ'লো মানুষের উদ্ধারের কোনো আশাই আর নেই।

হ্যারল্ডের অন্য বক্তব্য ঃ আমার তো মনে হয় মাঠে যেখানে ইতস্তত কাউস্লিপ ও ডেইজি ফুটে উঠেছে সেখানে এক য়ুরোপীয় গ্রীষ্মের দিনে কোনো হপ্-মাতাল চাষী ছেলে এক রঙচঙে মাকড়সা দেখতে দেখতে ঝিমুচ্ছিল, প্রেম কথাটা তারই সৃষ্টি।

তোমাদের ম্যাগদালেনকে দেখেও আমার একদিন মাকড়সার কথা মনে হয়েছিলো। রেল স্টেশনে গিয়েছিলাম। সময়টা অটম্। অনুজ্জ্বল সোনালি পাতা গাছ থেকে ঘুরে ঘুরে পড়ছে। পথের ধারে সাদা রঙ্ করা চা-বাগানের গেট। ধুলোয় রাঙানো বিকেলের আলোয় দেখলাম ম্যাগী গেট ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। যেন ইংল্যাণ্ডের কোনো খামারের স্টাইল গেটে কোনো পেগী প্রেমিকের অপেক্ষা করছে। আমার মনে হ'লো সে আমারই প্রতীক্ষা করছে।

কিন্তু যখন কোনো মধ্যরাত্রিতে নিঃসঙ্গ সুপ্রশস্ত ব্যাঙ্কেট হলের কোনো গদি আঁটা চেয়ারের সম্মুখের মেঝের ম্যাটিং থেকে ম্যগী আমাকে তুলে খাড়া ক'রে আমার শোবার ঘরের দিকে নিয়ে যায় তখন তার কাঁধ ধ'রে চলতে চলতে তাকে কমরেড ব'লে অনুভব করার মতো মনের অবস্থা যেন হয়, যদি সে মনের কোনো অবস্থায় পরিবর্তন হওয়ার ক্ষমতার গল্পে তুমি আস্থা রাখতে পার। আর একদিন, বোধ হয় সেদিন নেশা ততটা প্রগাঢ় হয় নি, ম্যাগীর কাঁধ ধ'রে যেতে যেতে হাতের তলায় তার নিরাবরণ কাঁধের কাঁচা মাংসের স্পর্শ পেয়েছিলাম। ম্যাগী আজকাল হাল ফ্যাসানের গাউন পরে। ভাগ্যে সে এবং আমি দ্বিতীয় জনের পরিচিত এবং এ পরিচয়ের কথা আমাদের দুজনেরই জানা আছে।

অনেক বড় চিঠি হ'লো। এখন ঘুমোতে যাবো।

গোকুলের বাড়ির খবর জানা থাকলে দিও। বাড়ির খবর না পেয়ে ও মনমরা হ'য়ে আছে।

আমার তাঁবু থেকে কিছু দূরে একটা আগুনের চারিদিকে চেনার গাছটার তলে গোল হ'য়ে ব'সে একদল মুণ্ডা কুলি গান গাইছে। নদী নয়, খাল। সেই খালের দু'ধারে জোয়ারের ক্ষেত। সেই ক্ষেতে ভইসা টহ্লায় এক ছেলে। চিরাচরিত একটা মেয়েকেও ওরা এনে ফেলেছে গানে। সকলে মিলে ধুয়া ধরেছে, 'সোনার পাহাড়ের ঋতুমতী কন্যে সেই গলায় লাল-কাঠি-লবঙ্গহার পরা দেশ।'

বেটারা এত দেশভক্ত তা জানতাম না। দেশের চিঠি পায় না। এদিকে বোমা প'ড়ে মরার ভয় প্রত্যক্ষ না হ'লেও চিন্তা ভাবনার পিছনে লেগে আছে। তাই বোধ হয় এমন ক'রে দেশের কথা মনে পড়ছে ওদের।

আজকের চিঠিতে তোমাকে একটি উপকথা উপহার দিলাম। তিন-রাজ্যের সীমানা এসে মিশেছে তিন রাজার নিশান-পোঁতা এক জায়গায়। তার দিকে পিছন ফিরে ডুবন্ত সূর্যের পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সেই পাখী ডাকা বিশ্রামের গ্রাম।

আর একটা কথা মনে হচ্ছে। ম্যাগ্দালেন ওর নাম ছিল না বোধ হয়, পদবী

ছিল। ম্যাগ্‌দালেন-চা-বাগানে বাস করে এই তার পরিচয়। কৌলিন্যহীন মানবগোষ্ঠী কুল ও পরিচয় কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

অনেকদিন পরে আবার চিঠি লিখতে বসেছি। তোমার চিঠি যে পাই নি এটা স্বাভাবিক। তোমাকে শেষবার খবর পৌঁছে দেবার পর এই প্রথম আবার ডাকের যোগাযোগ স্থাপন করা গেলো। কিন্তু এ যোগসূত্রকেও তেমন দৃঢ় কিছু মনে হচ্ছে না।

তুমি নিশ্চয়ই জানতে চাও আমি ঠিক কোথায় আছি। যুদ্ধ মিটে যাক। তখন এক সময়ে শোবার ঘরের টেবলে ম্যাপ বিছিয়ে, রাস্তার ব্লু-প্রিন্ট মেলে ধ'রে তোমাকে দেখিয়ে দেবো কোথায় আমার ক্যাম্প ছিলো এবং কোন ক্যাম্প থেকে তোমাকে কোন চিঠি দিয়েছিলাম।

ব্যালেণ্টাইন সম্বন্ধে একটা খবর দেয়ার আছে। সে যখন এলো তখন তাকে দেখেই মনে হয়েছিলো সে কাজ করতেই এসেছে। সেই প্রথম সকালের প্রাতরাশের টেবলেই অনেক কাজের কথা হয়েছিলো।

আমি ভেবেছিলাম বর্তমানে যেখানে কাজ হচ্ছে সেখান থেকে মাইলটেক দূরে যে পাহাড়ের চূড়া পড়েছে সেটাকে উড়িয়ে না দিয়ে রাস্তাটাকে টানেল ক'রে নিয়ে যাওয়া হবে। মেজর কারও রাজী ছিলো। ব্যালেণ্টাইন প্রথম আলাপেই ব্যবস্থাটা উল্টে দিয়ে বললো, টানেলিং-এর সময় নেই; বর্ষা নামার আগেই A2 সেকশনের সীমায় রাস্তা পৌঁছে দিতে হবে। হয় চূড়াটার গায়ে একটা লুপ বসিয়ে দাও নতুবা ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দিয়ে পথ ক'রে নাও। সে জানালো পাহাড়ের সঙ্গে বোঝা-পড়া ক'রে চলতে হবে না, প্রয়োজন মতো জবরদস্তিও করতে হবে।

এত সব কেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের ? এমনতর প্রশ্ন করা আমাদের রীতি নয়। একটু বিস্মিত হলাম, কারণ কন্‌ট্রাক্‌টের চাইতে আমি অন্তত একমাস এগিয়ে ছিলাম। একটা ব্যস্ততা, একটা অধীরতা, ব্যালেণ্টাইনের কথাবার্তায় ও চালচলনে ধরা পড়তো। কাজের গতিটা যেন কখনই তার মনের মতো নয়। রাস্তাটা যদি একটা প্রকাণ্ড হোসপাইপ হ'তো তবে আগুনপুলিশের ভঙ্গিতে সে পাইপের মাথা ধ'রে এক দৌড়ে পাইপ বিছানোর কায়দায় রাস্তাটাকে পেতে দিতো।

এ সব দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক কর্মব্যস্ততাই তার চরিত্রের একটা বিশেষ দিক।

রাস্তা যে পাহাড় বেয়ে উঠবে সেটা পরীক্ষা করার জন্যে ব্যালেণ্টাইনের সঙ্গে আমাকে মাঝে মাঝে যেতে হ'তো। কোনো কোনো দিন আমাদের সঙ্গে আমার ফার্মের এঞ্জিনিয়াররাও থাকতো। ব্যালেণ্টাইন তাদের পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ঢেড়া চিহ্ন দেওয়া রাস্তার ব্লুপ্রিণ্ট খুলে ধ'রে বুঝিয়ে দিতে।

একদিন একটা কৌতুকের ব্যাপার ঘটে গেলো। পাহাড় পরিক্রমায় আমরা

বেরিয়েছিলাম। রাস্তাটার সম্ভাব্য বাধা একটা ন্যাড়া পাহাড়ের চূড়ায় আমরা উঠলাম। প্রস্তাবটা আমার টানেলিং ক'রে বা ধ্বস নামিয়ে এ চূড়াকে কায়দা করা যাবে না, যদি তার গা বেয়ে পাক খেয়ে রাস্তা ওঠে চূড়ার অপর দিকে মোটর নামার উপযুক্ত ঢালু পথ চাই। তা যদি নাই হয়, সেদিকে যদি খাড়া হয় চূড়ার গা, পথটাকে হয়তো ব্লুপ্রিন্ট থেকে সিকিমাইল পরিমাণ ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

চূড়ায় উঠে দাঁড়িয়ে দূরবীন দিয়ে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন কুয়াসা স'রে গেলো। আমাদের বাঁয়ে A৫ সেকশনের পুব-উত্তর কোণে কিছু দূরে একটা ছোটো অধিত্যকা আমরা আবিষ্কার করলাম। সে অধিত্যকার ওপারের পাহাড়গুলো মভ্ রঙের। নিজ অধিত্যকার রঙ্ কালচে সবুজ ও সোনালি সবুজে মিশানো। পাইন-বার্চ গাছের বন। এবং বনের চাইতেও বড়ো বিস্ময় একটি লোকালয়। সহর তো নয়ই, গ্রামও নয়। একটা লম্বা বড়ো ঘরের চারিদিকে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর। বড়ো ঘরটার থেকে কিছু নিচুতে পাহাড়ের গা থেকে ধোঁয়া উঠছে ব'লে মনে হ'লো। জুম চাষ। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অন্য দু'একটি চিহ্নও চোখে পড়লো।

ফিরবার পথে এই গ্রামটি নিয়ে কথা হ'লো আমাদের। ব্লুপ্রিন্টে এরকম সব বস্তি-আস্তানার নির্দেশ আছে একটি একটি ছোট বিন্দু দিয়ে। এ বস্তিটা সেখানে সম্পূর্ণ উহ্য।

ব্যালেণ্টাইন বললো, 'বস্তিটায় একটা চা-বাগান হ'তে পারতো, বোনার্জি।'

'অবশ্য যদি চা-চালান দেওয়ার পথ থাকে।'

'বস্তিটায় যেন শান্তি বিরাজ করছে। অন্তত যুদ্ধ নেই।'

'দূর থেকে তাই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে কোনো অজ্ঞাত মহামারীতে গ্রামটা শেষ হ'য়ে যাচ্ছে, এবং হয়তো কোনঠাসা হ'য়ে লড়ছে। কিম্বা তোমাদের ব্লুপ্রিণ্ট হওয়ার পরেই গ্রামটার পত্তন হয়েছে এবং অগ্রগামী দল এখনও এগিয়েই যাচ্ছে। প্রকৃতির সঙ্গে ছোট খাটো দাঙ্গা হচ্ছে।'

আমরা আমাদের আস্তানার কাছে এসে পড়েছিলাম। ব্যালেণ্টাইন বললো, 'দেখো বোনার্জি, শান্তি জিনিসটার মূল্য এ সব চুরমার হৈ হৈ-এর চাইতে অনেক বেশী।'

আমি রসিকতার সুরে বললাম, 'ঐ গ্রামটায় নেমে গেলে কি রকম হয়?—যদি আর কোনোদিনই না উঠি?'

ব্যালেণ্টাইন ও বোনার্জি পরস্পরের পূর্ব পরিচিত এ কিন্তু আমাদের আলাপ-আলোচনা থেকে বুঝবার কোনো উপায় ছিলো না। ব্যালেণ্টাইন পূর্ব-পরিচয় অস্বীকার না করায় আমাদের আলাপে নতুনের আড়ষ্টতা ছিলো না। কিন্তু আমরা কেউই ম্যাগ্দালেন-চা-বাগানের উল্লেখ করতাম না।

সমস্যাবহুল চূড়াটি থেকে তখন আমরা সিকিমাইল পিছনে তাঁবু ফেলেছি।

রাস্তাটিতে আরও কিছু পিছনে কাজ হচ্ছে। আমাদের শেষবারের মতো চূড়াটিকে বাজিয়ে দেখার কথা ছিলো। কি করণীয় আজই তা স্থির হ'য়ে যাবে।

সকালেই ব্যালেণ্টাইন তার তাঁবু থেকে কখন বার হয় এই প্রতীক্ষায় আমি আমার তাঁবুর সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলাম। ব্যালেণ্টাইন এলো। তার পোশাকে একটু বৈশিষ্ট্য ছিলো। পাহাড়ে উঠবার কুড্ডুল-লাঠি হাতে, পিঠে একটা ছোটো হ্যাভার-স্যাক, কোমরে রিভলবার তো বটেই।

ব্যাপারটা কিছু দূর গড়াতে পারে এই আশঙ্কা হ'লো আমাদের। সুতরাং পাহাড়ে চড়ার জুতো এবং কুড্ডুল-লাঠি আমাকেও নিতে হ'লো। একটি ছোটো ঝোলায় কিছু শুকনো খাবার নিলাম আর জলের ব্যাগ।

আধ ঘণ্টাটেক পরিচিত পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘুরে বেড়ালাম আমরা। তারপর ব্যালেণ্টাইন একটা শুড়ি পথ বেয়ে নিচে নামতে লাগলো। কিছুদূর নামবার পর আমার ধারণা হ'লো আগে যেমন মনে করেছিলাম পাহাড়ের আদিবাসীদের পায়ে পায়ে এই পথ সৃষ্টি হয়েছে সেটা ভুল। কোনো এক সময়ে বর্ষার সঞ্চিত জল একটা ঝর্ণা হ'য়ে নেমেছিলো, সেই জলের ধারায় পথটা সৃষ্টি হয়েছে। ছোট-ছোট নুড়ি পায়ের তলায় খর্‌খর্‌ ক'রে স'রে যাচ্ছে। শিথিল মূল যে সব লতা ও আগাছা চোখে পড়ছিলো সেগুলোর উপরে নির্ভর করা মূর্খতা হ'তো। বরং কুড্ডুল-লাঠি কাজে লাগলো। ভরসা এই দূর থেকে যতটা খাড়া মনে হচ্ছিলো পথটা আসলে তা নয়। এবং উপর থেকে যার খোঁজ পাওয়া যায় নি, তিন চারশ' ফিট প্রাণ হাতে ক'রে নামতে বার্চের জঙ্গলের মধ্যে তেমনি একটি মাটি-মিশানো পথ পাওয়া গেলো। পথ অর্থাৎ কিছু কিছু সমতল জায়গা শ্যাওলা ঢাকা গাছের গুঁড়ি ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদের ঝোপে-ঝাড়ে ভরা। শুধু বাহারে পাতার ফার্ন নয়, পাথরের গায়ের নানা রঙের মস্‌ই নয়, দেখলাম নানা জাতের ফুলগাছও আছে। যে সব ফুলকে আমরা সিজনের ফুল ব'লে সযত্নে বাগানে লাগাই তারই কয়েকটি জাত অনাদরে অজস্র ফুটে আছে। যতদূর মনে পড়ছে কার্নেশ্যান্‌ ফুলই বেশী ছিলো। প্যান্‌সি ও ভায়োলেটের আভাস পাচ্ছিলাম। একটা প্রৌঢ় বার্চের কণ্ঠলগ্না উজ্জ্বল স্বচ্ছপ্রায় কমলারঙের ফুলের মালার মতো একটি অর্কিড। গাছগুলো থেকে একটু দূরে খানিকটা ঘাসের জঙ্গল চোখে পড়লো। চারিদিকে চাইতে চাইতে বসবার মতো জায়গাও খুঁজে পেলাম। দলছাড়া কিন্তু শক্তিমান একটা বার্চের তলায় একটা পরিচ্ছন্ন বড় পাথর ছিলো, আমরা তার উপরে গিয়ে বসেছিলাম। আমরা দুপুরের আহার সারছি এমন সময়ে চারিদিকের বাতাস শুঁকতে শুঁকতে একটা ছাগল জাতীয় হরিণ এসে উপস্থিত হ'লো। নিঃশব্দে আমি ব্যালেণ্টাইনকে ইঙ্গিত করলাম রিভলবার দিয়ে তাক্‌ করো। কিন্তু পাঁচ দশ হাত দূরের সেই হরিণকে ব্যালেণ্টাইন হত্যা করলো না। বরং আমি যখন রিভলবার হাতে করলাম সে আমার হাত চেপে ধ'রে চোখ দিয়ে নিষেধ করলো। হরিণটা খুঁটে খুঁটে পাতা খেলো, ঘুরে ঘুরে

চ'লে গেলো।

ফিরতি পথে কিছু কষ্ট পেতে হয়েছিলো। রুরকিতে পড়ার সময়ে ব্যালেণ্টাইন পাহাড়ে চড়ার অভ্যাস করতো, সেটা কাজে লাগলো তার।

এই সূত্রপাত হ'লো।

প্রথম প্রথম রাস্তার সীমা সরহদ্দ নির্ণয় করার উপলক্ষ্য ছিলো, পরে তাও থাকলো না। প্রায়ই ব্যালেণ্টাইন পাহাড়ে চড়ার পোশাক প'রে বেরিয়ে যেতো। এ যাওয়া সপ্তাহে একদিন থেকে তিন চারদিনে দাঁড়ালো। প্রথম প্রথম প্রাতরাশের টেবলে দেখা হ'তো, দু' একবার তার সঙ্গে যেতেও হয়েছে। তারপরে বেরুনোর তাগিদে প্রাতরাশের টেবলে অনুপস্থিত হ'তে লাগলো সে। কখনও তাঁবুর দরজায় দেখা হ'লে সে বলতো, বোনার্জি, দক্ষিণপুবে যাচ্ছি। তারপর সে খবর দেওয়াও বন্ধ হ'লো।

একদিন সন্ধ্যার পর সুন্দরাইয়া এসে খবর দিলো—তার সা'ব তখনও ফেরে নি। সুন্দরাইয়া ব্যালেণ্টাইনের অর্ডারলি। কতদিন হ'লো ? দু'দিন হ'লো।

ভাবনারই কথা। গোকুল ইত্যাদির সঙ্গে পরামর্শ করলাম। ব্যালেণ্টাইনের কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা হ'লো। স্থির হ'লো রাত্রিতে কোনো ব্যবস্থা করা অসম্ভব। দিনের বেলায় সুরু হবে।

পরদিন সকালে ছোটো ছোটো চারটে দলে ভাগ হ'য়ে আমরা বার হ'লাম। দু'তিন ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর গোকুলই প্রথম তাকে দেখতে পেলো। কাছাকাছির মধ্যে সব চাইতে উঁচু চূড়াটায় উঠে গোকুল দুরবীন্ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলো।

তার ডাকাডাকিতে অনেক কষ্টে উপরে উঠে তার নির্দেশিত দিকে লক্ষ্য ক'রে মনে হ'লো পাহাড়ের পথে অনেক নিচে কি যেন একটা চলছে। প্রায় দশ মিনিট ধ'রে সেই 'কি-যেন'টা উপরে উঠলে আমি ঘোষণা করার সাহস পেলাম ব্যালেণ্টাইন আসছে। তারও একপ্রহর পরে পুবদিকের পাহাড়ের ধারে ব্যালেণ্টাইনের হেলমেটের চূড়া চোখে পড়লো।

সেদিন সন্ধ্যার পর ব্যালেণ্টাইন আমার তাঁবুতে এলো। তার হ্যাভারস্যাক থেকে এটা ওটা বার ক'রে সে আমার টেবলে রাখতে লাগলো। সোনালি দাগ দেওয়া এক টুকরো পাথর, কুচ্‌কুচে কয়লা রঙের একটা নুড়ি, পাথর হ'য়ে যাওয়া কোনো পাতা, একজোড়া ডালপালা মেলা ছোটো একটা হরিণের শিঙ্। এসব দেখে বুঝবার উপায় নেই বিজ্ঞানের কোন অঙ্গে তার ঝোঁক। কারণ সব শেষে সে একটা অজ্ঞাত গাছের শিকড় বার ক'রে বসলো, বাজিকররা যেমন তাদের ঝোলা থেকে ভেল্‌কির হাড় বা'র করে।

দৃশ্যতই ব্যালেণ্টাইন এ সব সংগ্রহ করার জন্যে উৎসাহব্যঞ্জক কোনো প্রশংসাবাক্য আশা করেছিলো আমার কাছে। তার কাছে কিছুক্ষণ তার সংগ্রহের বর্ণনা এবং বৈশিষ্ট্যগুলো শুনলাম।

দু'তিনদিন সে বেরুলো না।

একদিন তাকে কাজের কথায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম,—'ক্যাপ্টেন, সিমেণ্ট-এর স্টক ক'মে এসেছে, লেখালিখি করতে হয়।'

সে আমার দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। আমি যেন কোনো অবুঝ স্কুলমাষ্টার।

কিন্তু সে একবার আর ফিরলোই না। আমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব খোঁজাখুঁজি করা হ'লো। আট দশদিন খোঁজাখুঁজি ক'রে আমরা A ডিভিসনের হেডকোয়ার্টার্সে খবর পাঠিয়ে দিলাম। ক্যাপ্টেন ব্যালেণ্টাইন নিখোঁজ হয়েছে।

লোকজন এলো। রেসকিউ পার্টি নিয়ে একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট দিন দশ পনরো খোঁজাখুঁজি করলো। তারা ফিরে গেলে ব্যালেণ্টাইনের জায়গায় A2 সেকশনের নতুন ইঞ্জিনিয়ার এলো মেজর নিল।

গোকুলরা অবশ্য ব্যালেণ্টাইনকে নিয়ে এখনও আলোচনা করে। ওদের কারো কারো ধারণা দুষ্প্রাপ্য কোনো খনিজের সন্ধান পেয়েছিলো সে। এবং সোনার লোভে মানুষ কি না করতে পারে এবং সোনার জন্য মানুষের কি না হয়েছে?

কিন্তু আমার এখন মনে হচ্ছে: ব্যালেণ্টাইনের মতো আজন্ম মাংসাশী হরিণকে পাঁচ হাতের মধ্যে পেয়েও তাকে নিরাপদে যেতে দিলো সেটাই বা কি রকম ব্যাপার?

সে যাই হ'ক, ব্যালেণ্টাইনকে ডিজার্টার ব'লে উল্লেখ ক'রে হুলিয়া বার হ'লো।

যুদ্ধের ভয়ই যদি বলো প্রতিবাদ করার কিছু নেই। অনেক জাঁদরেল সেনাপতিই সে ভয়ে ভীত।

কিন্তু যুদ্ধের ভয় এ জায়গাটায় কি এমন বেশী?

জায়গাটার নাম ধ'রে নিও নাম্‌চা। নাম্‌চা বাজারও বলতে পারো। বহু বহুদিন পরে আমাদের এই সাম্রাজ্যপথ যেন লোকালয়ের দিকে ঝুঁকেছে। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার থেকে কিছু পিছনে উপজাতীয়দের একটা গ্রাম চোখে পড়েছিলো। সে গ্রামের দিকে যাওয়া ছিলো সর্বপ্রকারে নিষেধ। আমরা খবর পেয়েছিলাম সেটা একটা পড়্‌তি গ্রাম—অশক্ত ছাড়া প্রায় সবাই গ্রাম ছেড়ে চ'লে গেছে। প্রথমে ধারণা হ'য়েছিলো কোনো মহামারি, পরে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারি—এই সড়ক-মাপের ভয়।

কিন্তু আমার এবং তোমার এই নাম্‌চা-বাজার, যদিও ভূগোলের সব চাইতে বড়ো ছবিতেও এ নামের কোনো গ্রামের হদিশ নেই, সে রকম গ্রাম নয়। অগ্রসর দল এসে প্রথমে খবর দিয়েছিলো পাহাড়ের গায়ে গায়ে ইতস্ততঃ জুম চাষের চিহ্ন চোখে পড়েছে। স্কাউট পাঠানো হয়েছিলো। তারা ফিরে এসে বললো, দু'চারশ' ঘরের

একটি বাজার সমেত গ্রামই বটে।

মেজর সাহেবের সঙ্গে তাঁর তাঁবুতে ব'সে আলাপ হ'লো। স্থির হ'লো গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে—প্রয়োজন হ'লে উপঢৌকন বিনিময়। অনাবিষ্কৃত ভারতবর্ষের এ পাহাড়ে যদি অত বড় একটা গ্রাম থেকে থাকে তবে সেখানে কিছু সভ্যতা আশা করা যায় এবং সম্ভবত কিছু ফলমূল আনাজ-তরকারি পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

তুমি শিলং দেখেছো, আলমোড়া দেখেছো ; সে সব জায়গায় বাজার কি রকম হয় তার ধারণা একটা আছে। বাজার সর্বত্রই একরকম ; লোকের আনাগোনা আছে, কেনা-বেচার আয়োজন আছে। কিন্তু নাম্‌চা-বাজার বিলাসের তাগিদে গ'ড়ে ওঠে নি, উঠেছে বাঁচার প্রয়োজনে। ইট কাঠের বড়ো বাড়ি কাচের দরজা-জানালা একটিও চোখে পড়লো না। বাঁশের ও খড়ের আচ্ছাদন যেগুলোর উপরে আছে সেগুলোই সব চাইতে বড়ো দোকান। অন্য দোকানগুলোর কোনো আচ্ছাদন নেই। ক্রেতারা প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ। লক্ষ্য করা গেলো বিক্রেত্রীরা ক্রেতা ও ক্রেত্রীদের চাইতে সাজ-সজ্জার দিকে অধিকতর অগ্রসর। মনে হ'ল ক্রেতাদের একটা বড়ো অংশ আশ-পাশের গ্রাম থেকে উঠে এসেছে।

আনাজের আশায় গিয়েছিলাম আমরা। সারা বাজারে রাইজাতীয় শাক, গাছের শিকড় ও ধুঁধুল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। কিছু পাখী অবশ্য পাওয়া গেলো। এবং মেজর সাহেবের পরামর্শ মতো উপযুক্ত দামের প্রায় দ্বিগুণ দিয়ে আমরা কিনলাম সে সবই। দাম আমরা দিলাম রুপোর টাকায়, পুরানো কম্বলে, বিস্কুট ও রুটিতে, জমানো দুধ ও মাংসের খালি রঙদার টিনের কৌটায়। দোকানিরা প্রথমে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে চেয়েছিলো, পরে তারা খুশীই হলো যেন। কি সহজেই না এরা খুশী হ'তে পারে! এদের ভাষা এক বর্ণও আমরা বুঝলাম না। ওরা আমাদের প্যাণ্টকোট দেখে আমাদের সকলকেই একই নামে সম্বোধন করলো।

তাদের অসভ্য মনে করার কোনো যুক্তি নেই। তাদের পরনে তাঁতে বোনা এক ধরনের বস্ত্রখণ্ড ছিলো। রঙের ঔজ্জ্বল্য ও নকসার মনোহারিতায় তা ভালো ব্রোকেডকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করতে পারে।

বাজারের কাজ আমাদের শেষ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে যে সিপাই-এর দল এসেছিলো তারা ফিরে গেছে।

এমন সময়ে মেজর সাহেব বিস্ময়ে শিষ্‌ দিয়ে উঠলেন। তাঁর ইঙ্গিত মতো চেয়ে দেখলাম। একটি ছোটো কাঠের বাড়ি, বয়সের দিকে সেটার অতি প্রৌঢ় অবস্থা। এদের তৈরী অন্যান্য যা কিছু চোখে পড়েছে তার সঙ্গে এ ঘরখানির গঠনে মৌল পার্থক্য আছে। পাথরের ভিত্তিতে কাঠের থামের উপরে বাংলো ধরনের বাড়ি। সামনের দিকে গাড়ী বারান্দার ঢঙে ঘরের তিনচালা ছাদ এগিয়ে এসেছে। গ্যাবেলড্ রুফ। গাড়ি বারান্দার একদিকে বোধ হয় জালিকাটা কাঠের পর্দা ছিলো

কোনো কালে। সেই পর্দার দু'পাশে দু'টি পাতাবাহারের গাছ জটপড়া পাকানো পাকানো গুঁড়ি নিয়ে এখনও সতেজে বাড়ছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড এই বাড়িটার ছাদের উপরে ছোটো একটা গথিক ধরনের ক্রস্।

আমরা খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে সেই চার্চ বা একদা যা চার্চ ছিলো তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু পাদরিকে খুঁজতে হ'লো না। প্রধান দরজার সামনে এখনও লোহার শিকলে সবজে হ'য়ে যাওয়া ভাঙা পিতলের ঘণ্টাটা ঝুলছে, কিন্তু দরজাটার অনেকটা জুড়ে একটা উই-ঢিবি। সেই উই-ঢিবিও এখন পরিত্যক্ত। গাড়ি বারান্দার নিচে গ্রামের লোহারের দোকান। গনগনে আগুনের ভিতরে লোহা তাতিয়ে সহকারীর সাহায্যে সে ভালো ব্যবসাই করছে। তার গ্রাহকরা উবু হ'য়ে ব'সে তার কাজের তারিফ করছে। নিজেদের মধ্যে রংতামাশাও করছে। বোধ হয় চার্চেরই সম্পত্তি এমন একটি লোহার ফ্রেমের বেঞ্চ একধারে প'ড়ে আছে।

গত চিঠিতে কথাটি তোমাকে বলি নি। কারণ দর্শন আমাকে পেয়ে বসেছে, চিঠিতেও দর্শন ফলাচ্ছি এবং এ ব্যাপারটা বলতে গিয়েও দর্শনের কথাই মনে হচ্ছিলো।

পাদরিদের সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে : তারা পরোক্ষে সাম্রাজ্যবাদের অগ্রদূত। কিন্তু যে পাদরি এই নামহীন অজ্ঞাত বাজারে তার গির্জা স্থাপন করেছিলো—তার কি তাগিদ ছিলো! সে কি সম্রাজ্যবাদী টাকায় এই গির্জা তুলেছিলো! তার কোন খোঁজই পাচ্ছি না। কিন্তু এমন তো হ'তে পারে সে ইংরেজ নয়, হয়তো সাম্রাজ্য-বাদকে যারা অবাস্তব স্বপ্ন ব'লে জানে এমন কোনো দেশের লোক, হয়তো বা সুইডিস্ কিম্বা মোরাভিয়ান কোনো পাদরি। গির্জা টেকে নি। তার প্রাণরক্ষা পেয়েছিলো কিনা তাই বা কে বলবে?

একটা বিষয় আমরা বুঝতে পারলাম। নাম্‌চা বাজারে সভ্যতার বোঝা নিয়ে পৌঁছুতে সাম্রাজ্যের নিকটতম কেন্দ্রটি থেকে দু' শ' মাইলব্যাপী নির্জন এই সাম্রাজ্যপথে আসতে হয়। কিন্তু আর একটি পথও হয়তো আছে। অতি সুগভীর এক উপত্যকার ওপারে ফিরোজা-বেগুনি নীল রঙের একটি নিচু পাহাড়ের মাথায় লাল ছাদের হলুদে দেয়ালের একটি চিমনি-তোলা বাড়ি কি চোখে পড়তে পারে?

মনে হ'লো ক্রমাগত জুমচাষের জন্য কাটা পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে উঠতে উঠতে দু' তিন মাইল নিচের কোনো সহর থেকে কিম্বা ওই চা-বাগান থেকে হয়তো এখানে পৌঁছানো যায়। অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ চড়াইএর এবং সভ্যজগতের অজ্ঞাত পথে হয়তো কোনো পাহাড়ী কুলির মাথায় বিছানা পোর্টম্যাণ্টো ও প্যারাসল চাপিয়ে এক পাদরি উঠে এসেছিলো।

একটা দুঃখের খবর দেয়ার আছে।

পথের স্থায়িত্ব রক্ষা করার দিকে লক্ষ্য রেখে এ জায়গাটায় দু'পাশেই পাহাড়ের

গা সিমেন্টে বাঁধাতে হচ্ছে। বাঁদিকে আলগা পাথরের একটু ঢাল নিচের একটা ছোটো ও সংকীর্ণ আধিত্যকায় নেমে গেছে। শুধু প্যারাপেট নয় আলগা পাথরগুলোকে নিচে থেকে কংক্রিটে বাঁধিয়ে তুলতে হবে। আমার লোকজন আধিত্যকায় নেমে গিয়ে সিমেন্টে পাথরে গেঁথে গেঁথে ক্রমশ উঠে আসছে।

একদিন সন্ধ্যায় গোকুল কাজ শেষ ক'রে ফিরে আমার তাঁবুতে এলো।

আমার একটা বাতিক হয়েছে দেখছি—জিনিস কুড়নোর। রঙিন কিম্বা অদ্ভুত চেহারার পাথর, পাথর হ'য়ে যাওয়া গাছের পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রে একটি ট্রাঙ্ক বোঝাই ক'রে ফেলেছি।

নিজের বাতিকে নিজেই বিব্রত বোধ করছি। আমার এই সংগ্রহের ব্যাপারে গোকুল সহায়তা করে। আজ সে মরচে-পড়া লোহার মতো কি একটা নিয়ে এসেছে। আসলে সেটা কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক কিছু নয়, একটু লক্ষ্য ক'রেই বোঝা গেল সেটা পাহাড়ে উঠবার একটা কুড়ুল-লাঠির ভগ্নাংশ। সংগ্রহ হিসাবে সেটা কিছু নয় কিন্তু চিন্তা করতে গিয়ে কৌতূহল অনুভব করলাম, এই সভ্যজগতের অজ্ঞাত পথে য়ুরোপীয় কায়দায় কে বা পাহাড়ে চড়তে এসেছিলো। আমি গোকুলকে চারিদিকে দৃষ্টি রাখতে বললাম।

দু'দিন বাদে একটা ঝোপের পাশে ব্যালেন্টাইনের পাইপটা পাওয়া গেলো। অন্তত পাইপটা যে ব্যালেন্টাইনের সদা-ব্যবহৃত একটির মতোই, এ আমি হলপ নিয়ে বলতে পারি। আমাদের একটা সন্দেহ হ'ল : ব্যালেন্টাইনের আরও বেশী খোঁজখবর এদিকে পাওয়া যেতে পারে। দু'দিন ধ'রে আবার খোঁজ চলেছিলো। পাঁচ সাতজন আমির লোকের সঙ্গে আমার আট দশ জন কুলিও ছিলো।

সেদিন সন্ধ্যায় তাদের একটি দল ফিরে এসেছে। তারা একটি করোটিহীন কঙ্কাল আবিষ্কার করেছে।

আমি এবং মেজর গিয়েছিলাম। কঙ্কালের কাছে পোশাক পরিচ্ছদ কিছু ছিলো না। হাড়গুলো হলুদে হ'য়ে গেছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সেগুলোকে কুড়িয়ে এদিকের ওদিকের ঝোপঝাড়ে ন্যাড়া পাথরের আড়ালে আবডালে খোঁজ ক'রে হাড় ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়লো না।

মেজর বললেন,—বোনার্জি, হাড়গুলো দেখে কি অত্যন্ত পুরনো কিছু ব'লে মনে হয় না ?'

'তা হয় বৈ কি।'

কিন্তু কঙ্কালের বাহুর হাড়ে রুপোর বিবর্ণ চেনে বাঁধা আইডেনটিটি ডিস্ক পাওয়া গেছে। ধুয়ে মুছে সে ডিস্কের ইংরেজি অক্ষর প'ড়ে জানা গেলো ব্যালেন্টাইনের কঙ্কালই পাওয়া গেছে বটে। রাজকীয় ভারতীয় বাহিনীর ক্যাপ্টেন ব্যালেন্টাইন! ডিজারটার ব্যালেন্টাইনকে এখনও মিলিটারি পুলিস ভারতীয় পুলিসের সহায়তায় খুঁজে বেড়াচ্ছে! সমস্ত বন্দর সমস্ত স্টেশন তার পক্ষে প্রতিরুদ্ধ।

এখন ব্যালেন্টাইন সম্বন্ধে অনেকের ধারণাই বদলে গেলো। মেজর এতদিন, অন্তত প্রকাশ্যে, নেতার পক্ষে স্বাভাবিক স্বরে এই দলত্যাগীকে ধিকৃত করেছেন ইংরেজ জাতিকে কলঙ্কিত করেছে ব'লে। এমন কি তার ইংরেজ-রক্ত যে অবিমিশ্র নয়, এশিয়ার রক্তের মিশেল আছে, এমন সব মত তিনি পরোক্ষে প্রচার করতেন। একদিন তিনি মদের গ্লাসের গায়ে আঙুল ঘষতে ঘষতে বললেন, 'বোনার্জি, পথের ধারে একটা ছোটো সেনোটাফ বানিয়ে দেবে ?'

রাজি হ'লাম। স্থির হ'লো ব্যালেন্টাইনের পার্থিব অবশেষ সমাধিস্থ ক'রে ছোট সুদৃশ্য একটি আর্ন জাতীয় কিছু তৈরি ক'রে দেওয়া হবে। মেজর বললেন একটি ইংরেজি কবিতার দু'টি চরণ উৎকীর্ণ করতে।

কবিতাটি তোমার পরিচিত: নাবিক সমুদ্র থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে, শ্রান্ত শিকারী পাহাড় থেকে ঘরে এসেছে।

আমার মনে হয়েছিলো : ইন্দ্র পথচারীদের সহচর—এই অনূদিত বাক্যটি লিখে দেবো। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম ব্যালেন্টাইন ঠিক পথচারী নয় তো। সে বোধ হয় তার মনের মতো কোনো ঘরেরই কাঙাল ছিলো যেখানে ক্লান্তি দূর হয়। কাজেই ইংরেজ কবিই বোধ করি ওর মনের কাছে গিয়েছে।

*   *   *   *

গোকুল অবশেষে চূড়ান্ত পাগলামি সুরু করেছে।

মানুষের জীবন-রহস্য ভাবতে গিয়ে সেদিন আমার নোটিলাসের গল্প মনে পড়লো। সেই যে ডুবুরি-জাহাজের জানালায় ব'সে সমুদ্রের প্রাণময় বিস্ময়কে লক্ষ্য করার গল্প। জীবন-রহস্য সম্ভবত তার চাইতেও বড়ো, গতিমান বিস্ময় চারিদিকে থৈ থৈ করছে।

গোকুলকে ডুবুরি জাহাজের গল্পটা ব'লে অবশেষে বলেছিলাম, 'তুমি কি মনে করো একটিমাত্র কাচের জানলাই আছে সে রহস্যের দিকে ফিরানো ?'

গোকুলের ধারণা তাই। অর্থনীতির জানলা দিয়ে দেখাই নাকি জীবন-রহস্যকে বুঝবার একমাত্র পথ।

সে যাই হ'ক, ওকে ফেরৎ না পাঠিয়ে উপায় নেই। মেজরের কাছেও ও মতবাদ নিয়ে প্রকাশিত হ'য়ে পড়েছে। কাল র‍্যাশান তুলে আনতে একটা ছোটো কনভয় যাচ্ছে। তার সঙ্গে গোকুল রওনা হ'চ্ছে। যদি ওর ফিরতে ইচ্ছা হয় কাজে, ফিরবে। নতুবা হ্যারল্ডের নামে চিঠি দিয়ে দিলাম, সেটা দেখালে চাকরি পাবে। ওর চাকরির দরকার সেটা যেন ওর চাইতে আমি বেশী বুঝি।

হ্যারল্ডকে লিখলাম ম্যাগদালেনের খবর দিতে।

মেজর সাহেবের সঙ্গে কাল একটু তকরার হয়ে গেলো। ঠিক কি-কি কথা

হয়েছে তোমাকে জানাতে পারবো না। তবে ভদ্রলোকের একটি কথা আমি ভাবছি, হয়তো এরপরও দু'এক সময়ে মনে হবে।

তিনি কথায় কথায় প্রশ্ন করলেন,—রূপের সার্থকতা কোথায়?

আমি কাব্যগত ও জীবতত্ত্বগত রূপের প্রয়োজনগুলো উল্লেখ করলাম।

ভদ্রলোকের লোকচরিত্রজ্ঞানের পরিধি য়ুরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় ছড়ানো। ইদানীং তিনি পূর্ব এশিয়ায় অধিষ্ঠিত করছেন।

কাব্যগত কারণগুলোকে অবাস্তব ব'লে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'রূপ যদি পুরুষকে বাঁধবার জন্যই হ'য়ে থাকে তবে তার ব্যর্থতাও অত্যন্ত স্পষ্ট। কারণ পুরুষ রূপকে গ্রাস করছে অর্থের সাহায্যে, পৌরুষ সেখানে উহ্য। প্রকৃতপক্ষে রূপ নিজের উদ্দেশ্য সাধন না ক'রে পণ্য হয়েছে—সতীর বেলাতে এবং গণিকার বেলাতেও। কারণ সতীর বেলাতেও রূপ ভীমার্জুন সংগ্রহ করে না, করে রকফেলার জাতীয় কোলা ব্যাঙরা। আমি তোমাদের হাঁড়াপেটো বিত্তেশ্বর কুবেরের মূর্তি দেখেছি, তারপর থেকে অর্থবান লোকের উল্লেখমাত্রই তার কথাই মনে হয়। কিন্তু এরকমই যদি অবস্থা তবে প্রকাশ্যে নারীপণ্যে দোষ কোথায়?'

আমার মনে হ'লো মেজর তার দৃষ্টিকে পিছন দিকে ফিরিয়ে রেখেছেন। তাই বললাম, ভীমার্জুনের যে পৌরুষকে তিনি সমালোচনার উর্ধ্বে'র কোনো নির্দিষ্ট মান ব'লে স্বীকার করছেন সেটার জন্যে তৎকালীন ক্ষাত্রসমাজ বা ক্ষাত্রযুগ দায়ী। এখন এটা বৈশ্য যুগ চলছে এবং এ সময়ের বীর বলতে ফোর্ডকে কেন উল্লেখ করা হবে না? কিম্বা আগতপ্রায় দাসযুগে স্টাখানোভই বীরোত্তমের আদর্শ হিসাবে? এ যুগের চিত্রাঙ্গদার পক্ষে অর্জুন গাণ্ডীবধারী নয়।

মেজর সাহেব পাইপে তামাক ভ'রে প্রশ্ন করলেন,—'রূপসী যদি নিজের রূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়, তবে তার সতী জীবনের অন্তরালে গোপন স্বপ্নগুলো কোনো নাইটকে আমরণ অন্বেষণ করে নাকি?'

এত কথা উঠলো কেন তা এবার বলি।

পথের অগ্রসর স্কাউট দলের মুখে খবর পেয়ে আমি ও মেজর খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা দেখতে। তাদের সংবাদ অমূলক নয়। নামচা বাজারের দিক থেকে একটা উপজাতীর দল রাস্তার মুখ পার হ'য়ে অন্যদিকের পাহাড়ের কোন এক অনির্দেশ্য স্থানকে লক্ষ্য ক'রে চলেছে। বহু নিচে থেকে মানুষগুলো উঠে আসছে, নেমেও যাচ্ছে তেমনি বিপরীত দিকে। দূরবীন ছাড়া খালি চোখে সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হ'লো বর্ষার হদিশ পেলে পিঁপড়েরা যেমন ডিম মুখে ক'রে গর্ত থেকে উঠে আসে, তেমনি পাহাড় বেয়ে উঠছে তারা। মনে হ'লো—তারাও বিপন্ন।

মেজর অবশ্য বললো,—এটা উপজাতীয়দের যাযাবর বৃত্তির চিহ্ন। খবর নেবার জন্য মেজর এবং আমি আরও কিছু এগিয়ে যেখানে ওরা রাস্তাটা পার হচ্ছিলো তরা

পনেরো-বিশ হাত দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন এদের দলের একজনকে দেখে বিস্মিত হ'তে হ'লো। একটি স্ত্রীলোক। শুধু ত্বকের বর্ণ নয়, মুখাবয়ব, চুল বেশভূষা সব দিক দিয়েই দলের অন্য সব ক'টি স্ত্রীলোক থেকে সে স্বতন্ত্র।

আমি অনুচ্চকণ্ঠে নিজেকে শুনিয়ে বললাম, 'ম্যাগদালেন?' মেজরও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'টেম্মা?'

স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে আমাদের দু'জনেরই পরিচয়ের অনুচ্চারিত দাবী দু'জনের কানে গিয়েছিলো।

মেজর বললেন, 'এ যদি টেম্মা না হয় এক পাউণ্ড পাইপ-মিকশ্চার বাজি, বোনার্জি।'

আমি বললাম, 'এ যদি ম্যাগদালেন না হয়, জনি ওয়াকার এক পাঁইট্।'

আগ্রহ ভরে দু'জনেই এগিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরিচিতের কাছেও তাকে ম্যাগদালেনের যমজ ব'লে চালিয়ে দেওয়া গেলেও সে কি ম্যাগদালেন? এ মেয়েটির চুল বব্ বা শিঙ্গল নয়। পিঠের উপরে বেণীতে লুটিয়ে পড়েছে। চুলগুলো ম্যাগদালেনের মতো লাল নয়! গাঢ় বাদামীর মধ্যে দু'একটি সাদার রেখা পড়েছে। পরিধানে অদ্ভুত ধরনের ফ্রক। গাঢ় কফি রঙের ব্রোকেডের ফ্রক ঝুলে যেমন পা পর্যন্ত নেমেছে, আস্তিনের দিকেও তেমনি কব্‌জি ছাড়িয়ে খানিকটা ঝুলছে, অন্তত ঝুলতো যদি না অনেকগুলো বড়ো বড়ো ভাঁজে উল্টে দেওয়া হ'তো। তার উপরে কোমরে লাল-কালোয় ডোরা কাটা অ্যাপ্রন জাতীয় কিছু। গলায় একগাছা রুপোর হার, তাতে অনেক বড়ো বড়ো রঙীন কাচ। পায়ে মোটা রঙিন ডোরাদার ক্যানভাসের মোকাসিন জাতীয় দড়ির সোলের জুতো। রগের দু'পাশে রুপোলি প্লাস্টিকের দু'টি চাকতি টিপের কায়দায় সাঁটা। মেয়েটি যে তিব্বত-ভোট সংস্কৃতির প্রভাবে অনুভাবিত তাতে সন্দেহ নেই। ম্যাগদালেনকে এ অবস্থায় কল্পনা করা তখনই যায়, যদি মেনে নিতে পারি সে রূপসজ্জাদক্ষ এবং গভীর কোনো সমাজ-বিরোধী কাজ ক'রে সে আত্মগোপন ক'রে চলেছে। আর এ বিষয়ে কিছু বলতে হ'লে জানতে হবে হ্যারল্ডকে চিঠি লিখে।

মেজর বললেন, 'বোনার্জি, তুমিই বোধ হয় জিতলে।'

'ঠিক এ কথাটাই আমি আপনার সম্পর্কে বলতে যাচ্ছিলাম।'

'তোমার ম্যাগদালেন নয় তা হ'লে? অবশ্য টেম্মা নয়, একথা আমি হলপ ক'রে বলতে পারছি না। কারণ রাত্রির অস্পষ্ট আলোতেই আমি টেম্মাকে দেখেছিলাম। তখন তার পরনে টিসু সিল্কের কিম্বা অর্গ্যাণ্ডির গাউন ছিলো, ঠোঁট রাঙানো ছিলো এবং আমিও নেশায় চুর হ'য়ে ছিলাম। নেশার অবস্থায় ছাড়া টেম্মাকে অত রাত্রিতে দেখতে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

এই ব'লে টেম্মার পরিচয় দিলেন মেজর। তার আস্তানার নাম বলতে পারবো না, অবশ্য বললেও কেউ ম্যাপে খুঁজে পাবে না। বিদেশী সৈন্যদের একটি ব্যোম-

ময়দানের পাশে অর্ধ খৃষ্টান একটি পল্লী অস্থায়ী এক সহরের রূপ নিয়েছিলো। এবং টেম্মার মতো অনেকে কখনও প্রাণের ভয়ে, কখনও টাকার লোভে বিপথে এসেছে।

এর পরেই আমাদের আলাপ তাত্ত্বিক হয়ে ওঠে যেমন আগে বলেছি। মেজর বললেন, 'টেম্মার স্বামীও বোধ হয় ছিলো। কিন্তু সে বেচারা কি বলবে, বলো।'

মেজরের বক্তব্য শুনে আমার পুরনো কথা মনে পড়লো। চিত্রাঙ্গদাও তো এদিকেরই মেয়ে। (এবং তার সঙ্গে সঙ্গে) ম্যাগদালেনের মা জেনেরও স্বামী ছিলো। সাধারণ পুরুষে তার মন ওঠে না। তার বিশিষ্ট কল্পনার সেই অর্জুনকে সে খুঁজছে। তা যদি না পায় খুঁজে, মেজরের কথা সত্য হ'য়ে দাঁড়ায় : বর্তমানের পৃথিবীতে টাকা, লোভ এবং কৌলিন্যের মোহে স্বৈরিণী নেই ব'লেই রূপের মূল্যও নেই।

তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেকার এক চিঠিতে টেম্মার কথা বলেছিলাম। তারা পাহাড়ের একপাশ থেকে উঠে আমাদের সাম্রাজ্য সড়ক পার হ'য়ে অন্যপাশে নেমে যাচ্ছিলো পিঁপড়েরা ডিম মুখে ক'রে যেমন যায়। প্রবাদটা এই যে পিঁপড়েরা বর্ষার আশঙ্কায় এমন করে। কিছুদিনের মধ্যে আশঙ্কাটাকে প্রত্যক্ষ করলাম। A_1 এবং A_2 সেক্‌শন যেখানে মিলবে তার থেকে মাইল দু'এক আগে শত্রুপক্ষের বোমা বর্ষণ সুরু হ'লো। একটা ক্যান্টিলিভার ব্রিজ করার কথা ছিলো। লোহালক্কর এসে পৌঁছেচে। ধাউস একটা ক্রেন্ শতভাগে বিভক্ত হ'য়ে উঠে এসেছে, সেটা জোড়া হ'চ্ছে। কাজ আরম্ভ হয়নি, কিন্তু পয়েন্ট নির্বাচিত হ'য়েছে। ব্রিজের সেই পরিকাল্পনিক অবস্থিতির পঞ্চাশ-ষাট গজের মধ্যে দু'পাঁচটি বড়ো বোমা পড়লো। এই সুরু, কিন্তু শেষ নয়। সাইরেন নেই, পাকা রাস্তায় পাহাড়ের পাথরে স্লিট্-ট্রেঞ্চ খুঁড়বার উপায় নেই। দিন দুপুরে হাঙ্গরের মতো তেড়ে তেড়ে এসে বোমা ফেলছে। অসহায় মানুষ মৃত্যুকে নির্মম এবং দুর্বার গতিতে আসতে দেখছে, রাশি রাশি হাহাকার ছুঁড়ে বোমারুদের প্রতিহত করার চেষ্টা করলো। একদিন নয়, পর পর কয়েকদিন।

মেজর বললেন এবং আমারও ধারণা হ'লো, শত্রুপক্ষের চর আছে কাছাকাছি কোথাও, নতুবা এত সূক্ষ্ম হিসাবে বোমা ফেলা সম্ভব হ'তো না।

কিন্তু শত্রুপক্ষের পাঁচ সাতদিন বোমা ফেলে পাঁচ সাত মাসের কঠিন পরিশ্রম চুরমার ক'রে না দিলেও চলতো। বোমা বর্ষণের দিন পনরো পরে চিঠি এলো, আপাতত চারমাসের জন্য রাস্তার কাজ বন্ধ থাকবে। বোধ হয় যুদ্ধের গতি ঘুরে যাচ্ছে।

কেউ কারো সংবাদ পাচ্ছিনে, এ অবস্থায় তা সম্ভবও নয়। কিন্তু খবর এই, আমি ফিরে যাচ্ছি। কুলিদের চার মাস বসিয়ে রাখা চলে না, মন ভালো করার জন্য সাময়িক বিদায় দেওয়াও চলে না। বোমার যে অভিজ্ঞতা তারা লাভ করেছে তাতে ছুটির পরে কোনো প্রলোভনেই তারা ফিরবে না। মাইল পঞ্চাশেক দূরে এক

এরোড্রোম তৈরীর কাজ পাওয়া যাচ্ছে সেদিকে আমার এঞ্জিনীয়ার রওনা হ'য়েছে কুলিদের নিয়ে। আমি পাহাড় ডিঙিয়ে সব চাইতে কাছের রেল স্টেশন ধরবো।

এত ক্লান্ত জীবনে কখনো বোধ করিনি। ফিরতি পথে যেখানে ব্যালেন্টাইনের সমাধি তৈরি করেছিলাম সে পর্যন্ত গিয়ে থামতে হ'লো। ব্যালেন্টাইনের সমাধি এবং রাস্তার অনেকটা জায়গা এমনভাবে ধ্বংস হ'য়ে গেছে যে অনবরত ব্লুপ্রিণ্ট দেখতে অভ্যস্ত দৃষ্টিছাড়া সে জায়গাটা ঠাহর করারও কোনো উপায় নেই। বোমার বৃষ্টি এদিকেও কম হয়নি।

স্কাউটরা বললো, রাস্তা থেকে নেমে বুনো পথ ধ'রে বরাবর দক্ষিণপুবে চলতে পারলে লোকালয় পাওয়া যাবে। দশ পনরো মাইল পার হ'য়ে আবার সড়কে ওঠা যেতে পারে।

চার পাঁচজন লোক নিয়ে পায়ে হেঁটে পাহাড়ের পথ ধরলাম।

তোমাকে চিঠি লেখাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ভাগ্যে এখন শীত বা বর্ষা নয়। বড়ো একটা বার্চ গাছের নিচে আগুন জ্বেলে রাত কাটানোর ব্যবস্থা হ'চ্ছে। তবু হাঁটুর উপরে ডায়েরি রেখে তাতে চিঠি লিখতে বসেছি। রোজ লিখবো।

সড়ক ছেড়ে বুনো পথে নামার পাঁচদিন অতিক্রান্ত হ'য়েছে। দশ পনরো মাইলের জায়গায় পঞ্চাশ মাইল হ'য়ে গেছে। যদি কাল লোকালয় না পাই তবে আবার পিছন ফিরে যেখান থেকে রওনা হ'য়েছিলাম সেখানেই ফিরে যাবো।

এরকম মনের অবস্থা নিয়ে চলছি এমন সময়ে একটি ঝরনার সাক্ষাৎ মিললো। ঝরনার ধারে নিরাবরণ একটি মেয়ে পোশাক কাচ্‌ছে। কিন্তু তার পিঠে ডানা ছিলো না, বরং পাঁজরাগুলো দেখা যাচ্ছিলো। লোকালয় তা হ'লে কাছেই।

এই ভাবতে ভাবতে দেখলাম আমাদের চারিদিকে অন্তত পঞ্চাশজন উপজাতীয় পুরুষ। তারা সশস্ত্র অর্থাৎ তাদের কারো হাতে বল্লম ছিলো, কারো হাতে পাহাড়ী লম্বা দা। তারা কোন জাতীয়? মিকির, দাফলা, আবর? যে কয়েকটি নাম জানি তার বাইরেও কোনো উপজাতি গোষ্ঠি থাকতে পারে। নৃতত্ত্বে আমার অধিকার নেই, কৌতূহলও নেই।

তারা আমাদের গায়ে হাত দিলো না কিন্তু বুঝতে পারলাম আমরা বন্দী হয়েছি।

গ্রামের মধ্যে একটা জায়গা খোলামেলা। গ্রাম বলতে একটা প্রকাণ্ড ঘর, যার ছাদ দেখে আমার উল্টিয়ে রাখা নৌকার কথা মনে হ'চ্ছিল, আর এদিকে ওদিকে ছড়ানো দু'একখানি ছোট ছোট ঘর। খোলা জায়গাটা খেলার মাঠ হ'তে পারে, বাজারের জন্য নির্দিষ্ট হ'তে পারে, বিচারের আসরও হ'তে পারে। সেখানে গিয়ে পৌঁছালাম আমরা।

বেশীক্ষণ বন্দীদশা ভাগ্যে ছিলো না। একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালো সে একটি বৃদ্ধকে কি বললো। সেই বৃদ্ধ কয়েকজনের সঙ্গে কি পরামর্শ করলো। তারা তখন দু' দু'জন উপজাতীয়ের মধ্যে আমাদের এক একজনকে দাঁড় করিয়ে মার্চ করিয়ে নিয়ে গেলো বড়ো বাড়িটার কাছে।

সেখানে কি-কি ঘটেছিলো আমার মনে নেই। পায়ের ফোস্কাগুলো পেকে উঠেছিলো, বোধ হয় বেশী রকমের জ্বরও হ'য়েছিলো। হাতড়ে হাতড়ে খোঁজ করতে গিয়ে দেখেছিলাম কুইনিন ও আন্টিবায়োটিক্স যাতে ছিলো সেই ভ্যালিসটা ওরা সরিয়ে ফেলেছে। দু'দিন কিম্বা ছ'দিন সেখানে ছিলাম, হলপ্ ক'রে বলতে পারি এমন অবস্থা তখন আমার ছিলো না।

মনে হ'চ্ছে সেই বাড়িটার প্রবেশদ্বারে একটি নরকপাল ঝুলানো ছিলো। সেখানে টেম্মা যেন ছিলো। অন্তত আমার ধারণা জ্বরের ঘোরে যাকে দেখেছি সে টেম্মাই।

অন্নপথ্যের ব্যবস্থাও করেছিলো ওরা। আমাদের মতো চাল ফুটিয়েই ভাত করেছিলো। আর আমার সঙ্গীরা যখন একে একে সকলেই এলো তখন বুঝলাম কোনো নরকপাল-লোলুপের হাতে তারা শিকার হয় নি।

এর দু'দিন পরে ডুলির মতো কিছু ক'রে ওরা আমাকে ব'য়ে সড়কে তুলে দিয়ে গিয়েছিলো। এবং ফিরতি একটা কনভয় পেয়ে নেমে এলাম।

যে বাড়ির প্রবেশদ্বারে নরকপাল থাকে তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে তোমার অনেক প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক! মৃত্যু ও হনন যে গৃহের বাস্তু-প্রতিষ্ঠার প্রতীক সেখানে নতুন প্রাণ যেন ছন্দছাড়া। কিন্তু টেম্মার সেই বাংলো বাড়িতে প্রকৃতপক্ষে একটি শিশুকে হামা টেনে বেড়াতে আমি দেখলাম। মলিন শিশু। তবু আধ-আধ কথা ও একটি দু'টি দুধের দাঁতের হাসিতে পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করার আগ্রহে মাটি-কাঠি-নুড়ি মুখে দিয়ে যাচ্ছে।

টেম্মার কথা মনে হ'চ্ছে। 'মজরের কাছে তার নাগরিক জীবনের পরিচয় পেয়েছি। তাকে এখানেও দেখছি। এই শিশুটি তার। টেম্মার সঙ্গে ম্যাগদালেনের সাদৃশ্য থেকেই এই কথাগুলো আমার মনে পড়লো ঃ ম্যাগদালেন ও তার নাগরিক জীবনের খুঁটিনাটিতে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু মূল পরিকল্পনাটি এক। সেই স্বজাতীয় মানুষগুলির সাহচর্য ও ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত হ'য়ে চা-বাগানের মতো বার-মিশালি জীবনস্রোতে স্থিতিহীন ভাসমান অবস্থা। টেম্মার রক্তেও দু'তিন পুরুষের মধ্যে বহু জাতির বহু বিদেশী মনোভাবের মিশ্রণ হ'য়েছে। তার নারী-জীবনে প্রথম জন্ ও দ্বিতীয় জনের মতো কারো শাসন এবং সমাদর লাভ ঘটেছে, এতে সন্দেহ করার কিছু নেই। টেম্মার জননী শ্বেতাঙ্গর ঘর করেছিলো তার প্রমাণ টেম্মার নাক, ভ্রূ ও চোয়ালের গঠন। আর এ অঞ্চলে চা-বাগানের মালিক ও পাদরি ছাড়া শ্বেতাঙ্গ কোথায় পাওয়া যেতো?

আমি যদি গল্প-লিখিয়ে হ'তাম এমন সুযোগ ছাড়তাম না। টেম্মাকে আমি ম্যাগদালেন এই নামেই উল্লেখ করতাম। তাহ'লে আমার এত কথা বলার প্রয়োজন হ'তো না। ম্যাগদালেনের বিগত জীবনের সঙ্গে টেম্মার বিগত জীবনের একান্ত সামঞ্জস্য স্বতঃপ্রমাণিত হ'তো সে ক্ষেত্রে। তোমার যদি বুঝতে অসুবিধা হয় টেম্মা ও ম্যাগদালেন অন্তরের দিক দিয়ে একই ব্যক্তি, তুমি ভেবে নিও ম্যাগ্‌দালেনই টেম্মা সেজে বেড়াচ্ছে, এবং টেম্মা ম্যাগীরই আর এক নাম। ম্যাগদালেন তো একটা চা-বাগানের নাম যা একটা উপাধি হ'তে পারে।

গল্পে স্বাভাবিক হ'লেও বাস্তবজীবনে এমন হয় না যে প্রত্যেক প্রাণের স্বপ্ন সার্থক হবে। টেম্মার স্বপ্ন সার্থক হ'য়েছে। ম্যাগীর সেই স্বপ্নরাজ্য, তিন রাজ্যের সীমার কাছে হারানো সেই রাজ্যের কথা আমার মনে পড়ছে। পণ্ডিতরা নাকি শাস্ত্র আলোচনা ক'রে দেখতে পেয়েছেন প্রকৃতপক্ষে স্বর্গ ব'লে যে কথাটা আছে সেটা মাথার উপরের আকাশের ওপারের কিছু নয়। সেটা নাকি পূর্বপুরুষদের আদি বাসভূমি। তা যদি হয় তবে টেম্মা সশরীরে স্বর্গলাভ করেছে।

এবং ম্যাগ্‌দালেন তার সেই দুষ্প্রাপ্য স্বর্গলোককে হয়তো আমরণ বুকের নিভৃতে পুষে যাবে। জন্‌দের কাছে চাবুক খেয়ে তার বিতৃষ্ণা আসতো চা-বাগানের জীবনে. প্রকৃত বিতৃষ্ণা, সশরীরে স্বর্গলাভের পক্ষে যথেষ্ট ব্যাকুলতা কিন্তু তার প্রাণে হয়তো সঞ্চিত হয় নি, যেমন টেম্মার হ'য়েছিলো। মেজরদের বাধ্যতামূলক সাহচর্যে। ভীমার্জুন পারে নি, একা ধর্মপুত্রই পেরেছিলো।

এই যে কথাগুলো তোমাকে বলছি এ কারোকে বলার মতো নয়। যুদ্ধের সংশ্লিষ্ট আইনকানুনের ভয়ের চাইতে বড়ো কথা, ক্ষতি হয়ে যেতে পারে কারো কারো। (এমন সন্দেহ হ'চ্ছে আমার।) যদি এটা ডায়েরিতে লিখে রাখা চিঠিমাত্র না হ'তো, যদি এটা ডাকে দেওয়ার জন্যও লেখা হ'তো, এ কথাগুলো আমি লিখতাম না।

টেম্মার শিশুটির একটি পাহারাদারও ছিলো। পাহারাদার হওয়ার উপযুক্তই বটে। উপজাতীয়দের কোনো পুরুষ তার কাঁধের সমান উঁচুও নয়। লোকটা অসম্ভব স্থূলকায়। মেদের ভারে তার সহজে নড়াচড়া করার উপায়ও নেই যেন। তবে অন্যান্য উপজাতীয় পুরুষের মতো সে নগ্ন নয়, তার পরনে প্যাণ্টজাতীয় একটা পরিচ্ছদ দেখেছিলাম ব'লে মনে হ'চ্ছে। এই ভীমকায় দেহ অথচ কি অসহায় ভঙ্গি তার। সে যেন কাঁচপোকার বাসায় ধরা পড়া তেলাপোকা।

জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরে দেখতাম লোকটির কাজ হ'চ্ছে বাইরের দিকের বারান্দায় ব'সে সূর্যমুখী ফুলের বিচি ও বাদাম চিবানো আর গলা শুকিয়ে উঠলে দিশি মদ গলায় গল্‌গল্ শব্দে ঢেলে দেওয়া। সত্যই ঢেলে দেওয়া, সে চুমুক দিয়ে খেতো না; লাল হ'য়ে যাওয়া একটা লাউয়ের খোল উঁচু ক'রে ধ'রে গল্ গল্ ক'রে গলায় ঢেলে দিতো। তারপর আস্ত তামাক পাতা জড়িয়ে বানানো চুরুট

ধরাতো। তার স্থূলতা মদ্যজাত কিনা শরীরতাত্ত্বিকরা বলতে পারে। বাইরে থেকে সেই ধীরমন্থরতা দেখে তার পিপাসার তীব্রতা আন্দাজ করা যায় না।

একটা বিষয়ে লক্ষ্য রেখেছিলাম। টেম্মা লোকটিকে সূর্যমুখী বিচি দিয়ে যেতো যেমন, তেমনি তামাক পাতা জড়িয়ে চুরুট তৈরি ক'রে দিতো। লোকটির ডান হাত কুনুইয়ের উপর থেকে নেই।

কিন্তু লোকটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হ'তো তার ভাঙা তোবড়ানো লাল নাকটিতে এখনও ম্যাকসৃনী ধাঁচ আসে।

একদিন সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। আমার গলার স্বরে সে চোখ তুলে তাকালো এবং যেন অত্যন্ত ভীত হ'য়ে তাড়াতাড়ি উঠে গেলো। তেমনি তাড়াতাড়ি টেম্মা এসে প্রশ্ন করলো ইংরেজিতে, 'কিছু চাই ?' 'না, ধন্যবাদ।'

যখন ওরা আমাকে ডুলিতে তুলে রওনা ক'রে দিচ্ছে তখন টেম্মা এসেছিলো এবং এই লোকটি। লোকটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'লো তাকে আমি চিনি। স্থূলকায় নাক চোখ মুখের আকৃতি ঢেকে গেছে, কিন্তু ডান গালে রগ ছুঁয়ে টাঙির দাগ এখনও যেন স্পষ্ট। ব্যালেণ্টাইন!

কিন্তু ডান হাত হারালো কি ক'রে? আর এই কি তার পথিক বৃত্তির পরিণাম! সেই করোটিহীন কঙ্কাল? টেম্মার দরজায় নরকপাল দেখে আমার সেই করোটিহীন কঙ্কালের কথা মনে হয়েছে অনেকবার। সেটা কি টেম্মার সমাজে প্রত্যাবর্তনের প্রায়শ্চিত্তমূল্য? কিন্তু বাকিটুকু তাহ'লে পরিকল্পনা। কঙ্কালের বাহুর হাড়ে আইডেনটিটি ডিস্ক পরিয়ে দেওয়াটা কার বুদ্ধি—ব্যালেণ্টাইন কিম্বা টেম্মার?

টেম্মা যখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার অগম্য ভাষায় ডুলিওয়ালদের কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে আমি লোকটির মুখের দিকে দৃঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। সে ছটফট্ ক'রে উঠলো, কিন্তু পালালো না। তার চোখ দুটি জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো, যেন কিছু ব'লে উঠবে।

আমি মৃদু স্বরে বললাম, 'ব্যালেণ্টাইন? ম্যাগীকে নিয়েই না হয় চলো।' লোকটি কি যেন বলতে গেলো কিন্তু কতগুলি অস্ফুট দেশীয় শব্দই সৃষ্টি করতে পারলো।

টেম্মা হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলো, 'কি চাই, আপনার?' 'না কিছু নয়, ধন্যবাদ।' এই বললাম আমি।

বস্তুত কিছু বলার ছিলো না আমার। করোটিহীন কঙ্কালের বাহুতে আইডেনটিটি ডিস্ক পরানো কিম্বা কঙ্কাল থেকে করোটি খুলে এনে নিজের ঘরের দরজায় বসিয়ে দেওয়া একটি মনোভঙ্গীর প্রাবল্য সূচনা করে। কিন্তু ঘোড়ার চাবুক খাওয়া ম্যাগদালেনদের পক্ষে কিম্বা যোদ্ধা ব্যালেণ্টাইনের পক্ষে তা অসম্ভব নয়।

আমার একটা কথা মনে হ'লো। সেই পাদরির সঙ্গে ব্যালেণ্টাইনের আকৃতিগত

মিল কিছু থাকতে পারে। হয়তো দু'জনেই নর্ডিক ছিলো মুখের গঠনে। পাহাড় থেকে পড়ার পর তাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য কি ধরা যাবে? এ লোকটি যদি ব্যালেণ্টাইন না হ'য়ে নামচা-বাজারের পাদরি হয়, আমার প্রতিবাদ করার যুক্তি নেই।

ডুলি ছাড়লো। টেম্মা ডুলির পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে ভাঙাচোরা ইংরেজিতে কিন্তু গোপন কথা বলার ঢঙে বললো, 'আমরা চিরদিনই এ দেশে থাকতে পারবো না। যুদ্ধের পরে যদি এদিকে কখনো তুমি আস, নামচা-বাজারে আমাদের খোঁজ ক'রো ডরোথি কুঙ্গার খোঁজ ক'রো তাহলেই হবে। আমার স্বামীর চিকিৎসা করার জন্যই যেতে হবে। বেচারার জিভ যেন ক্রমশই আড়ষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। পাহাড় থেকে প'ড়ে গিয়ে মাথায় আর চোয়ালে আঘাত পেয়ে এমন হয়েছে। আর তা ছাড়া এ জীবন আমাদের স্যুট্ করছে না।'

এমন না হ'লে আর জীবনকে কেউ কেউ ট্র্যাজেডি বলেছে কেন। পৃথিবী থেকে স্বর্গ, স্বর্গে পৌঁছেই পৃথিবীর জন্য হাহাকার।

কিন্তু রেল স্টেশনে পৌঁচেচি। কি আনন্দ, কি আনন্দ! একটা ছোট রেল স্টেশন কি অপার আনন্দ দিতে পারে এ আমার মতো আর বোধ হয় কেউ অনুভব করেনি। কয়েক ঘণ্টা বাদেই গাড়ি।

আশ্বিন, ১৩৬১

মধুছন্দার কয়েকদিন

আফিস থেকে এল সে, খুট্‌খুট্‌ ক'রে অবিরত শব্দায়মান হাল্কা বুট তাকে বহন ক'রে আনছে,—ভীতা হরিণীর পা ঠুকবার মতো শব্দ। কিন্তু হরিণীর সঙ্গে তুলনা ঐ পর্যন্তই শেষ ; তার চোখ হরিণীর মতো নয়, নয় সে উৎকর্ণা সঙ্গীতের জন্য, ব্যাধের আশঙ্কায় স্পন্দিত হয় না তার নাসাগ্র। কারণ সে স্ত্রী, মানুষের জাতীয় হ'লেও মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট কিছু সে, যেন বেশী মানুষ (ঠিক অতি মানুষ নয়) ; মানুষকে সে সৃষ্টি করে, লালিত করে, তারপরে তার সোহাগের আদরের বস্তু হয়ে ওঠে। মা, মেয়ে, স্ত্রী হ'য়ে যাদের সে বশীভূত না করতে পারবে সেই অতি দূরের পুরুষও তার প্রভাব মুক্ত নয় ; অন্তত কয়েকটা মুহূর্ত কারো না কারো দৃষ্টি একাগ্র হ'য়ে আসে উদ্বাহু হ'য়ে তার দিকে। রেলগাড়ির জানালায় তার ক্লান্ত মুখখানা দেখবার জন্য, চলতি ট্রামের নিকটতম ব্যবধানটুকু উপভোগ করবার জন্য দীনতা স্বীকার করে কেউ তার কাছে।

মধুছন্দা এইসব ভাবতে ভাবতে আজও আসছিলো। মধুছন্দা তার নাম নয় : (এ রকম অদ্ভুত নাম তার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের হ'তে পারে না।) একবার একটা নাটকে ঐ নামের নায়িকার অনবদ্য অভিনয় সে করেছিলো, তারপর থেকে ঐ নামে ডাকতো তাকে কলেজের সঙ্গীরা। চাকরী নেবার সময় হঠাৎ কতকটা বেপরোয়া হ'য়ে নিজের নাম ঢাকবার জন্য বলে ফেলেছিলো ঐ নাম। এখন বেশ ভালো লাগে তার, অভ্যাস হ'য়ে গেছে ব'লে। এমন কি পর পর তিনটে Consonant-এ 'ছ' তৈরী করে সাহেবকে সে থ' লাগিয়েছে। ফাইলগুলিতে সই দেবার সময়ে সে সি (c) এর পরে এইচ্ (h) দুইটিতে একটু ক'রে প্যাঁচ কষে দেয়। ছোটসাহেব আজও উচ্চারণ করতে পারে না ; বড়সাহেব সিভিলিয়ানি তাগিদে বাংলাবিদ্ হয়েছিলো। সে নামটার দুর্লভতা বুঝতে পারে, তার লেখার পাশে যদৃচ্ছা ব্লু পেন্‌সিল চালায় না। ইংরেজি বাহুল্যও রপ্ত হ'য়ে গেছে। ছোট সাহেব একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, উচ্চারণ কোথায় শেখা, কোন ইংরেজ-গভার্নেস ছিলো কিনা তার শৈশবে। হায়রে পরিহাস ! (ইস্কুল মাষ্টারের মেয়ে মধুছন্দা।)

—কি মনে হয় তোমার ?

—ছিলো হয়তো, কিন্তু ভালো শেখায় নি। বলে সাহেব।

সাহেবের মতটা ভালো কিম্বা মন্দ বুঝতে মধুছন্দার দেরী লেগেছিলো। সহসা সে ভেবে উঠতে পারে নি গভার্নেস রাখবার মতো আর্থিক স্বচ্ছলতা তাদের ছিলো না এই স্বীকৃতি, কিম্বা কল্পিতা গভার্নেস ভালো শেখায় নি—এই অপবাদ কোনটি তাকে মানায়, তাকে আর একটু বিশিষ্ট করে দলের মধ্যে। মধুছন্দা সাহেবকে প্রায় বিদ্ধ করলো দৃষ্টি দিয়ে, তারপরে বললো—এমনি হয় এদেশে।

যারা শুনছিলো ফাইলে দৃষ্টি আনত রাখবার ছলে তারা কি বুঝলো কে জানে। সাহেব বললো,—হয়ই তো, এক বিদেশী কখনও আর একের ভাষা দখল করতে পারে না। সেই থেকে মধুছন্দা গভার্নেস কর্তৃক শিক্ষিতা স্বল্প কয়েকজন অভিজাতের একজন হ'লো। মধুছন্দা ঘটনাটাকে চাপা দিলোনা, দিতে পারতো সে ; অনায়াসে বলতে পারতো—সাহেবকে কেমন বোকা বানিয়ে দিলাম বলো দেখি। ব'য়ে গেছে মেমসাহেবি উচ্চারণ শিখতে।

কিছুই বললো না সে। এমন কি চাঁদ এসে যখন তার উজ্জ্বল অন্বেষী দৃষ্টি তার মুখে ফেলে প্রশ্ন করলো—বলো কী, মাধবী দিদি, গভার্নেস ছিলো তোমার ? তখনও মিথ্যার পা শিরশির করা উঁচু চূড়া থেকে নামবার সুযোগ নিলো না সে। ফাঁকি ধ'রে ফেলবার কারো আগ্রহ তাকে এতটুকু আঘাত করতো না, চাঁদের লঘু প্রচুর পরিহাসের কোলে লাফিয়ে পড়লে। চাঁদের পরিহাস উদ্বাহু হ'য়ে তাকে ইসারা করলেও সে শুনলো না, ভুলে গেলো গত বিশ বছরের মধ্যে গভার্নেস রাখবার রেয়াজই শুধু উঠে গেছে নয়, আভিজাতের অন্য সব লক্ষণের মতো মেয়েদের শিক্ষার পদ্ধতিও আমূল বদলে গেছে। মেয়েদের ফ্রিল দেয়া জ্যাকেটের মতো, হাতপাখার মতো গভার্নেসও গত হয়েছে।

চাঁদ তথাপি বললো,—বলো কী, মাধবী দিদি, গান্ধিজীর যুগে, গান্ধির দেশে বিলেতি মেমের কাছে পড়তে তুমি আপত্তি করো নি ?

কি সেদিন হয়েছিলো মধুছন্দার ; চাঁদ হাত ধ'রে তাকে নামিয়ে আনতে চায় ধাপে ধাপে তবু সে নামবে না, যেন ঐ মিথ্যাটুকুর চূড়ায় সে অচল হ'য়ে থাকতে পারবে, অবিরত সতর্ক হ'য়ে থাকতে তার অসুবিধা হবে না।

যারা কাজ করছিলো না কথা শুনছিলো তাদের কাজ করতে ব'লে মধুছন্দা ফাইল টেনে নিলো। পাঞ্জাবী লেফ্‌টেন্যান্ট দুইজন পর্যন্ত টেবিলে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে কলম তুলে নিলো। এইটুকু মধুছন্দার তৃপ্তি ; জাঁদরেল পুরুষগুলিকে কাজ করাতে দুটি কথাই মাত্র প্রয়োজন।

জ্বর মানুষকে অনেক সময় অকারণে অনুতপ্ত করে। মধুছন্দা জ্বরের ঘোরে একদিন চাঁদকে বলেছিলো,—নিজের আমি একি করলাম, চাঁদ ? নিজের পারিবারিক গণ্ডী থেকে বাইরে ছুটে এসেও থামি নি, নিজের পারিবারিক চালচলন-গুলিকেও অস্বীকার করবার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছি। আমার বুড়ো বাপ মা

আমার শিক্ষাদীক্ষার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করবার করেছিলেন, না থাকুক তাতে রংদার কিছু, কিন্তু তবু তাকে অস্বীকারের দেউলেখানায় এনে ফেলেছি। কেন বলো তো ? আমাকে কি সব বিষয়েই অসাধারণ হ'তে হবে, সব দিকেই চমকপ্রদ হ'তে হবে ?

তখন চাঁদ কিছু বলে নি। আকাশের চাঁদের মেঘলা জ্যোছনা মধুছন্দার রোগশয্যায় এসে পড়েছিলো ; আবেশের মতো দৃশ্য হচ্ছিলো মধুছন্দার মুখের একটা পাশ, একটা হাত, বুকের উপরে টেনে দেয়া ক্লান্ত খয়েরি শাড়িটা। চাঁদ হুঁ মাত্র উচ্চারণ করেছিলো ধোঁয়া ছাড়বার অবকাশে। নির্জন বাদলা রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরেও চাঁদ নাগালের বাইরে বাঁকা ক'রে হাসতে পারে তৃতীয়ার চাঁদের মতো।

তারপরের একদিন চাঁদকে লাঞ্চের সময় চীনে রেস্তোরায় সুস্বাদু অখাদ্যের লোভ দেখিয়ে টেনে নিয়ে মধুছন্দা সংশোধন ক'রে নিয়েছিলো :

"মাঝে মাঝে মনে হয়, সাধারণ হ'তে পারলে, তোমাদের মতো হ'তে পারলে বেঁচে যেতাম। অসাধারণ হওয়ার ঝামেলা অনেক, অনেক দিকে চোখ রেখে চলতে হয়। রীতি নীতি আদব কায়দায় বাঁধা আভিজাত্য দুঃসহ হ'য়ে ওঠে। গালের রং খ'সে গেলো কখন, কোথায় লাগলো বেনারসীতে আলগা ভাঁজের দাগ, কাকে হ'লো না প্রত্যভিবাদন করা, প্রতিদান দেয়া হ'লো না কার সৌজন্যের—প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে, বিশ্রাম বিরাম চায় মন। সাধারণ ক'রে দিতে পারো না আমায়। সেদিন জ্বরের ঘোরে—(মধুর করে হাসলো নিজের দুর্বলতাকে নিজেই করুণা ক'রে প্রশ্রয় দিলো) এই কথাই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম।"

চাঁদ রা করে না। মুরগীর সরু হাড় ছাতু ছাতু ক'রে চুষতে থাকে।

পদশব্দ পেয়ে দরজা খুলে দিলো আর্দালি। মিছে কথা নয়, আর্দালিও পেয়েছে মধুছন্দা। বাড়ি, গাড়ি, ঝি, বোয়, আর্দালি বড়সাহেব দিয়েছে, কিছু সে নিজে যোগাড় করেছে। ভ্যান্সিটার্ট রোতে তার বাসা। রাস্তার নামের জন্যই বাসা নেয়া এই অফিস-সঙ্কুল পল্লীতে। ফ্ল্যাট মাত্র নয়, পুরো একটা বাসা, নেম প্লেট ঝিকিয়ে ওঠা গেটের লতাবিতান সমেত। আর্দালি পোশাক প'রে দরজা খোলে, কারণে-অকারণে প্রতিবেশীদের, দূর প্রতিবেশীদের রক্ষণশীল কর্তাদের মেমসাহেবদের সেলাম দিয়ে আসে। বোয় রেস্তোরা থেকে খাবার নিয়ে আসে দুবেলা, দুবেলা আহার হয় আফিসে। ঝি প্রায় অকাজে কুড়ে হ'য়ে গেলো। রান্নার পাট নেই, যা দু'খানা বাসন সেগুলি মুছে রাখে বোয় ; পোশাক ধোবাবাড়ি থেকে ওঠে ওয়াড্রোবে, আর্দালিই রাখে গুছিয়ে, ঝি কি ক'রে বুঝবে বুশ্‌সার্টের কোন বোতাম কখন সে পরে ? ক্বচিৎ কদাচিৎ প্রয়োজন হয় ঝির,—যেদিন পেঁয়াজের স্বাদে বিষাক্ত বোধ হয় মধুছন্দার, হঠাৎ সেদিন স্নান সেরে পিঠময় কালো চুল এলিয়ে দিয়ে লাল শাড়ির ভাঁজে ঢিলে ঢালা হ'য়ে নোতুন এনামেলের হাঁড়িতে মুগের ডাল সিদ্ধ করতে বসে মধুছন্দা। কয়লা, ঘুঁটে, এনামেলের হাঁড়ি, ডাল, লঙ্কা, তেলের জন্য হাজার বার

ছুটতে হয় ঝিকে।

আর্দালি স্যালুট ক'রে স'রে দাঁড়ালো একপাশে। অদ্ভুত একটা কৌশলে কাঁধের উপরের তিনটে সোনালি তারা ঝিকিয়ে দিলো মধুছন্দা আর্দালির চোখ জুড়ে। এই তার প্রাত্যহিক পুরস্কার।

মধুছন্দার মনে হ'লো আজকের বিকালটিতে তার অবসর। চাঁদ পর্যন্ত আসবে না। অর্থাৎ চাঁদকেও আজ আসতে হুকুম করে নি। মেজরও আসবে না তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে। পূর্ণ অবকাশ আজ। আয়নার সম্মুখে দাঁড়ালো সে, কানের বাঁ পাশের রুক্ষ চুলগুলি দেখে সহসা তার কেমন মায়া হ'লো। ক্যাপের খাকি রেশমের সুতো বাঁ পাশের চুলে লেগে আছে, অথচ সহসা চুলের থেকে আলাদা হ'য়ে চোখে পড়ে নি—এ ঘটনাটি চিন্তাগ্রস্ত করে তুললো তাকে। সঙ্গে সঙ্গে বহুদিন যেগুলি তার নজরে পড়েনি সেগুলি তাকে আচ্ছন্ন করলো, বিব্রত ক'রে তুললো। আঁধারের স্রোতের মতো চুল তার। কান্না আসে যেন। সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়লো লাবণ্য পুড়ে যাওয়া মুখের তপঃক্লিষ্টতা। মরি মরি। একি তাপসীর মূর্তি হ'ল তার! তার অন্তর কী তপস্যা করেছে উমার মতো? মুহূর্ত পরে রোমান্টিক ভাবালুতা বর্জন করলো সে। ঝিকে ডাকলে চেঁচিয়ে, আর্দালিকে পাঠালো ক্যান্টিনে ফেস্‌ক্রিম আনতে। ঝি এলো চুলের ব্যবস্থা করতে। তপস্যাই সে করে যদি, করবে বাঁচার।

বাঁচবে এই প্রতিজ্ঞা তার। আরও বেশী ক'রে বাঁচতে চায় সে। জীবনের প্রথম দশটা বছর হয়তো সে বেঁচেছিলো, কিন্তু ভালো জামা, ভালো এক জোড়া জুতো—এই যখন ছিলো তার অপূরণের দুর্লভ সাধ সে বয়সে কতটুকুই বাঁচতে শেখে মানুষে। তখন হয়তো চাঁদ ধরবার জন্য আব্দার করেছে সে মায়ের গলা ধ'রে, হয়তো তৃপ্তও হয়েছে রাঙতার তৈরী চাঁদ হাতে পেয়ে। তা হলেও, মানুষ অতীত সুখের উদ্গার তুলে বাঁচে না। বাল্যের বাঁচার স্বাদ জিহ্বায় জড়িয়ে থাকে না, মধুছন্দারও থাকেনি। খুকুরাণী এককালে শোভনা হ'য়ে স্কুলে পড়তে গিয়েছিলো। নিজের হ'য়ে বাঁচতে শেখার প্রথম দিনে, কিন্তু জীবন তখনই সরে যেতে সুরু করেছে, বালুচর জাগছে ইতিমধ্যে, কলেজে মৃত্যুর সমারোহে দৃষ্টি নিরুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো। তার মধ্যে অসহ যন্ত্রণায় বিকৃত কণ্ঠে সে একবার অন্বেষণ করেছিলো—আলো কোথায়, আলো কোথায় পাব? তার ফলে ঢাকা কলেজ ছাড়তে হ'লো, কোলকাতায় পালিয়ে এলো সে। যে মরেছে তার বাঁচবার চেষ্টা করা কেলেঙ্কারি, এই অভিজ্ঞতা হ'লো তার।

মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে বাংলাদেশে; সমাজে তার সব চাইতে সম্মানের পরিচয় হবে অমুকের অমুক ব'লে, এই শুধু যথেষ্ট অপমান নয়, ঐ অমুকটিকে যোগাড় করতে হয় উদ্যোগ করে; লেখালিখি, হাঁটাহাঁটি, দাবার গুটি চেলে চেলে। কিন্তু এসব ব্যথা এসব বিড়ম্বনা অন্তঃপুরের সাধারণ মেয়েদের। শোভনা রায় হিসাবেই

মধুছন্দা অনন্যসাধারণ ছিলো। স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বলতে বা ভাবতে লজ্জা হ'তো। অন্যকে মোহাচ্ছন্ন রাখবে এ প্রকৃতি যার সে কি ক'রে মাত্র স্বাধীন হওয়ার জন্য এত কোলাহল করে। স্ত্রীসঙ্ঘের কেউ কিছু বলতে এলে শোভনা এই জবাব দিতো তাদের। তারা বুঝতে না পেরে তাকে রিএক্স্যানারি বলেছে। শোভনা দুঃখে ব্যথায় কেঁদেছে, দেয়ালে মাথা ঠুকেছে, তার কান্নাকে কেউ আমল দেয়নি, দেবার সাহস ছিলো না ব'লেই শুধু নয়, তার ভাষা বুঝতে পারে নি কেউ। মূক ব্যথায় সহানুভূতি যোগানো কঠিন নয়। ব্যথা যখন গভীরতায় প্রচলিত ভাষায় নবতর দ্যোতনা দিতে থাকে তখন লোকে বলে বাড়াবাড়ি, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন।

আদিম যুগের কথা মনে হ'তো শোভনার, যখন একজন মাত্র নয় একাধিক পুরুষ একটি নারীকে কেন্দ্র ক'রে জীবন গ'ড়ে তুলতো। আজও কেন করবে না? নারীর প্রাণশক্তি কি কৃপণ হ'য়ে পড়েছে আজ, বহুকে সে কি প্রাণ দিতে পারে না আর? তাই ব'লে বহুভর্তৃকা হওয়ার অভিলাষী নয় মধুছন্দা, বরং বিপরীত। পৃথিবীতে প্রেম চলে পুরুষের পায়ে, এ কথাটা সে ভাবে আর অবাক হ'য়ে যায়। স্বাভাবিক হবে তখনই ভালোবাসা, যখন প্রেমের পাত্রটি আবার উঠবে নারীর হাতে। ধরা দেওয়া না-দেওয়া হবে তার ইচ্ছাধীন। সেই ক্বচিৎ কিরণে উদ্ভাসিত হবে যে পুরুষ তো সে দুর্লভ সৌভাগ্যবান। সংখ্যায় কি ক'রে একাধিক হবে?

ঝি চুল বাঁধা শেষ ক'রে ঘাড়ে চুলের গোড়ায় পাউডারের সঙ্গে অ্যাস মিশিয়ে বুলিয়ে দিচ্ছে। ক্যানটিন থেকে ফেস্‌ক্রিম এসেছে গলদ্‌ঘর্ম আর্দালির হাতে। প্রসাধন শেষ হ'লো যখন তখন নোতুন রঙ্ করা বুডোয়ার হাল্কা সুগন্ধে ম ম করছে।

আরও আধঘণ্টা পরে পোশাক পালটানো ব্যাপারটা সমাধান হ'লো। গল্পকার হ'য়েও পুনরুক্তি দোষের ভয়ে নারীর রূপবর্ণনা করিনি বহুদিন। আজ করতে হ'লো। এমনি সুগঠিত বক্ষ, এমনি অবয়ব বুশ সার্টের খাকিতে আড়াল হ'য়ে ছিলো কে জানতো? দিনে দশমাইল মার্চ ক'রে রক্তের রঙ্ আরও লাল হয়েছে। রুপোলি আদ্দির পায়জামা ও পাঞ্জাবির অন্তর থেকে স্বাস্থ্য দুর্নিবার রূপে প্রকাশিত হয়েছে। নিজের ছবিতে আয়নায় দৃষ্টি পড়তে লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠলো যোদ্ধৃ নারী। ঠিক এমন অসতর্ক মুহূর্তে চাঁদ আসতে পারে একথা ভাবা যায় না, কিন্তু তাই এলো সে। নিমন্ত্রিত না হ'য়ে রূঢ় কথা শুনবার ভয় না ক'রে বুডোয়ারে প্রবেশ করলো।

—চাঁদ যে, অসময়ে?

চাঁদের পক্ষে বলা উচিত ছিলো, গগনপ্রান্তে আমার উদয় একই নিয়মে চলে, যারা প্রতীক্ষায় থাকে তারা ভাবে আমার পথ অতি দীর্ঘ; যার পোড়া চোখে সয় না আমার উৎসব সে কাঁদে আর বলে—কেন এলে?

চাঁদ একেবারে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

মধুছন্দা নোতুন জীবন সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা করছে। সামনে আদর্শ নেই যে অনুসরণ করা চলে, কাজেই সহচরদের উপরে তার চলবার রীতি কি রকম প্রতিঘাত করে এ বিষয়ে চিন্তা করতে হয় তাকে। চাঁদের দৃষ্টির অর্থ সে খুঁজতে গিয়ে অবাক হ'য়ে গেলো। যে কথাটি তার মনে হ'লো তা এই,—অরণ্যের অধিশ্বরী বাঘিনী সাথীর অন্বেষণে চলেছে কান্তার-প্রান্ত উচ্চকিত ক'রে প্রতিধ্বনিত গর্জনে, বাঘের শিশু সে ডাকে সাড়া দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে; উল্লাসের চাইতে গভীর বিস্ময়, ভয়ের চাইতে বড় মোহ তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিলো।

কিন্তু সাধারণ মেয়ের মতো মধুছন্দা বললো,—কি দেখছো হাঁ ক'রে?

চাঁদের যোগ্য উত্তর হ'তে পারতো—জন্মজন্মান্তরের সাধনায় চাওয়া আমার মৃত্যুকে, বললো—মুড্‌টা বুঝতে চেষ্টা করছি।

প্রশ্রয় দিয়ে বললো মধুছন্দা,—কেন? বলো।

—আজ খেলতে গেলে না টেনিস?

—কার সঙ্গে খেলবো বলো, দুর্ভিক্ষে দেশ ছেড়ে যে সবাই পালিয়েছে। আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে খেলতে জানে এমন লোক দেখিনে।

—শুনি রয়েল গোর্খার দু-একজন অফিসার আছে।

—আছে হয়তো। সেখানেও অসুবিধা বোধ হয় আমার। স্লিমের কাছে যখন খেলা শিখেছিলাম তখন এদিকটাতে দৃষ্টি পড়ে নি। সাধারণ চলতি খেলা ওরা জানে। দৌড়াদৌড়ি ক'রে, লাফিয়ে, প্রাণপণে কোন রকমে পয়েন্ট কুড়িয়ে ওরা সেট দখল করতে পারে, বড় চাল ওদের নেই। আঁচরে আঁচরে ছবি ফুটিয়ে তুলবার মতো খেলাতেও কলার বিকাশ হ'তে পারে তা জানে না ওরা। ওটাকে শ্রমশিল্প বানিয়েছে।

চাঁদ বড় বড় চোখ ক'রে চেয়ে থাকলো। চাঁদ মধুছন্দাকে পরাজিত হ'তে দেখেছে। সেটা বিজ্ঞানের কাছে চারুশিল্পের পরাজয় কি না কে জানে।

চাঁদ অন্যখাতে কথা পারলো—মেজর আসবে না আজ?

—না, আসতে বলি নি কাউকে।

—তা হ'লে একান্ত অবসর আমার?

মধুছন্দা চাঁদকে বিদ্ধ করলো দৃষ্টি দিয়ে, চাঁদের খাকির আস্তরণ ভেদ ক'রে সে তীব্রতা কোথায় পৌঁছালো কে জানে। মসলিনের মতো শালের ওড়না কাঁধ থেকে বাহুতে নেমে এলো মধুছন্দার।

চাঁদ কথার ভঙ্গি পালটে নিলো,—আবেদন শুনবে না বাইরের কেউ, সুতরাং বলি।

—পায়ের কাছে এসে বসো।

—না টেবিলের কাছে যাই, কাগজ কলমের দরকার হ'য়ে পড়তে পারে।

—বেশি ক'রে কবিতা পড়ো নি বুঝি, মুখে বলবার ভরসা পাচ্ছো না?

—সঙ্কোচ হ'চ্ছে, এমনি মূঢ় চাওয়া আমার। শ'তিনেক টাকা দেবে মঞ্জরী দিদি।

মধুছন্দার গর্বে আঘাত লাগলো কি না কে জানে; চাঁদের সম্বন্ধে তাঁর হিসাবে কোথায় একটু ভুল থাকবেই।

চাঁদ টাকা না নিয়ে গেলো না, একটু তকরার হলো তাদের; একটু বাঁকা ক'রে বললো মধুছন্দা।

চাঁদ অকুণ্ঠ চিত্তে প্রায় উদাসীনের স্বরে ব্যক্ত করলো টাকার প্রয়োজন। দেশে দুর্ভিক্ষ মহামারীর সহায়তায় বলদর্পী হ'য়ে উঠেছে। একটি ষোড়শী কুমারীকে এবং তা থেকে তার পরিবারস্থ আর সকলকে বাঁচাবার মতো টাকা দিতে হবে। তার নিজের বেতনের শ'কয়েক টাকার প্রায় সবটাই সে পাঠায় দাদাকে নইলে তিনি অচল—এমনি সব বস্তুতান্ত্রিক কথা। অবশেষে সে স্বীকার করলো ষোড়শী তার কেউ নয়। ব্রহ্মপুত্রের পূবে সে সব ক্যাম্পের এক ক্যাণ্টিনে এসেছিলো সে আহার সংগ্রহের সুযোগ অনুসন্ধান করতে করতে। চাঁদ তাকে সুযোগের জালে জড়িয়ে পড়ার অবকাশ দেয়নি। কাজেই বাধ্য হয়ে ক্ষতিপূরণ করছে।

চাঁদ গেলো শুধু টাকা নিয়েই নয়, গত দু তিন বছরে মধুছন্দা হিসাবে শোভনার মনে বাইরের যে প্রলেপ প'ড়ে অন্তর ঢেকে গিয়েছিলো সেখানে খানিকটা আঘাত ক'রেও। খবরের কাগজে রোজই ঐ মহামারী, ঐ দুর্ভিক্ষ কাহিনী,—আজকাল ঐ খবর এড়াবার জন্য সে পাতা উল্টে যায়। বহুদিনের কোন অতীতে সারাদিনে কিছু না খাবার কষ্টে সেও মুহ্যমান হ'য়ে পড়েছিলো? কিন্তু চাকরির ধাপে ধাপে পা দিয়ে আজ সে যেখানে পৌঁছেছে তাতে নিজেকে বাঙালি, বুভুক্ষু মুমূর্ষু বাঙালির সমজাতীয় ব'লে আর বোধ হয় না।

মধুছন্দা প্যাড টেনে নিয়ে বরিশালের এক গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টারের ঠিকানায় চিঠি লিখতে বসলো। চিঠিটাকে ভাবলো সে:

মিনতি,

ভেবেছিস তোকে আমি ভুলে গেছি। যাই নি, কেউ কোনদিন পারে না। আট ন'মাস মাত্র তোকে দেখিনি, অথচ কতদিন যেন দেখিনি। তোরা ভালো আছিস তো। দুর্ভিক্ষ কি তোদের বাড়ীতে ঢুকতে পেরেছে? নিশ্চয়ই পারে নি, বড়দা নিশ্চয় কিছু উপায় করেছে। বড়দাটা একটু ছেলেমানুষ, অন্যদিকে কি অদ্ভুত পরিশ্রম ক'রে আমার কোলকাতায় পড়বার খরচ যোগাড় করতো। আচ্ছা রে, বাবা আমার কথা বলেন? মার সেই মাথাধরা কি এখনও হয়? তোদের জন্যে মন কেমন করে। আমি যখন ফিরে যাব তখন তোরা আমায় বাড়িতে ঢুকতে দিবি তো? না দিস তো আমি যে বাড়ি করবো, তাতেই সবাইকে নিয়ে আসবো।।

মিনু, একটা বলি, নিশ্চয় রাখবি আমার কথা। এইমাত্র একজন ভদ্রলোক,

আমাদের সহকর্মী, বললেন,—কবে কোন মেয়ে, অল্পবয়সী, অভাবের তাড়নায় মিলিটারির আড্ডায় গিয়েছিলো ভিক্ষে চাইতে। তা যেন তুই করিস নে। কথাটা শুনে আমি শিউরে উঠেছি। তোর মুখখানা মনে প'ড়ে গেলো। কিছুতেই তুই কখনো এই মেয়েটির মতো করবি না। জানিস তো পুরুষেরা একরকম বেহিসাবি আনন্দ পায় আমাদের বিপদে ফেলে। অবশ্য সব মেয়ের বেলায় এমনি দুঃসাহস ওদের হয় না।

প্যাডটা সরিয়ে রেখে না লিখে কি ভাবলো কিছুক্ষণ।

বরিশালের মিনতি এরকম কোন চিঠি পেয়েছিলো কিনা কিম্বা পেয়ে কি করেছিলো জানি না। এমন কি কিছুদিন মধুছন্দার খবর পর্যন্ত রাখতে পারিনি। তার static formation কখন কিভাবে পুরোদস্তুর রেজিমেণ্ট হ'য়ে উঠলো এবং রাতারাতি কতক ট্রেনে কতক প্লেনে আসাম সীমান্ত পার হ'য়ে ব্রহ্মের পাহাড়ে জঙ্গলে পাড়ি দিতে লাগলো এ সব মিলিটারি সিক্রেট। ভ্যান্সিটার্ট রো-এর বাসায় তালা ঝুললো না—এইটুকু মাত্র জানি। চাঁদ কি ক'রে ওদের আঙুলের ফাঁকে বেরিয়ে পড়েছিলো ওদের সর্বগ্রাসী মুষ্টি থেকে। সে রয়ে গেলো কোলকাতায়, মধুছন্দার বাসায়, মধুছন্দার বুড়োয়ার সিগারেটের ছাইয়ে, ভুক্ত-অন্তর খাবারের টিনের কৌটায় জঙ্গলাকীর্ণ করতে লাগলো। ঝি তার রান্না ক'রে দেয় কদাচিৎ, কাজেই আপত্তি করে না হুজুরাইনের বাড়িঘর বেমিসিল করায়। আর্দালি তার মনিবের সঙ্গে গেছে জাপানীকে রুখতে, কাজেই চাঁদের নিরুপদ্রব বিশ্রামে কেউ বাধা দিলো না।

খবর পেয়ে চাঁদ বললো,—শালা। কিন্তু মধুছন্দাকে শালা ব'লে আরাম পেলো না আজ। অফিসে যখন পৌছলো সে, তখনও রাত আছে, পথের গ্যাস সাঁ সাঁ ক'রে জ্বলছে। দরজায় আর্দালিকে স্যালুট ফিরিয়ে না দিয়ে, পাস ওয়ার্ড না ব'লে, গুলি খাবার ঝুঁকি নিয়ে পড়ি কি মরি করে তেতালার ইন্‌ফরমেশন ব্যুরোতে গিয়ে উঠলো সে। জমাদার আদিত সিং অবাক হ'লো তাকে দেখে, দুটো কথা যে খরচ করে না তার মুখে চোখে যেন কথা উপচে পড়ছে। কিন্তু ক্যাজুয়ালটি লিস্টের আট দশ পাতার ক্ষুদে টাইপে লেখা হতভাগ্য নামগুলি বার বার প'ড়েও মধুছন্দার নাম খুঁজে পেলো না সে। হতের তালিকা আহতের তালিকায় না পেয়ে আদিত সিংকে ডাকলো সে। টেবিলের উপরে আলোর দগদগে বাল্‌বের নীচে বিছিয়ে নিয়ে দু'জনে মিলে নিখোঁজের তালিকাও দেখলো। সেখানেও মধুছন্দার ডাবল্ এইচ্ নেই। দ্বিতীয়বার শালা বললো চাঁদ, এবার নিজেকে। তবে কি দুঃস্বপ্ন! না। সুবাদার ধীরেন ব্রহ্ম খবর দিয়েছে মধুছন্দাকে হঠাৎ কদিন থেকে সে দেখেনি। ধীরেন ব্রহ্মকে চাঁদ ছোটবেলা থেকে চেনে, নিজে সুপারিশ ক'রে তাকে চাকরিতে খানিকটা তুলে দিয়েছে। তবু আদিত সিংকে প্রশ্ন করলো চাঁদ,—ধীরেন ব্রহ্ম ব'লে কেউ আছে সুবাদার গোর্খা রাইফেল্‌সে। দুলাখ তেত্রিশ হাজার নামের মধ্যে এক

মিনিটে ধীরেন ব্রহ্মের নাম পাওয়া গেলো খুঁজে, যেন না খুঁজেও পাওয়া যেতো। চাঁদ শালা বলতে গিয়ে থেমে গেলো। মেজরের কাছে ছুটি নিয়ে চাঁদ বেরিয়ে পড়লো। লাকসাম, কুলাউড়া, আখাউড়া, তিনসুকিয়া, সিরাজগঞ্জ, দেউলালি ঘুরে এসে মধুছন্দাকে পেলো সে রানাঘাট স্টেশনের ছোট লম্বা বেঞ্চিতে। আর্দালি তাকে চিনতে পারলো। মধুছন্দা চোখ মেললো, লাল টক্ টক্ করছে চোখের সাদা অংশটুকু।

ভ্যান্সিটার্টের বাসায় কোলে ক'রে নামিয়ে আনলো মধুছন্দাকে চাঁদ। ক্যাপ্টেন মধুছন্দা এত লঘু এত কোমল এ চাঁদ জানতো না। পাছে মিলিটারির লোক এসে হসপিটালে নিয়ে যায় তাই সেবা করবার ইচ্ছায় অসুখের কথা সাফ গোপন করলো চাঁদ। কিন্তু দুদিন দুরাত কাটলো বমি সাফ ক'রে। চাঁদের মন সমগ্র স্ত্রীজাতির প্রতি বিমুখ হ'য়ে উঠলো। ছিঃ ছিঃ, এমন দুর্বল এমন পলকা যার শরীর তার কেন এসব জাঁদরেলি কাজে নামা। সকালের দিকে জ্বর কমতে শুনিয়ে দিলো মধুছন্দাকে। কুইনাইন ইন্‌জেকশন যা পারে নি, ধমক তা পারলো। তিনদিনের পর সকালে উঠে ব'সে আরও কিছু দিনের ছুটি চেয়ে পাঠালো মধুছন্দা। চাঁদ নিচের তলায় এক অন্ধকার ঘরে গিয়ে আর্দালিকে ওষুধ আনতে পাঠিয়ে সেই যে দরজা বন্ধ ক'রে ঘুম দিলো পরের দিন সকালের আগে তার দেখা পাওয়া গেলোনা। অবশ্য দেখা পাওয়ার জন্য কেউ বড় একটা ব্যস্তও ছিলো না। শুধু আর্দালি খইনির ডিবে খুঁজতে এসে বার দুই ধাক্কা দিয়েছিলো দরজায় ; আর রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে মাথার কাছে কারো হাত খুঁজে না পেয়ে বালিশ আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিলো মধুছন্দা। মাথার কাছে যার হাত খোঁজ করছিলো পাশের খাটখানায় সে লোকটা আছে কি না এ সন্ধানে তার প্রয়োজন হ'লো না, করলোও না।

জোড়া খাটের আর একখানা উঠলো চিলেকোঠায় ; ড্রেসিং টেবিলের বার্‌নিসে শুধুমাত্র ক্ষীণ দাগ রেখে ওষুধের শিশি, ফিডিংকাপ, জ্বরের চার্ট, আইসব্যাগ অদৃশ্য হয়েছে। এখনও ঘর ম ম করে না বটে সুগন্ধে, ইতিমধ্যে ব্লাউজের ভাঁজে ভাঁজে রাখা মৃদু চেরির গন্ধ মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু বর্মা থেকে সে শুধু জ্বর নিয়ে ফেরেনি। দিন সাতেক পরে একদিন কর্তব্য বোধ চাগিয়ে ওঠায় চাঁদ ভ্যান্সিটার্ট রো'তে উপস্থিত হ'লো। দোতালার হল ঘরটিতে (যা এতদিন আসবাব শূন্য হ'য়ে করিডোরের কাজ করতো) মধুছন্দাকে পাওয়া গেলো। পরনে আমেরিকান ব্লাউজ, আর বর্মানিজ লৌঙ্গি, জাফরান রঙের ব্লাউজ আর সোনালি সিল্কের লৌঙ্গি। ঘরের মাঝখানটিতে কাচের নাতিবৃহৎ টেবিল, টেবিলের চারিপাশে গুটি কয়েক হরিণ শিঙের চেয়ার, টেবিলে ডিক্যাণ্টারে সোনালি রঙের খানিকটা, পাশে একটা ছোট জারে ডালিমফুলী রঙের খানিকটা

বিলেতি সুরা। মধুছন্দার মুখে চোখে করুণ অনুতাপ আশা না করলেও খানিকটা লজ্জা ও কুণ্ঠা আশা করেছিলো চাঁদ।

মধুছন্দা এগিয়ে এসে দুহাত দিয়ে চাঁদের দুহাত ধ'রে স্বাগত করলো ওকে; শোবার ঘরে নিয়ে গেলো তাকে, বসালো নিজের খাটে, নিজে বসলো তার পাশে তবু হাত ছাড়লো না। মধুছন্দার চোখ দটি তীব্র ঝাঁঝালো মিষ্টিতে ভ'রে টস্‌টস্‌ করছে। চাঁদের অবাক লাগতে লাগলো; ছোট্ট একরত্তি ছেলে নয় সে, দু বাহুর সাহায্যেই সে মধুছন্দাকে মাটি থেকে তুলে তালগোল পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে।

মধুছন্দা দুতিনবার কথা বলবার চেষ্টা ক'রে থামলো; অবশেষে বললো,—এতদিন আসো নি কেন? এখানে জোড়া খাট ছিলো মনে আছে? তুমি যে বাল্‌ব বদলেছিলে এ ঘরের, এখনও সেইটে আছে; তোমার পছন্দকে নাকচ করতে পারিনি। আজ হঠাৎ আমার মনে পড়েছে জোড়া খাট এঘরে বেমানান হয় না।

চাঁদের বলতে ইচ্ছা হ'লো—দুদিন অপেক্ষা ক'রে তারপরেও এ সব বিদ্যার পরিচয় দেয়া চলতো। শরীরে এখনও রক্ত ফেরেনি।

কিছু না ব'লে সিগারেট ধরালো, খানিক পরে বললো,—মাথা ঘোরে না তো? সেইটে খেয়াল রেখো।

মাথা পিছনে ছুঁড়ে দিয়ে হো হো ক'রে হেসে উঠলো মধুছন্দা। বললো,—ভাগ্যে তুমি এসেছো। ফ্রন্টে স্বদেশী ছেলের বিচার হয়েছিলো স্পাইয়িং-এর জন্যে। তাকে ওরা গুলি ক'রে মেরেছে। শেষ কথা সে আমার সঙ্গে বলেছিলো, বলেছিলো—ভাবতেও পারছিনে আমি থাকবো না, আর কয়েক মিনিট পরে চিরদিনের জন্যে লোপ পেয়ে যাবো। তার জন্যে এটা ধরেছি, তার জন্যে কেঁদেছি, বড্ড বেশী তোমার মতো দেখতে ছিলো সে।

অন্য সময়ে চাঁদ বলতো—ইয়া। মধুছন্দার মুখের দিকে চেয়ে সে অবাক হয়ে গেলো—চোখ দুটি ছলছল করলো যেন। গত ছ মাস যার ডাগ-আউটের স্বল্প পরিসর গর্তে অস্নাত পুরুষের ঘামে ভেজা গায়ের গন্ধে গা মিশিয়ে ঘুমুতে হয়েছে, রক্ত-মিশানো জমাট কাদা যার বুটে এখনও লেগে আছে খাঁজে খাঁজে, তার এমন চোখ দুটি দেখে অবাক হ'য়ে গেলো চাঁদ। সন্ধ্যার অন্ধকার তেমন গাঢ় হওয়ার আগে চাঁদ বিদায় নিলো। যাওয়ার সময় অনুরোধ ক'রে গেলো,—হুঁসিয়ার হ'য়ে থেকো, মাথা ঘুরে প'ড়ে গেলে শিরাটিরা ছিঁড়ে বিপদ হ'তে পারে।

কিন্তু মাথা ঘোরা অবস্থাতেই একদিন চাঁদকে আসতে হ'লো, দেখতে হ'লো এমন ভাগ্য তার।

কে কে নিমন্ত্রিত হয়েছিলো জানি না। পরে শুনেছি মেজর সাহেব নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, চাঁদ নিমন্ত্রিত হয়নি। সেই হলঘর, কাচের টেবিল, কাটা-কাচের গেলাস, জার, ডিক্যান্টার, কাচ কড়ির পেয়ালা পিরীচ, বার্নিশ করা রুপোর ট্রে, কাঁটা চামচ

সবগুলি দর্পণ-ধর্মী। বিচিত্র বর্ণের আহার্য পানীয় সবগুলিকে বিচিত্রতর করেছে। মধুছন্দা টেবিলের পাশে কারণে অকারণে ঘুরছে। সবগুলিতে প্রতিফলিত হচ্ছে তার বর্ণাঢ্য অবয়ব, অথবা এইটেই সব চাইতে বড় কারণ তার ঘুরে বেড়ানোর।

আর মধুছন্দা নিজে ? হায়, আমি বঙ্কিমচন্দ্র নই যে তার বর্ণনা করি।

মেজর শ্যাম্পেন খেয়েছে সন্ধ্যায়, এখন ক্লারেট খাচ্ছে, খাঁটি ইজিপ্সীয়ান সিগারেটও চলছে। লোকটি একান্ত ভদ্র, নিজের সঙ্গে সে সন্ধ্যা থেকে যুদ্ধ করছে। পুরো আহারের পর ডেসার্টে শ্যাম্পেন যখন সে চেয়েছিলো তখন সকলে অবাক হয়েছিলো। তারপরে যখন সে ক্লারেট চাইলো এবং মধুছন্দা তার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে মৃদু মৃদু হেসেছিলো তখন তার মনে হ'লো মধুছন্দার পাশে ব'সে তার অঙ্গ বিচ্ছুরিত যে উত্তাপ তার সর্বদেহে সঞ্চারিত হ'য়ে গেছে তার দাহ মিটাবার জন্যেই সে ক্লারেট চেয়েছে ডেসার্টের পরে।

সবাই চ'লে গেছে এখন এই স্মোকিং রুম থেকে। গভীর রাত্রিতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে মানুষ যেমন রাত্রির আবেশকে ছিন্ন করবার ভয়ে গলা নিচু ক'রে কথা বলে তেমনি ক'রে মধুছন্দা জিজ্ঞাসা করলো—যাবে না ?

কানে কানে বলার মতো ক'রে মেজর বললো—না।

ফিস্ ফিস্ ক'রে মধুছন্দা বললো—কেনো ?

তারপরেই চাঁদের উক্ত সেই মাথা ঘোরা ব্যাপার, রূঢ় হাতের মার খেয়ে আবেশ ছেঁড়ার ঘটনা। চাঁদ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দেখছিলো। দু' পা পিছিয়ে গিয়ে মধুছন্দা ম্যাণ্টেলপিসে রাখা ক্রোমিয়াম প্লেটেড রিভলবারটি তুলে নিয়ে মেজরের চোখ দুটিকে নিশানার এক্তিয়ারে এনে ফেললো ; তারপর হেসে উঠলো। গোটা একটা কাচের ঝাড় বুঝিবা আলোর আতিশয্যে চূর্ণ হ'য়ে গেলো কাছে কোথায়।

কিন্তু চাঁদ যখন এক নিমেষে তার পাশে এসে দাঁড়ালো, বললো—ইয়া। তখন যেন কেঁদে ফেললো মধুছন্দা। একবার ভেবেও দেখলো না নির্বাক চাঁদ আজ মনের কথা মুখে উচ্চারণ করতে পেরেছে। আর চাঁদ ? করুণায়, স্নেহে, খোপা ভাঙ্গা চুলের ভারে, নারীদেহের কোমলতায় নিজেকে কোথাও খুঁজে পেলো না।

তাকে সোফায় বসিয়ে দিয়ে চাঁদ যখন দূরের সেটিটাতে ব'সে সিগারেট ধরালো তখন মধুছন্দা আশায় ভ'রে উঠলো—এইবার চাঁদ তাকে শাসন করবে, তিরস্কার করবে। তার বহুদিনের স্বপ্নে দেখা ব্যাপারটা সত্য হবে, সফল হবে। কিন্তু স্বপ্নে চাঁদের বেত্রাঘাতে জর্জর হওয়ার যে সৌভাগ্য সে লাভ করেছে তা কি সত্য হয় ?

চাঁদ সিগারেট ধরালো, ব'সে বসে দুললো। অবশেষে মধুছন্দা বললো,—কেন এসেছো তবে ? বলো বলো। রূঢ় হ'তে তুমি পারো না, আমি জানি। ভয় ক'রো না আমার মনের কোমলতাকে থাবলে দেবে তোমার কথা। ও তোমার ক্ষমতার বাইরে।

মধুছন্দার কথার রেশ ম'রে যাওয়ার অবসর দিয়ে চাঁদ বললো,—কিছু টাকার দরকার হয়েছে আবার।

চাঁদ ভেবেছিলো মধুছন্দা ঘর থেকে চ'লে যাবে। গেলো না। ক্লান্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো—কাল আপিসে মনে ক'রো।

কথাটা ভালো লাগলো না চাঁদের! বড্ড বেশী দাতার ভাব ফুটিয়ে দিলো মধুছন্দা। চাঁদ বক্তৃতা দিলো: বিয়ে করবো, মাধবী, টাকা চাই ছুটি চাই। বড্ড ভুল করেছি বিয়ের কথায় রাজী হ'য়ে, এখন দেখছি বিয়ে করা আর বেকুব হওয়া একই কথা। বাসরঘর ইতিমধ্যে অতীতের ঐশ্বর্যে পরিণত, বধূকে প্রত্নতাত্ত্বিক ক্লিওপেট্রা ব'লে বোধ হচ্ছে।

আমি জানতাম বিয়ের কথায় মেয়েরা বক্তা হ'য়ে ওঠে, সে নিজেরই হ'ক আর পরেরই হ'ক, (পরের হ'লে বরং কানেও শুনতে পাওয়া যায়); আর জানতাম বেটাছেলেরা বাঁধা পড়তে আনন্দ পেলেও মুখে অন্তত কড়া কড়া প্রতিবাদ করে। এক্ষেত্রে দেখলাম সে সব কিছুই হ'লো না। নির্বাক চাঁদ বিয়ের কল্পনায় বাগ্মী হয়েছে, আর মধুছন্দা এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের সংবাদ আকস্মিকভাবে পেয়েও এতটুকু উৎসুক হ'ল না।

বিটারস্, এবসাঁথ বা ফ্রেঞ্চ ভারমাউথ যে জন্যই হ'ক ককটেলের পর থেকেই মুখ ও তা থেকে সারা দেহ ও সমগ্র মন তিক্ত বোধ হচ্ছিল মধুছন্দার, অন্তত এই রকম অনুভব করলো সে। হয়তো তার নিস্পৃহতার অন্যতম কারণও এইটি।

পরের দিন আফিসে গিয়ে বেলা এগারোটায় চাঁদকে ডেকে সে চেক্ দিয়ে দিলো মোটা অঙ্কের। চাঁদ চাওয়ার বেশী পেয়ে খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থেকে সাদা দাঁত ঝিকিয়ে স্যালুট করলো বুট ঠুকে। তার অপসৃয়মান চেহারার দিকে তাকিয়ে থেকে মধুছন্দা কি ভাবলো তারপর কলমের ঢাকনি খুলে ফাইলের পর ফাইল সই করতে লাগলো। বারোটাতে মধুছন্দার মনে হ'লো চাঁদকে ডেকে জানিয়ে দেবে তার ছুটি সে মঞ্জুর করবে, এতটুকু দ্বিধা তার হবে না। মিনিট দু'এক দেবো কি দেবো না ক'রে খবরটা দেবার জন্য চাঁদকে ডেকে পাঠালো।

—বিয়ের পর কোথায় যাবে তুমি?

—তুমি কি তোমার কাছে এসে থাকতে বলবে না?

--তা মন্দ হয় না। নবদম্পতির কপোত-লীলার কূজন-প্রতিধ্বনি শুনতে পাবো।

—তা হ'লে তাই।

—কিন্তু আমি হয়তো থাকবো না। কাশ্মীরে যাবার ইচ্ছা হয়েছে। মনতোষকে মনে নেই? হ্যাঁ সেই ডাক্তার কর্ণেল মনতোষ মিত্তির, সে বারবার লিখছে।

এই কথাগুলি কিছুক্ষণ পরে বললো মধুছন্দা, একটু ভেবে চিন্তে; গল্পকারের মতো কথা ওজন ক'রে ক'রে, শ্রোতার পরে কথার কাজ লক্ষ্য রেখে রেখে। চাঁদ এ

অবতারণার কারণ বুঝতে না পেরে ফিরে গেলো।

চাঁদ খুব আশা করেছিলো লাঞ্চে আজ কোন বাইরের রেস্তোরাঁয় যাবে মধুছন্দা এবং তাকে সঙ্গে নেবে। চাঁদের অনেক পরামর্শ ছিলো তার সঙ্গে ; কিন্তু মধুছন্দা বাইরে গেলো বটে, মোটরের গতি তীব্রতর করলো বটে, চাঁদকে সঙ্গে নিলো না।

বেলা তিনটেতে চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে দিয়ে মধুছন্দা চাপরাশিকে দিয়ে ডেকে পাঠালো চাঁদকে ; কিন্তু চাঁদ ততক্ষণে বরিশাল একস্‌প্রেসে চেপেছে শেয়ালদায়।

কার সঙ্গে বিয়ে, কোথায় বিয়ে, কি রকম মেয়ে, একালের না সাবেকি এসব অনেক কথা জানবার ছিলো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা, কৌতূহল থাকা দুর্বলতা কি না এ বুঝতে না পেরে মধুছন্দার জানা হয়নি।

আফিস থেকে বাসায় ফিরে সন্ধ্যায় আসা ডাকে তার কৌতূহল নিরসন হ'লো, একটু বা আশাতিরিক্তভাবে, একটু বা প্রয়োজনের অতিরিক্তই হ'লো।

বরিশালের সেই স্কুল মাস্টার, যিনি শোভনারূপে মধুছন্দার বাবা ছিলেন, তিনি লাল ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্র দিয়েছেন, মিনতির বিয়ের। মিনতিও একখানা পোস্ট কার্ডে তাকে চিঠি লিখেছে, সঙ্কোচ নেই, কুণ্ঠা নেই। বিয়েটাকে মিনতি নেহাৎ কর্তব্যবোধে করছে যেন তবু তার মধ্যেও একটা অভিনবের সুর আছে। লিখেছে—তুমি আসবে, দিদিভাই। চিঠিতে সে বরের নামও উল্লেখ করেছে—চন্দ্রকান্ত সেন তার নাম। কৌতূহল নিরসন হ'লো, অতিরিক্ত পাওনাটুকু ছিলো, তা মিললো চাঁদের টেলিগ্রামে। দীর্ঘ বিস্তারিত টেলিগ্রাম, বনগাঁও থেকে করছে, মাধবীদিদি তার পেয়ে রওনা হও। মিনতির সঙ্গে আমার বিয়ে। অনেক কথা বলবার ছিলো, আফিসে বলা হয়নি, মুখ ফুটে বলতে পারিনে বলেও বটে। কালকের বরিশাল একস্‌প্রেস ফেল ক'রো না। প্রণাম নাও।

মধুছন্দা একসঙ্গে চিঠি দুটি ও তারখানি টেবিলে নামিয়ে রাখলো। একটা কথা মাত্র তার মনে হ'লো : চাঁদ যখন সে তখন উদাসীন হ'তে পারে না। একটা কিছু করা দরকার। চাঁদের সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে সে নিস্পৃহ থাকবে কি করে? তা কি সম্ভব ? মনে পড়লো, চাঁদ, ভীরু নির্বাক চাঁদ।

হঠাৎ সে ফোন তুলে নিলো। সাউথ ফাইভ ও নাইন থ্রি। হ্যালো। মেজর যেন তার ডাকের অপেক্ষাতেই ছিলো, ব্যগ্র হ'য়ে সাড়া দিলো।

—আচ্ছা, মেজর, চাঁদ তোমার কাছে ছুটি নিয়েছে ?

—না।

—সে কি, আশ্চর্য ! সে তো কোলকাতায় নেই। বনগাঁও থেকে তার করেছে আমার কাছে।

—তুমি ছেড়ে দিলেই হ'লো, দু'একদিনের ব্যাপার তো।

—তার দরখাস্ত পেয়েছি বটে, মঞ্জুর করিনি। হাসছো তুমি ? ও, তার বিয়ে ?

বেশ তো বিয়ে, কিন্তু তাতে কি মিলিটারি আইন ভাঙবার অধিকার জন্মায় ? না, না, এ রকম নজির ভালো নয়।

—কোর্ট মার্শাল বলছো ?

—নয় তো দেওয়ানি মামলা হবে ? না। আমি হাসছি না। কে বলেছে আমি হাসছি ?

ফোন ছেড়ে দিয়ে মধুছন্দা ফিরে গেলো সোফাটাতেই। পথে ড্রেসিং টেবিলটা থাকায় তার প্রতিবিম্বটা তার পাশ দিয়ে চ'লে গেলো এমন মনে হ'লো—অন্য আর একটি মহিলাই যেন। কিন্তু সে একেবারে চ'লে যাওয়ার আগে আয়নাটার সামনে একটু দাঁড়ালো মধুছন্দা। ঘেরাটোপ দেয়া আলোর ছায়াটাও পড়েছে। কানের কাছে কালো চুলের গায়ে যেটা চক্ চক্ ক'রে উঠলো আজও সেটা খাকি সিল্কের আঁশ—বেরেট ক্যাপ থেকে যা লেগেছে। গালে রেখা পড়লো, অনেকটা হাসির মতোই ভঙ্গি, ঠোঁটের দু'পাশ আকুঞ্চিত হ'লো।

সোফার সামনে ল্যাকারের কাজ করা টিপয়ে ঝিনুকের তৈরী অ্যাশট্রেটা। তার গায়ে হেলানো ছিলো পাইপটা। মেজর উপহার দিয়েছিলো একদিন ; আর চাঁদ বলেছিলো—ইয়া, একেবারে কলমের মতোই, নিব লাগালেই হ'লো। ড্রয়ার্স থেকে সিগারেট বার ক'রে এনে পাইপে পরালো মধুছন্দা।

আগুন না ধরিয়ে ফোনের কাছেই বরং উঠে গেলো সে আবার।—আ, মেজর ; আমিই বটে। আসবে নাকি ? (ঝিলমিল ক'রে হাসলো মধুছন্দা !) রাত হয়েছে ? হ'লোই বা। কত আর ? কিম্বা র'সো, আমিই আসছি। হ্যাঁ।

ওয়াড্রোব থেকে ঝক্‌ঝকে ইস্ত্রির বুশসার্ট আর ট্রাউজার্স এলো। আর্দালি যখন জুতো জোড়া এগিয়ে দিচ্ছে, সোফার গায়ে পা রেখে একটু হেলে দাঁড়িয়ে মোজা পরতে পরতে সিগারেটে আগুন ধরালো মধুছন্দা ; চাপা দাঁতের ফাঁক দিয়ে চুলের মতো সরু নীল-নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলো। স্নাগ্ ক'রে সে হাসলো রিন্ রিন্ ক'রে। আর্দালি জুতোটা একেবারে পায়ের কাছে এগিয়ে ধরেছে।

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩

দুলারহিন্‌দের উপকথা

এই একটা দেশ। সব চাইতে কাছের রেলপথ পাঁচশ ক্রোশ দূর দিয়ে গেছে। বহু বহু ক্রোশ চললেও কৃষকের দেশ শেষ হয় না। মকাই-জোয়ারের দেশ। বৃত্তের পরিধির মতো পাহাড় এবং শাল-মহুয়ার বন। সেই পাহাড় এবং অরণ্য যদি পায়ে হেঁটে পার হও তবে সভ্যতার প্রান্তগুলি চোখে পড়তে পারে।

সেই দেশে ভুখন কৃষকের জমিতে মজুরের কাজ করে, ভইসা টহলায়।

ভুখন একা নয়, তার সঙ্গে দুলারহিন্‌-ও থাকে। ভুখন আর দুলারহিন্‌ নিজেদের ভাইবোন ব'ল ভাবতে শিখেছে। ওরা সহোদর নয়। ভুখনের মায়ের মৃত্যুর পরে ভুখনের বাবা সর্বস্বান্ত হ'য়ে যাকে ঘরে এনেছিলো তারই এ পক্ষের মেয়ে কিম্বা বেটা-বউ দুলারহিন্‌।

দুলারহিন্‌ যখন এই কুঁড়েটিতে প্রথম আসে তখন ভুখনের বয়স ছ' বছর, দুলারহিনের নিজের আট দশ হবে। দুলারহিন্‌ ভুখনের বাবা ও তার সৎমাকে ভুখনের মতোই বাবা-মা বলতো। ভুখনের যখন আট বছর এবং দুলারহিনের বছর বারো প্রায় একদিনেই এই কুঁড়ের বাপ-মা প্রাণী দুটি বিদায় নিলো। এখন এমন কেউ নেই যে ওদের সম্বন্ধের জট খুলে দিতে পারে।

ভুখনের বয়স এখন একুশ বাইশ হ'লো, দুলারহিনের আরও দুবছর বেশী প্রায় পনরো বছর গড়িয়ে গেছে ওদের জীবনের। যাদের সম্বন্ধ নিয়ে এত খুঁটিনাটি তাদের জীবনের পনেরোটা বছর ছুড়ে ফেলে দেওয়ার কি যুক্তি? বিশ্বাস করো, এ সময়ের মধ্যে কিছু ঘটেনি।

ভুখনের চেহারা নিম্ন প্রকারের : তামা ও ছাই রঙে মিশানো একটা রঙের ত্বক্‌। স্ফীতপেশী দেহ, মস্ত বড় মুখে ছোট একটা নাক। মাথার চুলগুলি ধুলোয় কটা, আর সেই খোঁচা খোঁচা ছোট ছোট চুলের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক গোছা কড়কড়ে টিকি। পরনে দেড়হাত চওড়া কাপড়ের ফালি কতকটা পালোয়ানী ঢঙে পরা।

দুলারহিনের স্বাস্থ্য ভালো। বয়সের চাপে ত্বক্‌ যেন ফেটে যাবে। তার মুখাবয়বেও শাস্ত্রোক্ত সৌন্দর্য আছে বলা যায় না গত পনরো বছরের একটি মাত্র

ঘটনা—তার বসন্ত হয়েছিলো। দাগ রেখে গেছে। তার ফলে ফুটকিতে আচ্ছন্ন তার মুখ বেলে পাথরের বহু পুরাতন প্রতিমূর্তির মতো।

ওদের সংসার মন্দ চলছিলো না। সংসারে লোক বাড়বে এমন সম্ভাবনা চোখে পড়ে না। ভুখন বিয়ে করতে পারছে না, অন্তত তিন কুড়ি টাকা লাগবে যে কোন রকম একটা বিয়ে করতে, তার কমে কে মেয়ে ছাড়ে কিম্বা বোন। সদ্ভাবেই দিন যাচ্ছিলো।

এমন নয় যে ঝগড়া হয় না, হয়, ইতিমধ্যেই একদিন হ'য়ে গেলো। একই কুঁড়ের মেঝেতে খেজুর পাতার দু'খানা চাটাই পেতে শোওয়া। বাপ-মা চ'লে যাওয়ার পরে ভুখন বহুকাল দুলারহিনের বক্ষলগ্ন হ'য়ে ঘুমিয়েছে, ইদানীং ছোট জায়গায় শুতে ভুখনের অসুবিধা হ'তো, অতবড় হাত পা গুলোকে দুমড়ে ছোট ক'রে সে এখন ঘুমোতে পারে না। কিন্তু এক রাত্রিতে সে খুব বেকায়দায় প'ড়ে গেলো। চাল ফুটো করা, বর্ষায় তার অংশের মেঝেটুকু কাদা হ'য়ে আছে। সে ভাবলো দু' একরাত তার মস্ত শরীরটাকে গুটিয়ে কোন প্রকারে দুলারহিনের পাশেই কাটিয়ে দেবে, কিন্তু আপত্তি তুললো দুলারহিন্, নেহিন্।—দেখ, দুলারী, দুলারি করো না। এমন অবস্থা নয় আমার একদিনে চালটা সারিয়ে নেবো। দু' একদিনই তো অসুবিধা হবে আমার, সে কিছু নয়।

দুলারহিন্ ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর কুঁড়ের শুকনো জায়গাটায় ভুখনের চাটাই পেতে দিয়ে ঘরের ঝাঁপ তুলে বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। রাগে ভুখনের ঘাড়ের শিরাগুলি অবধি ফুলে উঠলো। লাফিয়ে গিয়ে দুলারহিনের কাঁধ দুটো তার দুই থাবা দিয়ে চেপে ধরলো। দুলারহিন্ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বললো,—ছোড়দে, বহিনকো ছোড়দে। কি আশ্চর্য! বহিন ব'লেই না ভুখনের এত রাগ—অভিমান। এই বাদলা রাতে বাইরে থাকা কত কষ্টের তা বোঝে ব'লেই না এত পীড়াপীড়ি করা। বেটাছেলে বাড়ির মালিক ভুখনের দায়িত্বজ্ঞানকে অপমান করা দুলারহিনের উচিত নয়, অন্য বিষয়ে সে যত ছেলেমানুষি করতে চায় করুক।

—যা ইচ্ছা হয় কর, শুধু কাঁদিস্ না।—

হাল ছেড়ে ভুখন শুয়ে পড়লো।

কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে চলে না বেটাছেলের। কাঁচা কাঁচাই হোক, আহারের সংস্থান না করেও কাঁচা কাশ কেটে বোঝা বোঝা মাথায় ব'য়ে এনে স্তুপাকার ক'রে ফেললো ভুখন কুঁড়ের সামনে। তারপর সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যা, অনেক রাত অবধি অস্পষ্ট আলোয় ব'সে ব'সে নতুন ক'রে চাল ছাইলো ভুখন।

দুলারহিন্ একদিন বললো, ঘর ছেয়েছিস, এবার সাদি কর।

—তা হ'লে তুইও একটা কাস্তে নিয়ে চল।

—কাস্তে দিয়ে আবার কি হবে?

—কেন দু'জনে মেলা মেলা ঘাস কাটবো।

—ঘাস কাটবি কেন? আমি তো তোকে সাদি করতে বললাম।

—আমি ভাবলাম ও দুটো একই কাজ।

কিন্তু সহজে ভুলবার মেয়ে নয় দুলারহিন্। যখন তখন একই কথা বলতে লাগলো। অবশেষে একদিন বললো,—পৃথিবীতে চাঁদ আর সূরয ছাড়া আর কে আছে তাদের? বাপ-মা কোথায় গেলো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বেলায় ভুখন যদি বিয়ে করে, কম দামে মেয়ে পাবে, বুড়ো হ'লে বুড়ী ছাড়া আর যা পাবে তার জন্য চড়া দাম দিতে হবে না? আর সব কথার উপরে বড় কথা: একজনের মৃত্যুর পরে আর একজনের কি উপায় হবে যদি ইতিমধ্যে তৃতীয় একজন এসে আপন না হয়ে যায়?

মুখ গম্ভীর ক'রে বুড়োদের মতো চিন্তাক্লিষ্ট মুখ ক'রে ভুখন শুনলো সব যুক্তি, তারপরে বললো,—টাকা যদি জোগাড় হয় সাদি করবো, কিন্তু বউ যদি তোর সঙ্গে মারামারি করে তবে আমি কিন্তু দু'জনকেই পিটবো।

টাকা জমানোর চেষ্টায় মানুষ কি না করে? এমন কি হঠাৎ মানুষ নিজের একটা বিশেষ গুণও আবিষ্কার করতে পারে। এইরকমভাবে ভুখন কাঠের পুতুল গড়ায় মন দিলো।

ওস্তাদের বাড়িটা ছিলো ভুখনের ঘরের কাছেই। ভুখন মাঝে মাঝে শীতকালে আগুনের কাছে বসতে তার বাড়িতে যেতো। ব'সে ব'সে দেখতে দেখতে ভুখন একটা পুতুল একদিন বানিয়ে ফেলেছিলো। কাঠের এক চিড়িয়া। টাকা জমানোর কথায় ভুখনের মনে হ'লো পুতুল তৈরির কথা। মাথা ঝাঁকিয়ে সে মনস্থির ক'রে ফেললো। ওস্তাদ যে সব বড় বড় পুতুল তৈরী করে সেই সব চিড়িয়া, জানোয়ার, আদমি-জনানা সে ছোট ছোট ক'রে তৈরী করবে। বিক্রির ভার ওস্তাদের।

—আর শোন, দুলারহিন্, এ পয়সা দিয়ে খাওয়া চলবে না। খাওয়ার জন্য সকাল-সাঁঝ খেতির কাজে যা হয় তাই।

পুতুল বিক্রির খুচরো পয়সাগুলি রোজ সন্ধ্যায় গুনতে বসে দুজনে। একদিন থাক থাক ক'রে সাজিয়ে রেখে ভুখন এমন চিৎকার ক'রে উঠল যে দুলারহিন্ ভয়ে বাঁচে না। ছুটে কাছে এসে ভুখন বললো—ষোড় বৌ, কুড়িসে চার কম, স্রিপ চার।

ওদের জীবন ঠিক একরকম সময়ে একটা মোড় নিলো। সন্ধ্যার ব'সে কথা হচ্ছিলো। ভুখন বললো,—যব্ তক্ শশুরা লোহার বাক্স একটা না দেবে, তৎক্ষণ কোন শশুরাকে পুতই খিচুড়ি খাবে না। অর্থাৎ বিবাহ-ব্যাপারটা সমাধা হ'তে সে দেবে না।

অযুক্তির কথা নয়, ভাবলো দুলারহিন্, হয়তো সেই রূপকথার কনোয়ারের মতো ভুখনের ভাগ্য নয়, হয়তো কোনো মেয়ের বাপ মেয়ে আর টাকা নিয়ে সাধাসাধি

করবে না. যেমন সেই রূপকথার নায়কের বেলায় ঘটেছিলো, তা হ'লেও ভুখনের পক্ষে একটা লোহার রংদার বাক্স চাওয়া অন্যায় নয়। তবু বিয়ের ব্যাপারে একটু হাসি-ঠাট্টা করতে হয়, দুলারহিন্ বললো,—তুইতো ভেরুয়া হ'য়ে যাবি, টাকা দিয়ে বউ আনবি, আর ফির হুঁ, হুঁ, সে দেখা যাবে। তারই খিদ্মৎ করবি।

সেই রাত্রিতেই কিম্বা তার দু'এক দিন বাদে জ্বর হলো দুলারহিনের। অল্প অল্প জ্বর প্রথমে, সেই জ্বর দিনকে দিন বাড়তে লাগলো। একদিন সারারাত দুলারহিন্ বেহুঁস। সেদিন সকালে ওস্তাদের কাছে ভুখন শুনে এসেছে তাদের গ্রাম থেকে চার পাঁচখানা গ্রাম পার হ'য়ে গেলে যে বড় গ্রাম সেখানে এক ওস্তাদ-ডাংদার আছে সে নাকি সব জ্বর ভালো করতে পারে। তার মনে হ'লো কি অন্যায়ই সে করেছে এত-দিনেও ডাংদার না এনে। ডাংদার কথাটাই সে জানতো না, নিজেকে প্রবোধ দেবার মতো এ যুক্তিও তার মনে এলো না। দুলারহিনের পায়ের কাছে ব'সে কাঁদতে কাঁদতে তার বার বার মনে হ'তে লাগলো বিশঠো রূপয়া যার ঘরে তার দুলারহিন্ নাকি এমনি ক'রে মরে।

ভোর ভোর রাতে ভুখন উঠে দাঁড়ালো, দুলারহিনের অজ্ঞান দেহের দিকে হাত বাড়িয়ে সে বললো,—দেখ, দুলারী, দুলারি করিস না। ডাংদার আনতে চললো তোর ভুখনোয়া; যদি ফাঁকি দিয়ে ম'রে যাস—

চোখের জল মুছতে ডাংদারের গ্রামের দিকে ছুটতে লাগলো ভুখন। ডাংদার এসেছিলো। বিশঠো রূপয়াতো গেছেই, আর বিশঠো তার কাছে ধার হয়েছে। সে ধার আবার বছরে পান্ রূপয়া ক'রে বাড়বে; অর্থাৎ ভুখন সেই পুরনো জালে জড়িয়ে পড়লো। তা হোক দুলারহিন্তো বেঁচে আছে।

আগের মতোই সংসার করতে সুরু করলো। মাঝের কয়েকটা দিন যেন স্বপ্ন। একটা নোতুন আশার উত্তুঙ্গতা থেকে আছড়ে পড়ার ব্যাপারটাই যেন কতকটা।

কিন্তু অদ্ভুত মেয়ে দুলারহিন্। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আবার একদিন সে বললো,—তুই তো আর পুতুল বানাস না?

—কি হবে?

—সাদি করবি না?

—ডাংদারের সঙ্গে সাদি করলাম যে।

দুলারহিন্ লজ্জিত হয়ে চোখ নামিয়ে নিলো।

আবার চেষ্টা করার কথা ভাবতে গিয়ে ভুখনের যে অনুভবটা হ'লো সেটা এই: ছমাসের যত্নে যে বিশ টাকা জমে সেটা বিশ টাকা নয়, ছ'মাসের ঘর্মাক্ত শ্রমও বটে।

আর সেই ঘর্মাক্ত শ্রমকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কোন বুদ্ধিমানই করে না। তার উপর এলো সেই ডাংদার যাকে রোগী দেখতে আনতে গিয়ে ভুখনকে পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে সাধ্যসাধনা করতে হয়েছিলো। সে এলো না ডাকতে।

—ভুখন, আছো, ভুখন?

—হ্যাঁ, সব ভালো আছি আমরা, দুলারহিন্‌ তো দিনকে দিন মোটা হ'চ্ছে।

একটি নিটোল হাসি ফুটলো ভুখনের মুখে।

—বেশ, তা হ'লে সুদের টাকা ক'টা দাও। কোথায় পাবে? সে কি আমি ব'লে দেব? টাকা যতক্ষণ না দিচ্ছ আমি নড়ছিনা। সহর চেন, সহর? সেখানে থাকে পুলিস, তাদের ডেকে পাঠাবো। ঘরে দু'চার পয়সা যা ছিলো এনে দিলো ভুখন। সব শুনে দুলারহিন্‌ চুপ ক'রে রইলো।

ছ'মাস পরে আবার ডাংদার এলো। আড়াই টাকা পাওনা হয়েছে, দিতে হবে।

—আড়াই পয়সা নেই।

—দেখো, ভুখন, ধার বাড়িও না,। বাড়তে বাড়তে ধার এমন হয় যে কোনদিনই ও আর শোধ করা যায় না। বেশ, আড়াই টাকা যখন দেবে তখন আমার বিশ টাকা দিয়ে দাও, আর তার সঙ্গে ওই আড়াই টাকা।

—কি হবে যদি আমি না দি?

—যদি তুমি না দাও? (ডাংদার কথাটা উচ্চারণ করলো যেন আর একবার কানে শুনে অর্থটা পরিষ্কার করার জন্য।) বেশ যদি তুমি না দাও, ভগবান আছে মাথার উপরে। টাকা দেবে ব'লেই, ওষুধের দাম তো, তোমার কি দুলারহিন্‌কে ভালো করেছে ভগবান টাকা যদি না দাও তা হ'লে।

—হেই ডাক্তার, খারাপ বোল না। টাকা আমি দেবো, তুমি কিছু বোল না।

ঝাঁপের আড়াল থেকে সব শুনছিলো দুলারহিন্‌।

ভুখন ঘরে ঢুকতেই সে বললো,—ডাংদারকে তুই আর টাকা দিবি না।

—টাকা দেবো না তো তোর যদি আবার অসুখ হয়।

—টাকা তুই খরচা করতে পারবি না।

—টাকা আমার, যা ইচ্ছা আমি করবো।

—কেন করবি? আমি তোর কে? তোর আপনার বহিন যে আমার জন্য টাকা বরবাদ করবি?

—কি বললি?

—না, একশ'বার না। তোর সৎমায়ের বেটাবউ আমি।

—আমার কেউ না?

—না, না।

ভুখন কথা বললো না, ঘর ছেড়ে চ'লে গেলো।

কিন্তু ঝগড়া করার জন্য হ'লেও মুখামুখি হ'তে হ'লো তাদের। অবশেষে পুরুষালি প্রীতির চোখ-রাঙানির কাছে দুলারহিনের মেয়েলি স্নেহ হার মেনে স্বীকার করলো, আর সে নিজের অসুখের কথা বলবে না, আর কখনও আত্মীয়তা অস্বীকার করবে না, তবে সে রাত্রিতে ভুখন রোটি খেলো।

খুব ভালো জোড়া লাগলেও কখনও কখনও একটা অস্পষ্ট দাগ থেকে যায়—

দুলারহিনের কথাটাও সেই দাগ।

দুলারহিনের স্নেহ বাইরে হার মেনে গভীর হওয়ার অবকাশ পেয়েছে। সেই গভীর স্নেহ তার মাথায় বুদ্ধি এনে দিলো। সে স্থির করলো নিজে আগে সাদি ক'রে সেই টাকা দিয়ে ভুখনের সাদি দেবে। নিজে সাদি ক'রে টাকা পাওয়া সহজ নয় যদি এপক্ষ থেকে কোন যোয়ান বেটাছেলে দাম না চড়ায়। এদিকে ভুখনের বুদ্ধি যদি না খেলে দুলারহিন্ নিজেই তাকে বুদ্ধি দেবে। অবশ্য কোন যোয়ান বর হবে না তার, মুখে যে রকম দাগ; আর তাদের কেউ রাজী হ'লেও গরজ দেখাবে না টাকা দিয়ে। কয়েকদিন নিজের মনে কথাটা তোলপাড় ক'রে একদিন দুলারহিন্ সেটাকে প্রকাশ করলো।

ভুখন শুনে হো হো করে হেসে উঠলো, তোর সাদির ইচ্ছা তাই বল।

—না হয় তাই হ'লো। তুই তা হ'লে আগে আমার ইচ্ছা মিটিয়ে দে। ডাংদারের টাকা, তুই সেই টাকা শোধ কর। তারপরও যে টাকা থাকবে সেগুলো গেঁথে আমারই না হয় হার বানিয়ে দিস।

দিন যেমন যায় তেমনি যায়। ভুখনের চাড় নেই। তার উপরে নতুন একটা উপসর্গ জুটেছে। পয়সা পেলেই দুলারহিনের জমাতে ইচ্ছা করে, আর ভুখনের খরচ করতে। এরই মধ্যে একদিন ওস্তাদকে দিয়ে একজোড়া কাপড় আনিয়ে নিয়েছে ভুখন। শুধু কি তাই, নিজের খানা ছুপিয়েছে হলুদ রঙে আর দুলাহিনের খানা পাতলা লালে। সারাদিন যে খেতির কাজ ক'রে মাঝরাত অবধি ব'সে ব'সে কেরোসিনের কুপির আলোয় পুতুল খোঁদাই করে, তার সখকে কিছু বলা যায় না। দুলারহিনকে তাই চুপ ক'রে থাকতে হয়।

কিন্তু চুপ করে কতোই থাকা যায়।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ভুখন ঘরে ঢুকে বললো,—দেখি, এদিকে আয় তো, আরও কাছে আয়।

দুলারহিন্ ভেবে অন্ত পায় না। হাত, জোড় করে সে, প্রায় যেন আড়ষ্ট হ'য়ে যায়।

ভুখনই এগিয়ে এলো।

—আরে ছাড়, ছাড় হাত জোড় ক'রে মিনতি করতে লাগলো দুলারহিন্, ততক্ষণে কাঁসার মল্ জোড়া দুলারহিনের পায়ে পরিয়ে দিয়েছে ভুখন।

—এ তুই করলি কেন?

—হামার হিচ্ছা।

প্রতিদান না দিয়ে কি ক'রে থাকা যায় বলো। একদিন সকালে দুলারহিন্ একটা অচিন্তানীয় কাজ ক'রে ফেললো। লাল শাড়িখানা প'রে পায়ে কাঁসার মল দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরুলো সে ভুখন যখন ভইসা টহলাতে গেছে। আর ফিরবে না

দ্লারহিন্, যতদিন না টাকা আনতে পারে সে। যেখানে যত স্বজাতীয় আছে ডেকে সকলকে জিজ্ঞাসা করবে, তারা কেউ বিয়ে করতে চায় কিনা তাকে। যদি কেউ ব'লে : বিয়ে করবো, অমনি সে বলবে,—কত টাকা দেবে ? যদি বলে পঁচিশ,' অমনি সে বলবে আমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলো, অত কমে হবে না।

নিজের গ্রাম ছাড়তে ছাড়তে সূর্য প্রখর হ'য়ে উঠেছিলো, তবু দ্লারহিন্ তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলেছে, এখনও ভিন্‌গ্রামের স্বজাতীয়দের সঙ্গে দেখা হয়নি। সাহস খানিকটা যেন ইতিমধ্যে কমে এসেছে। নাগাদ দুপুর ভিন্‌গ্রামের স্বজাতীয় বস্তিতে পৌঁছালো সে। এইবার তাকে বিক্রী সুরু করতে হবে। প্রথম দেখা হ'লো একজন বিবাহিত মেয়ের সঙ্গে, জল তুলছিলো সে চাকা ঘুরিয়ে। দ্লারহিন্ কূয়োর পাশে গিয়ে আঁজলা পেতে দাঁড়াতেই সে জল খেতে দিলো। তারপরে প্রশ্ন করলো' কোন জাত, কোথায় ঘর। দ্লারহিন্ পরিচয় দিলো।

—একা একা কোথায় যাচ্ছো ?

দ্লারহিন্ এদিক ওদিক চেয়ে নিচু গলায় নিজের উদ্দেশ্য ব'লে বললো,—সাহায্য করতে পারো বহিন ?

বউটি হেসে বাঁচে না। একা একা কত আর হাসা যায়, এক সময়ে থামতে হ'লো তাকে। তখন সে বললো,—তুমি খুব বোকা বহিন, আমি হ'লে ঘরের বাইরে যেতাম না ; দুজনেরই সাদি দরকার, কি করতাম বলো তো ?

দ্লারহিন্ উৎকর্ণ হ'য়ে দাঁড়ালো ভালো ফিকিরটা শোনার জন্যে, বউটি হেসে হেসে চোখ ছোট-বড় ক'রে বললো।

দ্লারহিন্ কাঁদো কাঁদো মুখে তার দিকে একবার চেয়ে হাঁটতে সুরু করলো। মনে মনে সে স্থির করলো, কোন মেয়ের কাছে সে নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে না। ছিঃ ছিঃ। মেয়েছেলের জিবে হুল আছে।

গ্রাম ছাড়তে দুপুর শেষ হ'লো। শরীরের সঙ্গে মনও ক্লান্ত হয়েছে। ক্লান্ত মনে সে ভাবলো : এত যে সে করছে, সব কি মিছে নয় ? ভুখন তো একবারও জোর ক'রে বলেনি সে সাদি করতে চায়। কিন্তু আর একখানা গ্রাম এসে পড়ছে সামনে, এমন সময়ে আবার সাহস ফিরে এলো। না হয় নাই বলেছে সে, তাই ব'লে কি তার ইচ্ছা পূরণ করতে হবে না ? আর না বলার কথা বলছো ? বলে না ব'লেই তার সাধ মেটাতে আরও সাধ যায়।

সামনের বড় বড় কাশের ঝোপে ভরা মাঠখানি পার হ'লে আর একখানি ভিন্‌গ্রাম। আলো মুছে যাওয়ার আগেই এই গ্রামে পৌঁছে একটা নিষ্পত্তি করতে হবে। এখনই আলোর রং প্রায় বাদামী হ'য়ে উঠেছে। এই ভাবতে ভাবতে জোরে জোরে কয়েক পা যেতে না যেতেই পিছন থেকে কে বললো, কে যায় ? দ্লারহিন্ ফিরে দাঁড়ালো।

—কোথায় যাচ্ছো একা ?

লোকটি এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়ালো।

—বাড়ী থেকে রাগ ক'রে এসেছো নাকি, বাপ-ভাই বিয়ে দেয় না ব'লে ?

—না নিজেই আমি বিয়ে করতে বেরিয়েছি।

—সাবাস্। আমার সঙ্গে করবে ?

—আমি টাকা চাই, অন্তত চার কুড়ি তো বটেই। ভাইকে টাকা দেবো আমি।

—চার কুড়ি ? বেশ তাই হবে। আমার সঙ্গে বিয়ের পরেও ভাইকে টাকা দিতে ইচ্ছা হয়, দেখা যাবে।

—না, টাকাটাই আগে দিতে হবে।

—ও, খুব দাম বাড়াতে পারো যা হ'ক। আগে দেখি কত দাম হ'তে পারে। এই ব'লে দুলারহিনের আঁচলের একপ্রান্তে চেপে ধরলো লোকটি।

কিছুক্ষণ থেকেই দুলারহিনের মাথায় একটা কষ্ট হচ্ছিলো। একটা গোটা দিনের রোদ গেছে মাথার উপর দিয়ে। তবু জেদ ক'রে লোকটির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার চোখের পিছনে ক্লান্ত মস্তিষ্কের যে ধোঁয়াটে ছাপটা পড়েছিলো তার চাহনিতে সেটাই বিবশ তন্ময়তায় মিথ্যারূপ নিয়েছিলো। বোধহয়, সেটাই লোকটির এত আকর্ষণ। কিন্তু কাঁধের কাছে আঁচলটায় টান পড়তেই দুলারহিনের পা দু'খানাও বিবশ হ'লো। সে লোকটির গায়ের উপরে প'ড়ে গেলো, আর সেখান থেকে মাটিতে। তখন তার কষ বেয়ে ফেনাও গড়াতে লাগলো।

যখন ঘুম ভাঙলো দুলারহিনের সম্বিত ফেরার সময়ে তাই মনে হ'লো তার, তখন মাঝরাত। চারিদিকে ভয়ঙ্কর অন্ধকার। লোকটির কথা মনে পড়তেই সে শিউরে উঠে স'রে বসলো। কিন্তু লোকজন দূরের কথা ধারে কাছে বোধহয় পোকা মাকড়ও নেই, নতুবা ঝিঁঝিটা অন্তত ডাকতো। আর বহুদূর থেকে কিসের একটা অদ্ভুত অর্থহীন, শব্দহীন শব্দ আসছে। ভয়ে দুলারহিনের নিঃশ্বাস বড় বড় হ'য়ে পড়তে পড়তে সেটা অবশেষে চাপা কান্নায় পরিণত হ'লো। কাঁদতে কাঁদতে মনে হ'লো যেদিন বাপ-মা চ'লে যায় সেদিনও এমনি কেঁদেছিলো সে, কিন্তু তখন শক্ত পৃথিবীর বদলে বুকের কাছে যে দৃঢ়তা অনুভব করেছিলো সেটা প্রায়-শিশু ভুখনের ধূলিমলিন মুখখানা। নিঃশেষে শূন্য বুকে বোধহয় বেশীক্ষণ কাঁদাও যায় না। সেই ভুখনের মঙ্গলের জন্যই আজ সে পথে বেরিয়েছে।

চাঁদ উঠলো। সেই আলোতে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ মেলে দুলারহিন্ দেখলো সে কাশবনের মধ্যেই প'ড়ে আছে। লম্বা-লম্বা ছায়া সজীব হ'য়ে দুলছে চারিদিকে। রাত্রির শব্দহীন ভাষা এবার প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠলো। খ্যাঁক খ্যাঁক ক'রে হেসে উঠলো যেন।

হুরার ?

কিন্তু দুলারহিন্ ভয় পাবে না। ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে তবু চোখের জল মুছে সে সোজাসুজি দেখতে চেষ্টা করলো। যদি হুরারই হয় হোক। বাধা দেবে না,

পালাবে না, সর্বাঙ্গ আঁচল দিয়ে ঢেকে গলাটা বাড়িয়ে দেবে। হুরারদের তো আঁচলের ওপরে লোভ নেই। যদি খুবলে খুবলে খায়ও ততক্ষণ দেহের দুর্গতি দেখার জন্য প্রাণ থাকবে না। গলাটা সব প্রাণীরই সব চাইতে দুর্বল অংশ শরীরের। হঠাৎ ভুখনোয়ার কথাটা যেন মনে পড়ছে। আর একবার তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হ'ত। আর রান্না ক'রে রেখে আসেনি সে। খেতির কাজ করে ফিরলে বড় ক্ষুধা পায় বেটাছেলেদের। তখন মুখের সামনে খাবার না পেলে রাগই হয় পুরুষদের। কিন্তু তারপর সে হয়তো দুলারহিনকে খুঁজতে এ পথেই আসবে। হয়তো এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। আর যেমন লোক, হয়তো সঙ্গে একটা লাঠি পর্যন্ত আনেনি। আর দেখো তেমনি ভয় এদিকে হুরারের। এই দুশমনের ব্যূহে নিরস্ত্র ভুখন। চোখের জলে মজ্জিত হ'য়ে আবার সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। হা ভগবান, হা ভগবান, সে নিজেই তো ভুখনের মৃত্যুর কারণ।

ভুখন ঘরে ফিরে প্রথমে ভাবলো দুলারহিন্ অবেলায় জল আনতে গিয়েছে। রাগ হ'তে লাগলো তার প্রতীক্ষার সময় যত দীর্ঘ হ'লো। সন্ধ্যা যখন গড়িয়ে গেলো তখন সে কুঁড়ের ভিতরে দুম দুম ক'রে পা ফেলে বেড়াতে লাগলো।

রাত যখন প্রথম প্রহর, তখন সে ভাবলো : ঠিক তাই হয়েছে, ও গিয়েছে নিজের সাদি ঠিক করতে। কেন, বাপু, আমি কি বলেছিলাম ডাংদারের টাকা আমি শোধ করতে পারবো না। তুমি শোধ করো সাদি ক'রে ? না খেয়ে আছি তা যদি দেখতে না এলে, তবে তোমার টাকা নিয়ে এসো দেখবো মাথা কোথায় রাখো।

কিছুক্ষণ পরে নিজের মাদুরখানা ঝেড়ে ঝুড়ে ঠিক ক'রে নিয়ে শুতে গিয়ে সে ভাবলো : আসলে ওসব কিছুই নয়. তোমার নিজেরই সাদি করার ইচ্ছা, একা-একা ভালো লাগছিলো না আর। আমি তোমাকে কখনও বলেছি, দুলারহিন্ আমি বউ চাই। মনে হবে না কেন, সব পুরুষের মনেই হয়। তাকে জলের ধারে দেখে আমিও এগিয়ে জলের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। সেও হেসে, রাগ ক'রে কথা বলেছিলো। কিন্তু আমি তো জানি বাপ-ভাইয়ে মিলে তার ছ'জন আছে, দু'কুড়ি টাকার কমে তারা রাজী হবে না। আমি হাত জোর ক'রে বলেছিলাম—মাপ্ কিজিয়ে। কিন্তু তার কথা তোমাকে বলেছি ? বেশতো গিয়েছ, তোমার ভালো হোক। প্রায় মাঝ রাতে অনিদ্রিত ভুখন ঝিঁঝির ডাক শুনতে শুনতে চমকে উঠলো। সেই নীরব রাত্রির রহস্যময়ী ভাষা। চকিতে সে উঠে দাঁড়ালো। দুলারহিন্ যদি অন্ধকারে আশ্রয় না পেয়ে থাকে।

আর কিছু ভাববার সময় পেলো না ভুখন। দরজার ঝাঁপ ভেঙে কোন ক্রমে রাস্তায় প'ড়ে অন্ধকারে ছুটতে লাগলো সে—দু-লা-র-হি-ন্।

দুজনের দেখা হ'লো সংযোগ হারানোর দ্বিতীয় দিনের দুপুর বেলায়। দুলারহিন তখন ক্লান্তদেহে তার চাইতেও ক্লান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরবার পথ ধরেছে।

চোখমুখ ব'সে গেছে, তামাটে চুলগুলি উড়ছে বাতাসে।

দুলারহিন্ বললে,—তুই এলি কেন আবার, আমিই তো ঘরে যাচ্ছিলাম।

ভুখনের মুখে দু'হাজার দাঁত হো হো ক'রে হেসে উঠলো,—এলাম এমনি।

সামনে একটা খাল, নদীর মতো তা'তে স্রোত। সেটাকে পাশে ক'রে কিছু দূর গেলে একটা গ্রাম। যখন ধুলো উড়ছে না তখন সেখানে একটা গোয়ালের দোকান চোখে পড়ছে। ওখানে যা হোক কিছু খাবার পাওয়া যেতে পারে।

ভুখন বললো,—তুই স্নান করে নে, চেহারা খুব খারাপ দেখাচ্ছে। দুলারহিনেরও খুব ইচ্ছা হয়েছিলো কিন্তু ইতস্তত করতে হ'লো তাকে।

ভুখন বললো,—এক ক্রোশের মধ্যে কোন লোক নেই।

তীরে শাড়ি রেখে তখন দুলারহিন জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো পানকৌড়ির মতো—বাস্।

—আর গেলে ডুবে যাবি।

ডুবে যাওয়ার ভঙ্গিতেই তবু আর একটু সাঁতার কেটে, ভুখনকে ভয় দেখিয়ে তারপর দুলারহিন্ উঠলো। তীরে দাঁড়িয়ে দু'হাত জড়ো ক'রে চুলের জল ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে সে ভুখনকে স্নান করতে পাঠালো। স্নান শেষে তীরে উঠে পাশা-পাশি হাঁটতে হাঁটতে দুলারহিন বললো,—যদি ডুবে যেতাম।

—আমিও ডুবে মরতাম।

দুলারহিন্ হাত বাড়িয়ে ভুখনের একখানা হাত জড়িয়ে ধ'রে হাঁটতে লাগলো। গাঁয়ের দোকানে তারা ভইসা দহি পেলো আর মকাই-এর খৈ।

একটি গাছতলায় ব'সে যত না খাওয়া তার চাইতে বেশী কোলাহল ক'রে তারা আহারপর্ব সমাধা করলো।

গাছতলায় হাত পা ছড়িয়ে ব'সে ভুখন প্রশ্ন করলো—দুলারী, আর কখনো আমাকে ছেড়ে যাবি না, বল।

—না।

রোদের ঝাঁঝ ক'মে এলো। ঝিরঝিরে হাওয়ায় পথ চলতে সুরু করলো তারা। এত হাল্কা মন তারা বহুদিন অনুভব করে নি। ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, যেন সখ ক'রে দু'জনে বেড়াতে বেরিয়েছে। কয়েক পা গিয়ে ভুখন বললো,—দুলারী, এখন যদি কোন মহুয়াইয়ের দোকান পেতাম—

—তুই তো নেশা করিস না, তবে ও কথা বলছিস কেন ?

—কিছুতেই যেন ঠিক ফূর্তিটা হচ্ছে না।

নিজেদের গ্রামে পৌঁছানোর আগে সন্ধ্যার আগেকার বাদামী আলোয় কাশের বড় বড় ঝোপে-ভরা মাঠটিতে তারা এসে পৌঁছালো। দিনের বেলায় ভইসা থাকে, ভইসা নিয়ে রাখালরা এখন ফিরে গেছে। ছোটবেলায় যখন দুলারহিন্ ভইসা তাড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ পারতো না, তখন এখানে একটা ভারি মজার

ব্যাপার হ'তো। ভুখন যখন ডাকতো তাকে, সে লুকিয়ে বেড়াতো এক ঝোপের আড়াল থেকে অন্য ঝোপের আড়ালে। আর মাঝে মাঝে কুই ক'রে সাড়া দিতো।

মাঠটা পার হ'তে হ'তে ঝিক্‌মিকিয়ে হেসে দুলারহিন্ বললো,—আমি যদি এখানে লুকিয়ে থাকি খুঁজে বা'র করতে পারিস?

—না, পারি না। এখনও তেমনি ছোট আছি. হোঁচট খাবো।

দুলারহিন্ কয়েক পা আগে চলছিলো, হঠাৎ ধাঁ ক'রে সে লুকিয়ে পড়লো। ভুখন মনে মনে হাসলো, ছোটবেলায় খেলতাম, এই মনে করলেই কি আর তেমন খেলা হয়। এখন সে হাত বাড়ালেই ঝোপের এপার থেকে ওপারের ঘাস সরিয়ে লারহিন্‌কে দেখতে পাবে। কিন্তু দুলারহিন্ ভারি সুন্দর লুকাতে পারে। আর তার পায়ের গোড়ালি যেন ধনুকের ছিলায় তৈরী। একটি ঝোপের আড়ালে তার সাড়া পেয়ে তার কাছে গিয়ে দেখলো ভুখন সে ততক্ষণে অন্য আর একটির কাছে স'রে গেছে। তার শাড়ির একটুখানি দেখা যাচ্ছে। সেখানে যেতে দুলারহিন্ উধাও। দু'তিন বারের চেষ্টায় একবার ভুখন দুলারহিন্‌কে ছুঁতে পারলো।

—নে এবার চল।

ভুখন ভেবেছিলো খেলা শেষ হয়েছে, কিন্তু দুলারহিন্ আবার অদৃশ্য হ'য়ে গেলো হাসতে হাসতে।

খেলাটা বাল্যের মতো দুর্দম হ'য়ে উঠেছিলো। ইতিমধ্যে একবার দুলারহিন্‌কে সে দু'হাতে চেপে ধরেছিলো বুকের উপরে, কিন্তু হাতের ফাঁকে গলিয়ে দুলারহিন্ আবার লুকিয়ে পড়লো। খেলার উত্তেজনায় ভুখনও ছুটতে সুরু করলো। কি একরকম ঘাস পায়ের তলায় দ'লে দ'লে যাচ্ছে, একটা সুঘ্রাণ উঠছে। কি একটা উত্তাপ বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই শুকনো খটখটে ঘাসের বাদামী আলোর পৃথিবী থেকে। এইমাত্র ভুখন ছোটবেলার পাকড়ানোর কায়দায় পাকড়ে ধরেছিলো দুলারহিন্‌কে। কিন্তু এবারও রাখতে পারলো না। দুলারহিন্ হাত ছাড়িয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে দৌড়ে পালালো, তারপরে হাসতে হাসতে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হ'য়ে আতপ্ত ঘাসের উপরে শুয়ে পড়লো। দুলারহিন্ ছোটবেলাকার ভঙ্গিতে শুয়ে আছে—যেমন ক'রে ছোটবেলায় বলতো, আমি ম'রে গেছি। ঊরু দুটি প্রসারিত, অর্দ্ধনিমীলিত দৃষ্টি, ঈষৎ মুক্ত ঠোঁট দুটি, বুক কাঁপছে থর থর ক'রে।

কিন্তু দুলারহিন্ ধড়ফড় ক'রে উঠে বসলো। বল নিয়ে লুফতে লুফতে যদি হঠাৎ সেটা কুয়োয় প'ড়ে যায়, তা'হলে সেই কুয়োর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে কুয়োর অন্ধকার মনে নিয়ে যেমন ফিরে যায় খেলুড়েরা—তেমনি মন নিয়ে ফিরে চললো ভুখন আর দুলারহিন্।

দুলারহিন্ একবার বললো,—ভুখন পিছিয়ে পড়ছিস। কিন্তু সেটা যেন ভাষা নয়, ভাষার খোলস শুধু।

ভুখন মুখ নিচু ক'রে থাকে, কথা বলে না। দুলারহিন্ ভাবে, কখনও কপালে

হাত রেখে।

একদিন খুব সাহস ক'রে দুলারহিন্ ভাবলো,—ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলবে ভুখনোয়ার কোন দোষ নেই, বয়সে সেই বড়। আর এই কথা বলে যদি ভুখনকে মুখ দেখাতে না পারে, মরবে সে। মরা যত সহজ, বলা তত নয়। ভগবানকে যদি বলা যায়, মানুষকে নয়।

দুলারহিন্ রান্না করতে করতে ভুখনের পিঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, আহা সঙ্কোচে যেন ভেঙে পড়েছে। সে ভাবে, তোর জন্য আমি কি না করেছি। ছোটবেলায় একবার আগুনের মধ্যে গুলি ফেলে দিয়ে তুই কেঁদে উঠেছিলি। আর তোর সেই গুলি খুঁজে দিতে হাত দিয়ে জ্বলন্ত আঙরা সরিয়েছিলাম, দাগটা ছিলো কিছুদিন। তাও কি তোর মনে নেই।

এক সময়ে দুলারহিনের চিন্তার পথ কিছু বদলালো। চিন্তায় সাহস আগে ছিলো না, এমন নয়। কিন্তু স্নেহের করুণরসে মজ্জিত হ'য়ে সে সাহসও হ'য়ে উঠতো করুণ। সমস্যাগুলোকে একদিন জীর্ণ বাসের মতো তুচ্ছ মনে হ'লো। নিজেকে অসীম ক্ষমতার উৎস ব'লে অনুভব করলো সে। সাহসে এত প্রাণ, এত পূর্ণতা এ কে জানতো ? এতদিন পথে-পথে ঘুরে আজ তবে পথ দেখা গেলো। আবার সেই স্নেহগুলো ফিরে আসতে লাগলো। অনাস্বাদিত এক আস্বাদে বর্ণাঢ্য হ'য়ে হ'য়ে। দুঃসাহসী হওয়ার জন্য নিজের ভিতরে প্রেরণা এল তার।

সন্ধ্যার পর ভুখন ফিরে এলো তেমনি গম্ভীর মুখে। পায়ের শব্দে দুলারহিনের স্নায়ুগুলি রিন্‌রিন্ ক'রে উঠলো। নাগরদোলায় কয়েক পাক ঘুরে হঠাৎ মাটিতে দাঁড়াতে গেলে যেমন পরিচিত পৃথিবী অপরিচিতের মতো টলমল করতে থাকে তেমনি হ'লো দুলারহিনের।

দুলারহিন্ ভুখনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো,—ভুখ্‌নোয়া।

ভুখন অবাক হ'য়ে গেলো। রুক্ষ চুলগুলি ভিজে ভিজে পাট-পাট করা, বোধহয় তেলজাতীয় কিছু দিয়ে বাঁধা। পরনে লাল সেই শাড়ি। কপালে কালির টিপ। আর চোখ ! সে চোখ কোনদিনই দেখে নি ভুখন। অনুচ্চারিত হাসির মতো তেমনি আভাযুক্ত কিছু দুলারহিনের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো মুখের বসন্তের দাগগুলিকে অস্পষ্ট ক'রে। ভুখনের মনে হলো প্রবল একটা আক্ষেপ বোধ হয় আসছে তার সারা দেহে। ভুখন নিরুদ্ধ গলায় মৃদু গর্জন ক'রে উঠলো।

দুলারহিন্ একটা হাত রাখলো ভুখনের কাঁধে।

ভুখন দু'হাতের সবটুকু জোর দিয়ে দুলারহিনের হাতখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। যা কোনদিন সে কল্পনাও করেনি তেমনি ক'রে দুলারহিনের আধখোলা ঠোঁটের উপরে প্রচণ্ড একটা চড় মারলো সে। আঘাত একটা দেয়ার জন্যই মন যেন উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিলো। একটা কিছুর প্রাবল্য দরকার এই সে অনুভব করেছে একয়েকটি দিনের প্রতিটি ক্ষণ।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হ'লো—আহা এ কি করলো সে। দুলারহিন্, বহিন্। পৃথিবীতে কে আছে তার দুলারহিন্ ছাড়া। আর যে দুলারহিন্ নাকি তার মুখ চেয়ে তারই আশ্রয়ে থাকে, এত কোমলা, এত দয়াবতী। ছোটবেলায় দুজনের একজনকে বাবা মারলে অন্যজন তাকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠতো, তেমনি হ'লো।

ভুখন কেঁদে কেঁদে কেঁদে হেঁচকি তোলার মতো ক'রে বললো,—আর কখনো তোকে মারবো না। এই প্রথম, এই শেষ। দুলারহিন্ দুলারহিন্ বহিন্।

দুলারহিন্ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, মেরে লাল, মেরে ভুখ্নোয়া, ভাইয়া।

অনেকক্ষণ কেঁদে মনের নিরুদ্ধ পীড়াগুলিকে ধুয়ে মুছে দু'জনে নিজের নিজের চাটাইএ এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে ঘুম ভাঙলো ভুখনের ঠিক যা মনে করেছিলো তাই, এই ভাবলো সে। বাবা মারলে তারপর কয়েকদিন খুব কাজে মন হ'তো দুলারহিনের; ভোর থাকতে উঠে কাজে লেগে যেতো। আজ বোধ হয় তাই করছে, জল আনতে গেছে।

ভুখন ভাবলো: কি বোকা মেয়ে রে বাবা। অনেক বেলা হ'লেও যখন দুলারহিন্ ফিরলো না তখন ভয় হ'লো ভুখনের, সে খুঁজতে বার হ'লো।

কিন্তু সব সময়ে খুঁজে বার করা সহজ নয়। কয়েকদিন স্নানাহার ত্যাগ ক'রে খুঁজেও দুলারহিন্‌কে সে পেলো না। ভুখন বরং বুঝতে পারলো ওগুলোকে বর্জন করলে খোঁজার পরিশ্রমকেও বাদ দিতে হবে। তখন সে স্নানাহারের দিকে নজর দিলো। হাতের পয়সা কয়েকটি একসময়ে ফুরিয়ে গেলো। ততদিনে সে বহুদূরে এসে পড়েছে। গাঁয়ে ফিরে গিয়ে খেতির কাজ ক'রে আবার হাতে পয়সা ক'রে বেরুতে গেলে দুলারহিনকে বোধহয় আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না। তখন সে পথ চলতে চলতে কাজ করতে সুরু করলো। যখন যে-গ্রামে গিয়ে পৌঁছায় সে-গ্রামেই খেতির যে কাজ পারে জুটিয়ে নেয়। কাজ ফুরিয়ে গেলে চলতে সুরু করে। একবার খুব বিপদে পড়েছিল। এক চায়ের বাগানে কাজ করতে গিয়ে তিন বছর এক নাগাড়ে খাটতে হয়েছিলো, পথ চলবার উপায় ছিলো না। ভুখনের ধারণা, সেই সময়েই দুলারহিন্ সব চাইতে দূরে গিয়ে পড়েছে। তাকে একজন মুরুব্বি বলেছে দুলারহিন্ যে বছর হারিয়ে যায় সেবার প্রায় দু'তিন হাজার মেয়ে-পুরুষ নাকি মরিসাস্ দ্বীপে কাজ করতে গিয়েছে। ভুখনের ইচ্ছা সে একবার মরিসাস্ দ্বীপটিও খুঁজে আসবে।

আসল ব্যাপার ঠিক এরকম নয়।

দুলারহিন্ পথে বেরিয়ে এক বুড়োর দেখা পেলো। বুড়ো তাকে প্রশ্ন করতেই দুলারহিন্ কেঁদে ফেলে তাকে বললো, সে ভাইকে সুখী করার জন্য পথে বেরিয়েছে।

—কি করলে সে সুখী হয়, বিটিয়া ?

—যদি অন্তত ষাট সত্তর টাকা দিতে পারি তাকে।

—আচ্ছা, তুই আমার গোরুবাছুরের তদ্বির কর, দুধ দো, দুধ বেচ, আমি টাকা দেবো ধীরে ধীরে।

সেই বুড়োর কাছে থাকতে থাকতে বুড়োর ছেলে একদিন কেড়ে নিলো দুলারহিন্‌কে। বুড়ো খুব হুঁসিয়ার, সে ছেলে ব'লে রেয়াত করলো না। টাকা নিলো চার কুড়ি ছেলের কাছে বুঝে। সেই টাকা আঁচলে বেঁধে বুড়োর ছেলের ঘর ক'রছে দুলারহিন্। যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আঁচলে-বাঁধা টাকা নিয়ে দুলারহিন্ অপেক্ষা করতে লাগলো। এ-লোক সে-লোকের মুখে সংবাদ দিয়েছে সে ভুখনকে ঘরে ফেরার জন্য। ভুখন ফিরলেই সে যাবে। লোকগুলো খবর দিয়েছে নিশ্চয়ই।

এখন দুলারহিন্‌ আর চট ক'রে যেতে পারে না কোথাও। মাটিতে শিকড় বসিয়ে দিয়েছে সে। তিন চারিটি ছেলেমেয়ে তার। তারা সবাই তার দেহকে এবং অধিকাংশ মনকে নিজেদের দৃঢ়বদ্ধ ক'রে দিয়েছে। এখন বড়জোর মনের একটা উন্মুক্ত অংশ তার ছোটবেলাকার গাঁয়ের দিকে বাতাসে আগ্রহের পল্লব মেলে ডাকতে পারে। প্রথম শীতের মাটির রসে কোন কোন গাছ যেমন শিউরে ওঠে—তেমনি কখনও অনুভব হয় তার ; শূন্যতা যেন শীত অন্ধকার একটা প্রবাহের মতো মাটি থেকে উঠে তার হৃদয় মূলকে শিথিল ক'রে দেয় কখনও কখনও।

আর ভুখন। বলো দেখি যে ব্যবধান এসে গেছে তাদের জীবনে সে কি মরিসাস্ দ্বীপের সাগরের চাইতে কম দুস্তর ? আর একটি পরিবারের দেহগুলোর ক্রমায়াত শৃঙ্খলের একটি বৃত্ত যার দেহ, তাকে কখনো ফিরিয়ে আনা যায়—পারতো তাই ভুখন, যদি জানতোও সে ? তার চাইতে মরিসাসের দূরত্ব-কল্পনাও ভালো।

'কিন্তু ভুখন এখন আর দুলারহিন্‌কে খুঁজে বেড়ায় না। তবু কি খোঁজে একটা। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো নেশায় দাঁড়িয়েছে। মরিসাসের কথাও বলে না। দু এক বছর পর পর সহর বদলে কাজ ক'রে বেড়ায় সে। ভালো লাগে না অনেক-দিন এক জায়গায় থাকতে। কিছুদিন সে বাঙলাদেশের গ্রামে মাটিকাটার কাজ ক'রে বেড়ালো পথের ধারে ধারে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কুপি জ্বেলে কড়াইএ ভাত চাপিয়ে সঙ্গীরা যখন দিনজমানার গল্প করে, দেশের গল্প করে, কোন কোনদিন সে চাটাই বিছিয়ে নীরবে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকে। আরপর শুধু গল্পটাই থাকবে।

পৌষ ১৩৫৯

ওগো মুগ্ধা

তার এক হাতে একটি নিকেল মোড়া সরু সরু লম্বা কাঁচি। অন্য হাতে একটি চন্দ্রমল্লিকা। বাড়ির পিছনদিকের বারান্দায় সে উঠে এলো।

তার রান্নাঘরের দরজা. এখন বন্ধ। ঝি কয়লায় আঁচ দিয়েছে, টালির ছাদে বসানো চোঙ্ দিয়ে এখনও হাল্কা ধোঁয়া এংকেবেঁকে বেরুচ্ছে।

সিঁড়িগুলোতে টবে বসানো অনেক ফুলের গাছ. সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেও একটা ছোটখাট ফুলের আবাদে পৌছান যায়। সেই আবাদ শেষ হয়েছে একটা ছোট তরকারি বাগানে। টম্যাটো গাছের ঝোপ তিনটিতে তেল চুক্চুকে ফলগুলো এখন সবুজ। কপিগুলো ভাল হয়নি. পাতাগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে।

শোবার ঘরের ছাদ থেকে নেমে-আসা লতাটার সমাদর যত না তার ফুলের জন্য তার চাইতে বেশী তার পল্লবের জন্য। কাঁচি দিয়ে একটি পল্লব কাটতে গিয়ে সে অবাক হ'য়ে দেখলো একটি দলছাড়া মৌমাছি সেই পল্লবের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে কিম্বা এইমাত্র এসে বসেছে। সে মৌমাছিটিকে বোকা মনে ক'রে তাকে বিরত করলো না, অন্য আরেকটি পল্লব কেটে নিলো।

স্নান হয়নি, সম্ভবত তার দেরি আছে। কারণ গলায় মাফলার জড়ান দেখছি। ডান হাতের উপর থেকে শাড়ির আঁচলটা স'রে যাওয়াতে উলের ব্লাউজের কিছুটা চোখে পড়ছে। কপালের উপরে ঈষৎ রুক্ষ দু'এক গোছা চুল। সেই চুলে কয়েক বিন্দু জল পাথরের মত চক্চক্ করছে। ফুল তুলতে গিয়ে শিশির লেগেছে কিম্বা মুখ ধুতে গিয়ে জল। এত সকালে প্রসাধন নিয়ে সে ব্যস্ত হ'তে পারে না। তার খোঁপাভাঙা চুল পিঠের উপরে আধখানা নেমে আছে, একটা রুপোর কাঁটার মাথা চোখে পড়ছে। হাল্কা সবুজে সাদা ডোরা বসানো তার শাড়িটা রাত্রির ঘুমে একটু অগোছালো।

পাশাপাশি তিনটি ঘরের মধ্যেরটিতে সে ঢুকলো। এটিতে তারা খায়, দুপুরে উল নিয়ে সে বসে. পাড়ার মেয়েরা কখনো এসে আড্ডা জমায়, তার ছেলে কাঠের ঘোড়ায় দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে, অন্য কখনো ছবির বই দেখে অক্ষর পরিচয় করে।

সব জানলা দরজা এখনো খোলা হয় নি, শুধু দরজার মাথায় বসানো ঘষা কাচের আলো-জানলা দিয়ে দিনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবলো। হাতের ফুল ও কাঁচি একটা চেয়ারের উপরে রেখে খাবার টেবিল থেকে চাদরটা তুললো। কাল রাত্রিতে ছেলেটা ঝোল ঢেলে ফেলেছিলো তা মনে পড়লো। বাঁ দিকের দেয়াল আলমারি খুলে ধোয়া চাদর বার ক'রে টেবিলে বিছালো। তারপর ছোট ফুলদানিতে ফুল আর পল্লব বসালো।

তার ঘাসের চটিতে রঙীন কাতার ম্যাটিঙের উপরে কোন শব্দ হচ্ছিল না। ডানদিকের ঘর থেকে খুক্ ক'রে কাশির শব্দ হ'লো। তার স্বামী তা হ'লে উঠেছে, দিনের প্রথম সিগারেট ধরিয়েছে। সে আর দেরি করলো না। ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে তার দাঁত মাজিয়ে পোশাক পালটে প্রস্তুত করতে হবে, রান্নাঘরের কাজগুলো শেষ করতে হবে। এর মধ্যে স্বামী প্রাতকৃত্যাদি শেষ ক'রে বাইরের বারান্দা থেকে সকালের কাগজখানা নিয়ে আসবে, টেবিলে গিয়ে বসবে চায়ের প্রতীক্ষায়।

সে ছেলের ঘরে ঢুকে তাকে জাগিয়ে, কোলে ক'রে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

নাম তার গায়ত্রী। বিয়ের সময়ে স্বামী সরকারী কলেজে অধ্যাপক ছিলো। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ববিভাগে। পাঁচ বছর ধ'রে এই বাংলোয় তারা বাস করছে। মাইল দু' এক দূরে খননকার্য চলেছে। গুপ্তযুগের এক নগরের ধ্বংসাবশেষ মাটির তলা থেকে আত্মপ্রকাশ করছে।

সহর থেকে দূরে এসে গায়ত্রী খুঁতখুঁত করেনি। কারণ সেরকম তার স্বভাব নয়। নতুবা অনেক হেতু ছিলো তার অস্বস্তি বোধ করার। সে সহরের মেয়ে। সভা-সমিতি ছবি-থিয়েটার। সামাজিক প্রাণী ছিলো সে বিয়ের আগে এবং পরেও। এখনও মনিঅর্ডার ক'রে সে অনেক সমিতিতে চাঁদা পাঠিয়ে আসছে। দু' একটি সমিতির কার্যকরীসংস্থার সভ্য সে। অনুপস্থিত সত্ত্বেও সে নির্বাচিত হ'য়ে যাচ্ছে। অবশ্য এখানেও সে একটি সমিতি করেছে—'নারীত্রাণ সমিতি'। স্থাপয়িতা হিসাবেও বটে, এ অঞ্চলের সব চাইতে বড়ো কর্মচারীর স্ত্রী হিসাবেও বটে সে এই সমিতির সভাপতি।

বড়ো কর্মচারী বৈ কি। অধ্যাপক হিসাবে তার স্বামী সম্মানার্হ ছিলো, এখন সেটার সঙ্গে ক্ষমতার সংযোগ হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটদের যে রকম ধরনের অধিকার আছে তেমনি কিছু কিছু যেন পেয়েছে তার স্বামী। খনন কার্যের তদ্বির তদারক ছাড়াও অধীনস্থ কর্মচারীদের ছুটি, নিয়োগ, বদলী ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পুলিসের ফাঁড়ি বসেছে। সেই ফাঁড়ির লোকেরাও আইনগতভাবে তার স্বামীর কর্মচারী না হ'লেও তারাও তার কাছে পরামর্শ নিতে আসে। সাহেব ব'লে উল্লেখ করে।

চায়ের টেবিলে কাগজ পড়তে পড়তে সাহেব কথা বলছিলো। বড়ো অক্ষর

লেখা বড়ো খবরগুলো এক নিমেষে প'ড়ে ফেলে সে। ছোট খবরগুলোতেই তার আকর্ষণ বেশি। ডিমে চামচ দিয়ে তেমনি একটি ছোট খবর প'ড়ে সে গায়ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সদরে 'নারী পুনর্বাসন সমিতি'র বাৎসরিক সভা হচ্ছে।

'তুমির কি এই সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত নও ?' সাহেব কৌতুকের সুরে বললো।

'তা সংযুক্ত বৈ কি।'

সাহেব হাসলো, 'এ অঞ্চলে, এ জেলাই বলতে পারো, তোমাকে ছাড়া কোন সমিতি হয় না ব'লেই আমার ধারণা।'

'ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য তুমি সমিতি মাত্রকেই বর্জন করেছ। সদরের ক্লাবের চিঠি এসেছে সেদিন, দু' তিন বছরের চাঁদা দাও নি।' গায়ত্রী হাসলো।

'ওরা এখনো লিষ্টিতে নাম রেখেছে নাকি ?'

'চাঁদা পাঠিয়ে দেবো।'

'তা দিও।'

গায়ত্রী বললো, 'তোমার কয়েকখানা পত্রিকা প'ড়ে আছে। পাতাও কাটা হয়নি।'

'তাই নাকি ? দিওতো পড়তে।'

সাহেব বললো কিছুক্ষণ পরে, 'হাসছ যে।'

'ভাবছি তোমার ছেলে তোমার মত হবে কি না।'

'তা একটু হবে।'

প্রাতরাশ শেষ হ'লো। সাহেব সার্টের গলায় টাই বেঁধে দাঁড়াতেই গায়ত্রী এসে কোটটা ধরলো। ততক্ষণে তার আর্দালি তার মোটরবাইক গেটের পাশে নামিয়ে ঝাড়পোঁছ ক'রে পরিষ্কার ক'রে রেখেছে। সাহেব বাইকে চেপে দস্তানা প'রে ডান হাত তুলে বিদায় সম্ভাষণ জানালো। বারান্দা থেকে গায়ত্রী বিদায় দিতে হাসি মুখে বললো, 'বাই-বাই'। তার ছেলে বললো, 'ছকাল ছকাল এছো।'

আর্দালি গেট বন্ধ ক'রে, গেটের পাশের ছোট ঘরটি থেকে তার নাগরা জুতো প'রে বাজারের ঝোলা হাতে ক'রে ঘুরে এসে দাঁড়াবে রান্নাঘরের কাছে। গায়ত্রী তাকে বাজারের টাকা দেবে।

আর্দালি বাজারে গেলে গায়ত্রী পত্রিকা নিয়ে বসলো, ছেলেও তার ছবির বই নিয়ে এলো।

আজ শুক্রবার তা গায়ত্রীর খেয়াল ছিলো না। থাকলে অবশ্য এরই মধ্যে স্নানটা সেরে নিতো। এই দিনটিতে তাকে এখানকার নারীত্রাণ সমিতিতে যেতে হয় কিম্বা সমিতির পক্ষ থেকেই কেউ আসে তার কাছে। দিনটিকে মনে করিয়ে দিতে সমিতির পক্ষ থেকে পঙ্কজিনী এলো। তার অত্যন্ত নিঃশব্দ চলার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় সে এসেছে। তার চলার দিকে হঠাৎ কারো চোখ পড়লে মনে হয়— এতক্ষণ সে দাঁড়িয়েছিলো, এই মাত্র চলতে সুরু করলো। অত্যন্ত কালো, যার

চাইতে কালো কল্পনা করা যায় না। ছিপছিপে চেহারা। পরনে নরুণ পাড় সাদা শাড়ি। সে ধীরে চললেও তার হাঁটার যে বিরাম নেই তার লক্ষণ—তার পায়ের আঙ্গুলের ছোট ছোট কড়া যা ধূলিধূসর স্যাণ্ডেলের মধ্যে থেকে চোখে পড়ে। গায়ত্রী বললো, 'এসো'।

শুক্রবারের দিন যদি সে গায়ত্রীর সঙ্গে কোথাও সভা করতে না যায় তবে অনিবার্যভাবেই এখানে আসে। আধখানা বেলা কাটিয়ে যায়। শুক্রবারে সুরু ক'রে রবিবারের সন্ধ্যা পর্যন্ত সে সমিতির কাজ ক'রে বেড়ায়। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার সে একজন নার্স মাত্র। উপনিবেশ এবং গ্রামের সংসারগুলোই তার কর্মক্ষেত্র। বউদের সঙ্গে আলাপ ক'রে বেড়ানোই তার কাজ। একটু বৈশিষ্ট্য আছে সে আলাপের, কখনো উঁচু গলায় নয়, কখনো প্রকাশ্য স্থানে নয়, সে সব কথাবার্তা। বাড়ির মধ্যেও কোনো ঘরের কোণ, কিম্বা দুই ঘরের মধ্যেকার সংকীর্ণ জায়গায় অথবা কোনো দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে সে বউদের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ ক'রে আলাপ করে। কখনো নিজের হাত থেকে কোন বউয়ের হাতে সংগোপনে কিছু দেয়। সেও হাত মুঠ ক'রে সেই দান নিয়ে গোপন ক'রে ফেলে। এর ফলে গ্রামের এবং উপনিবেশের কিশোর কিশোরীদের কাছে সে কৌতূহলের ও রহস্যের কিছু। সে কোনো বাড়িতে ঢোকামাত্র ছেলেমেয়েরা সে কি করে দেখবার জন্য, সে কি বলে শুনবার জন্য হট্টগোল থামিয়ে চুপ ক'রে যায়। কিন্তু তাদের কিছু সুবিধা হয়নি তাতে, রহস্য বেড়েই যাচ্ছে।

'আজকের খবর কি?' গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করলো।

'ভালো, চানুদিদি চাঁদার খাতা হাতে বেরিয়েছেন।'

'পঙ্কজ, তোমার মতো কর্মী পাওয়া যে কোন সমিতির পক্ষেই সৌভাগ্য।'

গায়ত্রীর ছেলে এত ছোট যে পঙ্কজিনী তার সামনে প্রকাশ্যে কিছু বললেও সে কৌতূহল বোধ করে না। সুতরাং পঙ্কজিনী বললো, 'আপনি সেদিন ম্যালথাসের কথা কি বলছিলেন যেন?'

'তা বলছিলাম, কিন্তু তার কথা কেন?'

'মন্দাকিনী বলছিলো, তার স্বামী রাজী নয়। বলেছে—তারা গরীব ব'লেই তাদের সম্বন্ধে এরকম বাজে কথা লোকে ভাবে আর বলে।'

মন্দাকিনীর স্বামী সুরেন ব্রহ্ম তার স্বামীর অধীনে একজন কেরানী; সুতরাং আর্থিক অবস্থায় তারা গায়ত্রীদের তুলনায় হীন। একথাও হয়তো মন্দাকিনী তার স্বামীকে ব'লে ফেলবে পঙ্কজিনীর পিছনে মেমসাহেব গায়ত্রী আছে। তারপর সুরেন ব্রহ্ম সে কথা অন্যান্য কর্মচারীকেও বলতে পারে। এই গোপন দাম্পত্য বিষয়ে সুদূর থেকেও সংযুক্ত হওয়ার লজ্জা অনুভব করলো গায়ত্রী, বিব্রত বোধ করলো সে।

'পঙ্কজ, থাক তা হ'লে মন্দাকিনীর কাছে আর যেয়ো না।'

'কিন্তু এ রকম কথা তো অনেকেই বলতে পারে। তার চাইতে শিক্ষিত লোকদের উল্টোপাল্টা কথার উত্তর তৈরি ক'রে রাখা ভালো।'

'তা বোধ হয় ভালো। কিন্তু।'

গায়ত্রী উঠে গিয়ে আলমারি খুললো। মস্তবড়ো এবং চওড়া আলমারি। আলমারি থেকে কিছু নেবার জন্যই পঙ্কজিনী এসেছে। দিয়ে দিলেই সে চ'লে যাবে। চ'লে যাতে যায় এ রকম একটা তাগিদই ছিলো আলমারি খোলার মধ্যে। আলমারির একটি তাকে সমিতির খাতাপত্র, ক্যাস বাক্স, দু'তিনটিতে কাপড় চোপড়, ফ্রক-ইজের দানের জন্য সংগৃহীত। দু'টিতে অনেক ধরনের ওষুধের শিশি বোতল, ইংরিজিতে প্রয়োগক্ষেত্রের নাম লেখা আছে। সব চাইতে উপরের তাকে জন্মশাসনের উপকরণ।

পঙ্কজিনী উঠে এসেছিলো। গায়ত্রীর ছেলের চোখে এই আসবাবটি একটা বন্ধ ঘর যা চকিতের জন্য খুলে আবার বন্ধ হ'য়ে যায়। তারার মতো চোখ মেলে ছেলেটি চেয়ে রইলো, আমরা যেমন ভগবানের রহস্যময় কার্যকলাপের দিকে তাকাই। ঝপ্ ঝপ্ ক'রে কিছু পঙ্কজিনীর মেলে ধরা আঁচলে ফেলে দিলো গায়ত্রী।

'ওষুধ ?'

'থাক আজ।'

চিন্তা করার সময় পেয়ে মন্দাকিনীর বাবদে আর বিব্রত বোধ করলো না গায়ত্রী। বরং তার মনে হ'লো এখন তার হাতে অনেক কাজ। আর্দালি বাজার করে ফিরেছে। তার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে কি-কি রান্না হবে ঠিক ক'রে ঝিকে তরকারি কুটতে ব'লে দিতে হবে। ইতিমধ্যে তার স্নান হ'য়ে যাবে। তারপর সে রান্না করবে। ঘণ্টা দু'একের কাজ, নিজের হাতেই করে সে। তার ধারণা পাচিকাকে নিজের রুচিমতো রান্না শেখানোর চাইতে তাদের ধ'রে ধ'রে ম্যাট্রিক পাস করানো সোজা।

সে সুতরাং স্নানের ঘরে ঢুকেছে তখন। তার ছেলে এ সময়ে বাজারের জিনিসপত্র নিয়ে ঝি এবং আর্দালির সঙ্গে নানা কৌতূহলের প্রশ্ন ক'রে, গল্প করে। স্নানের ঘরে জল ঢালতে ঢালতে এ সবই কানে যায় গায়ত্রীর।

আজ সে শুনতে পেলো ডাকপিওনের গলা, চিঠি আছে। আর্দালি তখন খোকাবাবুর সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত। ডাকপিওন দ্বিতীয়বার ডাকলো। গায়ত্রী স্নানের ঘর থেকেই একটু উঁচু গলায় বললো, বাইরে রেখে যাও। কথাটা বলতে সে বাইরের দিকে যে দেয়াল তার দিকে ফিরেছিলো। সে সময়ে তার খেয়াল ছিলো না সে দিকটাতেই আয়না। ত্রস্তভাবে সে নিজেকে আবৃত করলো। তারপরেই অবশ্য তার মনে পড়লো তার চারিদিকেই দেয়াল। তখন সে স্নান করতে করতেও দু'একবার আয়নার দিকেও তাকালো। সে লক্ষ্য করলো পিঠের দিকে ডান কাঁধের নিচে একটা নীল রঙের তিল বেশ বড়ো হ'য়ে উঠেছে।

সেমিজের উপরে শাড়ি জড়িয়ে ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে সে রান্নাঘরে গেলো। রান্না শেষ ক'রে সে স্নানের ঘরে হাতমুখ ধুয়ে প্রসাধন করবে। এখন তাকে রান্নাঘরে দেখে নেপথ্যের কথা মনে হচ্ছে।

রান্না করতে করতে এক সময়ে সে চিঠির কথা মনে করলো। সদরের দিকে বারান্দার টেব্‌লে দু'খানা চিঠি ছিলো। সে চিঠি নিয়ে এলো। প্রথমখানা খুলে সে বেশ কিছুটা উত্তেজিত হ'লো। সদরের 'নারী সমিতি'র সেক্রেটারি অনিমাদি চিঠি দিয়েছেন। সাধারণ বাৎসরিক সভা নয়: এবার তারা একটি বাড়ি করতে পেরেছে এবং সে বাড়িতে তারা সহরের কয়েকজন পতিতাকে আশ্রয় নিতে রাজি করিয়েছে। আশ্রয়চ্যুতা মেয়েদের যারা পাতিত্যর দিকে পিছলে পড়ার মতো পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরও সেখানে রাখবার ব্যবস্থা হচ্ছে। শুধু আশ্রয় নয়, পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও। তার আরও ভালো লাগলো বাড়িটার প্রস্তাবিত নামটা প'ড়ে—আশ্রম নয়, আশ্রয় নয়—নীড়। সমিতির সভ্য হিসাবে তার কাছে ছাপানো চিঠির সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারি তাকে ব্যক্তিগতভাবে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন যেতে—এককালের সহ-সভাপতি এবং প্রধানতম কর্মীদের একজন হিসাবে। মাছের তরকারিটা রান্না করতে করতে সে গুন্ গুন্ ক'রে গান গেয়ে চললো।

তরকারিটা নামিয়ে সেমিজের মধ্যে থেকে দ্বিতীয় চিঠিটা বার করলো সে। দু'তিন ছত্রের চিঠি। দামি চিঠির কাগজ, কোণায় নাম ছাপানো ঃ ডক্টর মোহিত সেন। সে লিখেছে ঃ শুনলুম তোমার সেই 'নারী সমিতি'র বাৎসরিক সভা হচ্ছে। যদি তুমি আসো, তা হ'লে জানিয়ে রাখি আমি ফিরে এসেছি। আশা করি তুমি তোমার ছেলে এবং আমাদের সাহেব কুশলে আছ।

রান্না নামিয়ে সাবান তোয়ালে নিয়ে সে যখন স্নানের ঘরে ঢুকেছে তার স্বামীর বাইকের শব্দ শোনা গেলো, তারপরে ছেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার স্বামী ঘরে এলো।

সে যখন স্বামীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালো তখন নবাগত বসন্তের ভালোলাগার কারণটুকুই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

টেবিলের মাথায় ছেলে, দু'পাশে দু'জন। খেতে খেতে সাহেব উপনিবেশের দু'চারটে খবর দিলো। পক্স নাকি হয়েছে দু'একটি। সুতরাং ভ্যাক্‌সিনেশান। গায়ত্রী ছেলের হাত উল্টে দেখলো গত বছরের টিকার দাগ চোখে পড়ে কিনা। সাহেব বললো, 'তা হ'লেও এবার দেওয়া উচিত।' গায়ত্রী একমত হ'ল।

সাহেব বললো, 'খুঁড়তে খুঁড়তে সহরের একটা প্রধান অংশে একটি গলি রাস্তার ধারে কয়েকটি একই চেহারার ঘরের ভিত্তি পাওয়া গেছে। যদি বৌদ্ধস্তূপের অংশ হ'তো তা হ'লে বলতাম শ্রমণদের ঘর।

'তোমার কি মনে হয়?'

'কত কি হ'তে পারে। মনে করো বারবণিতাদের ঘর ছিলো।'

'রাখো রাখো। দোকানও হ'তে পারে।'

'তা পারে না এমন নয়।'

কথা মোড় নিলো। ছেলের জলের গ্লাসে জল দিয়ে, অত জল খাসনে ব'লে গায়ত্রী বললো সাহেবকে, 'সদরে একবার যাবো না কি ভাবছি।'

'কিছু কেনাকাটা আছে ?'

'না, 'নারী সমিতি'র বাৎসরিক সভা।'

'কবে যাবে ?'

'পরশুদিন যেতে হয়।'

'সকালের ট্রেনে গেলে সন্ধ্যায় ফিরতে পারবে ?'

'তোমাদের অসুবিধা হবে না তো ?'

'কি এমন হবে। বাপ বেটায় একদিন চালিয়ে নেবো।

কিছুক্ষণ পরে সাহেব বললো, 'সদরে যদি যাও একটা কাজ ক'র তো।'

'কি ?'

'মোহিতের খোঁজ নিও। ও আর চিঠিও দেয় না।'

'যদি দেখা পাই, কি বলবো ? চিঠির কথা গোপন ক'রে মনে মনে হেসে বললো গায়ত্রী।

'বারবার ক'রে আসতে বলবে। সাহেব উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললো, 'ওর সঙ্গে আমার কত গভীর প্রণয় ছিলো বলা কঠিন।'

'তা ছিলো। আমার চাইতে ভুক্তভোগী কে ?'

'হ্যাঁ, সেকালে তোমার ধারণা হয়েছিলো মোহিত পুরুষবেশী কোনো নারী।'

'এটা তোমার বাড়াবাড়ি।'

কথাটা বলার সময়ে না হ'লেও অন্য কথায় যাওয়ার ক্ষণ-অবসরে সে সব দিনের কথা মনে ক'রে গায়ত্রীর কান দু'টি হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠলো। মোহিতের দিকে স্বামীর আকর্ষণ তার স্বামীপ্রেমের পথে বাধা হয়েছিলো ?

সাহেব বললো, 'মোহিত বিয়ে করেছে কিনা কে জানে !'

'তা হয়ত করেছে।'

'না করলেই স্বাভাবিক হয়। ওর ভিতরে একটি সন্ন্যাসী আছে যে সেবা ক'রে পরের কাজে লেগে তৃপ্তি পায়।'

সকালের গাড়ীতে গায়ত্রী সদরে চলেছে। স্বামী এবং ছেলে তাকে তুলে দিয়ে গেছে।

রেলপথের ধারে কোথাওবা আমগাছে মুকুল, কোথাওবা মাঠে ঘাস ফুল তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। প্রথম শ্রেণীর কামরায় দ্বিতীয় যাত্রী এক অতিবৃদ্ধ হলুদ রঙের ট্যাস। তার দিকে পিছন ফিরে ব'সে গায়ত্রী চিন্তা করতে লাগলো। সকালের মধুর বাতাস কপাল ছুঁয়ে যাচ্ছে।

সে ভাবলো, মোহিতের চিঠিটার কথা স্বামীকে বলাই উচিত ছিলো। বলা একটুও কঠিন ছিলো না। মোহিত সম্বন্ধে তার বক্তব্য শোনার পরে হাসতে হাসতে বললেই হ'তো—তা হ'লে শোনো, মোহিতেরও এখন তোমার স্ত্রীর উপরে আর অভিমান নেই।

হাতের ছোট হাতঘড়িতে সে দেখলো প্রায় একঘণ্টা হলো ট্রেন ছেড়েছে। এখনো একঘণ্টা তো বটেই তারপরে সদরে যাবার জংশন, সেখান থেকে অবশ্য আধঘণ্টা পরেই সদর। সভা বেলা তিনটেতে। ফিরবার ট্রেন সন্ধ্যার একটু পরেই, সাড়ে সাতটায়। সভা যদি তিন ঘণ্টা চলে, তা হলেও ট্রেন ধরা যাবে, তখন আর মোহিতের সঙ্গে দেখা করা যাবে না। যদি দেখা করতেই হয় তবে সভার আগেই—অল্প সময়ের মামুলি আলাপ।

এই রকম সভাটার জন্যই যেন দীর্ঘকাল সে প্রতীক্ষা ক'রে এসেছে। সদরের কলেজে তার স্বামী অধ্যাপক। তখন সে যে ছোট নারী সমিতি তৈরি করেছিলো তার নানা কর্মসূচী ছিলো। বয়স্ক মেয়েদের সেলাই শেখানো, খবরের কাগজ পড়ার নেশা ধরানো, হস্‌পিট্যালে মেয়েদের জন্য দু'একটা শয্যা বাড়ানো, এমন কি তাদের নিয়ে রবীন্দ্র উৎসব প্রভৃতি করা। কিন্তু তাদের সেই সমিতি এমন মহৎ কাজ শেষ পর্যন্ত করবে এ কল্পনা করা যায় নি। পতিতাদের পুনর্বাসনের কথা সব সমাজদরদীই ভাবে। হাতে কলমে এ যেন উদাহরণ স্থাপন করা। সারা বাংলায় না হ'ক অন্তত একটি সহরে হচ্ছে।

সেক্রেটারি অনিমাদি ভুবনবাবু উকীলের স্ত্রী। সহজে সমিতিতে আসেন নি, যখন এলেন তখন সদরের হোমরা-চোমরাদের চোখে প'ড়ে গেলো সমিতি। ভদ্রমহিলা কংগ্রেসের বৈপ্লবিক দিনে কংগ্রেসী ছিলেন। যার ফলে পুরুষদের সঙ্গে তর্ক করার একটি নিঃসঙ্কোচ ভঙ্গি জন্মেছে তার। তিনি ছাড়া এতবড় কাজে হাত দিতে আর কেই বা সাহস পেতো।

আরো অন্য অনেকে হয়তো আসবে। অন্য অধ্যাপকদের স্ত্রীরা, উকিলদের স্ত্রীরা। পরিচিতারা হয়তো অনেকেই আসবে।

সুতরাং খুশিতে একটা স্মিতহাসি ফুটে রইলো তার মুখে।

আর সে নিজের দিক থেকেও খবর দিতে পারবে। সকলকে বলা যাবে না, তবে সে রকম অতিপরিচিত কাউকে যদি পাওয়া যায়, তাকে সে পঙ্কজিনী এবং তার নিঃশব্দ সমাজসেবার কথা বলবে। সমাজসেবা বৈ কি। দারিদ্র্য এবং স্বাস্থ্য-হীনতা জীবনকে শ্মশান ক'রে দেয়। তার থেকে রেহাই পাওয়ার সহজ পথই দেখিয়ে দিচ্ছে সে। স্বাস্থ্যের কথাই ধরো—ও বস্তুটি ছাড়া স্বামী কিম্বা ভগবান কারো সেবাতেই লাগা যায় না। প্রেমের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নয়?

কিন্তু তুলনা হয় না। সংঘশক্তির সাহায্যে অনিমাদি যা করতে পেরেছেন, ভাবাই যায়নি। দেশে এখনো পতিতাবৃত্তি নিরোধের আইন পাস হয় নি, এরই

মধ্যে স্খলিতাদের শুধু নৈতিক বলে ফিরিয়ে আনা। 'নীড়'—কি সুন্দর নামটি এই 'নীড়'।

নারী যদি প্রেমকে বিলিয়ে দেয়, পণ্য করে, কি থাকে তার ? কি থাকে সমাজের ? মানুষের গর্ব করার কি থাকে ?

চায়ের পিপাসা পেলো যেন। তার হাত ব্যাগটায় চায়ের ছোট ফ্ল্যাক্সটাই শুধু সাহেব নিজের হাতে পুরে দেয়নি, চাটুকু পর্যন্ত নিজে ক'রে দিয়েছে। গায়ত্রীর মুখে মধুর হাসি তার তৃপ্তির প্রকাশ হ'য়ে ফুটলো। চা খেতে খেতে তার মনে হ'লো. গোপন ক'রে কিছু ক্ষতি হয় নি, তবে এ রকম লোকের কাছে তিলমাত্র গোপন করাও যেন মানায় না। মোহিতের চিঠিটার কথা।

মোহিতকে স্বামী এক সময়ে ভালবাসতো। তার জন্যই কি হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতসারে সে গোপন করলো চিটিটাকে। লুপ্ত-বিদ্বেষ ? নিজের মনকে এভাবে বিশ্লেষণ ক'রে সে অবাক হ'লো, মনঃবিশ্লেষণের মত কঠিন ব্যাপার এমন হাতে হাতে ফল পেয়েই যেন।

এখন সে জানে স্বামীর কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। মোহিতের চেহারা মেয়েলি ব'লেই তাকে সাহেব ভালোবাসতো এটা ঠিক নয়। ভালবাসার কারণ মোহিতের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। আর বোধ হয় গায়ত্রীর নিজের চরিত্রেও সেবাব্রতের দিকে তেমনি একটা ঝোঁক আছে ব'লেই মোহিতের জায়গায় সে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

স্টেশনে নেমে হাতব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে বেরুতে বেরুতে হাতঘড়ির সঙ্গে স্টেশনের বড়ো ঘড়িটার সময় মিলিয়ে সামনে চাইতেই চোখ পড়লো মোহিতের মুখের উপরে। মোহিত বললো, 'ব্যাগটা দাও'।

'থাক না। কি এমন ভারি।' ব'লে গায়ত্রী ব্যাগটা দিলো।

'ভালো আছ তো।'

'তা আছি।'

মোহিতের গলার স্বরেও কোনো পরিবর্তন হয় নি, তেমনি নরম ও অনুচ্চ।

একটা গাড়িতে ব'সে হুইল ধ'রে মোহিত বললো, 'এই গাড়িটা কিনেছি।'

'কেন হঠাৎ গাড়ি কিনলে যে ?'

'আমার কি গাড়ি কেনা বারণ ?'

'তুমি তো সন্ন্যাসী ছিলে, গৃহী হয়েছ নাকি ?'

'কোনোটিই নয়।'

গায়ত্রী একটু বা চোরা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো মোহিতকে। তেমনি ঈষৎ লাল চুলের মধ্যে তেমনি চেরা সিঁথি, মুখে তেমনি লাজুক হাসি। তার মনে হ'লো এই মেয়েলি ভাবটা না থাকলে মোহিতের কোনো বৈশিষ্ট্যই থাকতো না। বিদ্যার তীক্ষ্ণতাও তার দৃষ্টিতে নেই।

কিছু দূর যাওয়ার পর মোহিত বললো, 'সাহেব ভালো আছে তো ?' কথাটা বলতে গিয়ে মোহিত লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো।

গায়ত্রী বললো, 'বেশ ভালোই আছে।'

গাড়ি মোড় নিলে গায়ত্রী বললো, 'তুমি কি আজ ছুটি নিয়েছো, মোহিত ?'

'তা নিয়েছি।'

'যদি না আসতাম তা হ'লে কি আবার কলেজে যেতে ছুটি নাকচ করে ?'

'না মাছ ধরতে যেতুম।'

হঠাৎ এবার গায়ত্রী লজ্জিত হ'লো। কারণ এতক্ষণ সে মোহিতের মেয়েলি লজ্জার কারণটা চিন্তা ক'রে ক'রে নিজের মনের মধ্যে তাকে অবগুণ্ঠনহীন ক'রে ফেলেছে এবং সেকালের সেই রেষারেষির দু'একটা ঘটনাও তার মনে পড়ছে। সেও লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো।

অনিমাদির বাড়িতে পৌঁছুতেই ওরা খবর দিলো তারা সবাই সমিতির অফিসে। সেখানেই গায়ত্রীকে নামিয়ে দিলো মোহিত।

'এখনি কি মাছ ধরতে যাবে ?'

'তাই যাবো।'

গায়ত্রীর মনে হ'লো সে বলবে—দেখা করার কথা লিখেছিলে, এই তো তা হ'য়ে গেলো। সে মনোভাবটাই সে প্রকাশ করলো, 'সাড়ে সাতটায় ট্রেন। যদি সাড়ে ছটায় এখানে আসো একসঙ্গে স্টেশনে যাওয়া যায়।'

'তাই হবে।' মোহিত চ'লে গেলো।

সমিতির পুরনো সঙ্গী সবাই নেই। অনেকের স্বামীই বদলী হয়েছে। কিন্তু যারা ছিলো তারা গায়ত্রীকে দেখতে পেয়ে হৈ-চৈ ক'রে অভ্যর্থনা করলো। তখন কার্যকরী সমিতির একটা সভা চলছিলো। সভা বানচাল হ'য়ে যাবার মতো হ'লো। শুধু অনিমাদি সেক্রেটারী ব'লেই প্রস্তাবগুলো আলোচনা হ'লো, সভা শেষ হ'লো। কিন্তু তা শেষ হ'তেই অনিমাদি নিজেই এগিয়ে এলেন গায়ত্রীকে নিয়ে হৈ-চৈ করতে।

আলাপের মাঝখানে এক সময়ে অনিমাদি বিদায় নিলেন। তাঁর বাড়ীতে অসুখ, একবার না গেলেই নয়।

'কার অসুখ ?' গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করলো।

'দুই মেয়েই এসেছে। বড়ো মেয়ের এক ছেলের পান বসন্ত। ডাক্তার বলেছে ভয়ের নয়, কিন্তু বাড়ি-ভরা কাচ্চা বাচ্চা, ওদিকে রোগটাও ছোঁয়াচে। তোর স্নান-টানের ব্যবস্থা হয়েছে এস-ডি-ওর বাড়িতে। আমি যাবো আর আসবো।'

'তা জানি।' গায়ত্রী হাসিমুখে বললো।

এস্. ডি. ওর গৃহিণীর সঙ্গে অতঃপর আলাপ হ'লো। তার বাড়িতে স্নানাহার শেষ ক'রে গায়ত্রী আবার সমিতির বাড়িতেই ফিরে এলো; সমিতির ঘরে তখন

স্বেচ্ছাসেবিকাদের মতো কয়েকজন কলেজ-ছাত্রী ফুলের মালা ইত্যাদি তৈরি করছে। গায়ত্রী তাদের সঙ্গে জীবনের আদর্শ ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করলো।

সহরের উপান্তে একটি পাটগুদাম কিনে 'নীড়' স্থাপিত হয়েছে। চারিদিকে ঢেউতোলা টিনের উঁচু প্রাচীরের মধ্যে বড়ো একটা ঘর। পার্টিশান ক'রে কতগুলো খোপ তৈরি হয়েছে। একটা রুক্ষ ঘাসে ঢাকা আঙ্গিনা পা হ'য়ে সমিতির অফিস ঘর উঠেছে। তারই কাছাকাছি উঠেছে হাতের কাজ শেখনোর জন্য যারা নিযুক্ত হয়েছে এবং হবে তাদের জন্য মেস বাড়ি। প্রাচীরের বাইরে বুড়ো দারোয়ানের ঘর।

দ্বারোদঘাটন হ'লে অনিমাদি ঘুরে দেখালেন—কোথায় মেয়েরা রান্না করবে, কোথায় তারা কাজ শিখবে। তারপরে এলেন তাদের শোবার ঘরে। প্রত্যেক ঘরে পাশাপাশি দু'খানা কেরোসিন কাঠের চৌকি। প্রত্যেক চৌকির উপরেই একটা নতুন বিছানা। ঘরের কোণে কোণে রংচটা দু' একটা টিনের বাক্স। যাদের এসব তারা ঘরে ছিলো না। অনিমাদি ডাকলে তারা ঘরে এলো।

আগেই গায়ত্রীর গা শির-শির করছিলো, এবার তাদের চেহারা দেখে গা-ঘিন-ঘিন ক'রে উঠলো। অস্বাস্থ্যর কদর্যতা চোখে পড়লো। তার চাইতে বেশী—তার মনে হ'লো—আর কি হয়? মনের দাগ কি ঘষে তোলা যায় এদের?

কিন্তু অনিমাদির সংস্পর্শে এসে আদর্শের উত্তাপে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলো সে। রোগ দেখে গা ঘিন ঘিন করলেও ক্লেদ ছাপ করার মতো একটা সাহস ফিরে পেল সে।

মহিলাদের সমিতি হ'লেও পুরুষরা অনেকে এসেছিলো। এস-ডি-ও সবশেষে চমৎকার বললো এই মহৎ সূচনাকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং যথাশক্তি সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। জজ সাহেব আসতে পারেননি। অনিমাদির নির্দেশে গায়ত্রীকেই বক্তৃতা দিতো হ'লো সমিতির পক্ষ থেকে। বক্তৃতার এক জায়গায় তার চোখে জল এসেছিলো। সে চোখ মুছে দেখেছিলো চশমার নিচে অনিমাদির চোখেও জল এসেছে।

সমিতির প্রত্যক্ষ সভ্য নয় এমন দু'একজন পরিচিত মহিলা এসেছিলো সভায়। তাদের সঙ্গে আলাপ করলো গায়ত্রী। দু'একজনকে সে নিমন্ত্রণ জানালো, দু'একজন তাকে নিমন্ত্রণ করলো।

গল্প শেষ ক'রে মহিলা সমিতির ঘরেও যেতে হ'লো। সেখানে গায়ত্রীর জন্যই ছোটোখাটো একটা চায়ের আসর ছিলো। সে অনিমাদিকে এবং অন্যান্য মহিলাদের বারংবার ধন্যবাদ দিলো এই মহৎ কাজের জন্য। ধূলিলুণ্ঠিত নারীত্বকে যারা বাঁচায় তারা নিশ্চয়ই সম্মানের ও সম্বর্ধনার যোগ্য।

'আজ থেকে গেলে হ'তো গায়ত্রী।'

'বাড়িতে ব'লে আসিনি।'

'না-না গায়ত্রীদি, আজ আমার বাড়িতে থাকো।'

'তা হবে না, ভাই।'

নানাদিক থেকে প্রস্তাবগুলো আসছিলো।

ঘড়িতে সাড়ে ছটা বাজে। মহিলা সমিতির দরজার কাছে গায়ত্রী দেখতে পেলো মোহিত তার জন্য অপেক্ষা করছে।

'বিদায় নেয়া হ'লো ?'

'হয়েছে।'

'চলো একটু চা খেয়ে নেয়া যাক।'

মোহিত একটা বড়ো রেঁস্তোরার সামনে গাড়ি থামালো।

'সে কি এখানে ? আমি ভেবেছিলাম তোমার বাসায় যাবে।'

'বাসায় গিয়ে কি হবে ? সেখানে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। তোমাকে চিঠি লিখে মনে হ'লো পরে, চাকরটাকে পর্যন্ত ছুটি দিয়েছি সাতদিনের জন্য।'

চা খেয়ে :তারা যখন স্টেশনে পৌঁছালো তখনও ট্রেনের আধঘণ্টা দেরী। প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতে গল্প করলো তারা।

একটু হেসে গায়ত্রী বললো, 'জানো, মোহিত, এক সময়ে মনে হ'তো তুমি আমার প্রেমের পথে কাঁটা।'

'সে ভাবটা সত্যি কি অনেকদিন ছিলো তোমার ?' মোহিতের কৌতূহলটা স্নিগ্ধ।

'এ সহর থেকে চ'লে গিয়েই তবে সে আশঙ্কা একেবারে গেছে।'

নীরবে কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটলো তারা।

'আচ্ছা, মোহিত, একটা ভারী কৌতূহল হয় আমার, তুমি—'

'কি আমি ?'

গায়ত্রীর প্রশ্ন ছিলো—বিয়ে করলে না কেন। প্রশ্নটা উচ্চারিত হওয়ার ঠিক আগের পলকে তার মনে হ'লো, কোথায় যেন সে পড়েছে, মেয়েরা অর্থাৎ যাদের এমন প্রশ্ন করার সুযোগ হয়, তারা সকলেই এ জলো প্রশ্নটা করে।

গাড়ি আসবার সময় পার হ'লো দু'জনের হাতঘড়ি এবং স্টেশনের বড়ো ঘড়িটাতেও। আরও কিছুক্ষণ পায়চারি ক'রে কাটালো তারা, তারপরে মোহিত স্টেশন মাস্টারের কাছে খবর নিলো। ডাউনে কি একটা গোলমাল হয়েছে গাড়ি আসতে ঘণ্টাখানেক দেরি হবে।

পায়ে পায়ে তার প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে চ'লে এলো যেখানে সিগন্যাল পোস্টের মাথায় মিটমিটে একটা আলো জ্বলছে, আর তার ওপারে একটা গ্রাম্য সন্ধ্যার অন্ধকার।

'সে সময়ে আমি কখনো তোমাকে অবহেলা দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি। তা কি তুমি বুঝতে, পারতে মোহিত ?' গায়ত্রী হাসলো কি ?

'পারতুম।'

'বিচলিত হ'তে না তো ?'

'কি লাভ হ'তো তা হ'য়ে ?'

স্টেশন মাস্টারের বলা এক ঘণ্টা সময় পার হ'য়ে সাড়ে আটটা হ'লো রাত্রি। মোহিত আবার খবর নিয়ে এলো।

সে বললো, 'আরও আধঘণ্টা, তোমার আজ কষ্ট হ'লো।'

'কিছু নয়। কিন্তু তুমি ফিরে কোথায় খাবে ?'

'রান্না করবো।'

'বলো কি ?'

'চাকরটা ছুটি-ছাটা নিলে তা করতে হয়।'

'মোহিত, তুমি তা হ'লে আর দেরি ক'রো না।'

'না হয় একটু দেরি হবে।'

'তা কি হয় ! মাছ ধরেছিলে, সেগুলো এতক্ষণ প'চে গেলো।'

অবশেষে বিদায় নিলো মোহিত।

'মোহিত।'

'কিছু বলবে।'

'মোহিত, তোমার চিঠিটার কথা কিন্তু সাহেবকে বলি নি।' গায়ত্রীর মুখে একটা নিঃশব্দ হাসি ঝিক্‌মিক্ করলো।

'তা করতে গেলে কেন ?'

'তা আমিও বুঝতে পারছি না। তুমি কিন্তু গল্পে গল্পে কোনোদিন ব'লো না সাহেবকে।'

মোহিত চ'লে গেলে একটা পত্রিকা খুলে বসলো গায়ত্রী, কিন্তু পত্রিকায় তার মন বসলো না। আজকের দিনটার এক একটা ছবি ভেসে উঠতে লাগলো তার মনে। ভারি ভালো একটা কিছু করলো এরা।

তারপর তার মনে হ'লো বাড়ির কথা, ছেলে, এবং সাহেবের সন্ধ্যার আলো-জ্বালা কক্ষ। এরপরে সে ফিরে এলো মোহিতের কথায়। মোহিতের সঙ্গে এমন একা একা মিশবার সুযোগ এর আগে ঘটে নি, এত কথাও বলে নি। একটু দ্বিধা করতে হ'লো তাকে। কথাটাকে ওজন করতে হ'লো। কথা যদি না ব'লে থাকে তবে হঠাৎ তাকে নাম ধ'রে ডাকলো কি ক'রে ? সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই তা হ'লে একটা পরিচয় হয়েছিলো যা সে নিজেই এতদিন জানতে পারে নি।

নটা বাজলে সে খোঁজ নিলো স্টেশন মাস্টার খেতে গেছে। সহকারী বললো 'আপে কি একটা গোলমাল হয়েছে।'

'শুনেছিলাম ডাউনে কি হয়েছে।'

হাতঘড়িতে এগারোটা বাজলো। ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে গায়ত্রী এবার সামনে যাকে পেলো তাকেই জিজ্ঞাসা করলো। সে একজন পোর্টার। সে বললো, স্ট্রাইক হয়েছে জংশনে, গাড়ি যাওয়া আসা বন্ধ। কখন আসবে কেউ জানে না।'

গায়ত্রী বিশ্রাম ঘরে ফিরে কপাল টিপে ধ'রে বসলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পরেই সে বেরিয়ে এলো। প্ল্যাটফর্মের ভিড় অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে। গাড়ি আসবে না, এই কথা বলাবলি ক'রে অন্যান্য যাত্রীরাও চ'লে যাচ্ছে। তা হ'লে ? সারারাত প্ল্যাটফর্মে কাটানো যায় না বিশ্রাম ঘরে ব'সে। একবার সে ঘরটার খিলটিলগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিলো। না। এরপরে সহরে যাবার গাড়িটাড়িও পাওয়া যাবে না।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বললো সে, 'চলো'

কিন্তু কোথায় যাবে সে এইরাত্রিতে। অনিমাদির বাড়িতে যাওয়া যায়। কিন্তু বাড়িতে হয়তো তার স্থানাভাব। তা ছাড়া পক্স হয়েছে। পান-বসন্ত বড্ড ছোঁয়াচে।

অনেকে নিমন্ত্রণ করেছিলো কিন্তু এত রাত্রিতে গিয়ে কি তাদের বলা যায় আমি ফিরে এলাম। কি বিশ্রী ? কিন্তু কোথায় যাবে সে ? এখনি ড্রাইভার গন্তব্য জিজ্ঞাসা করবে। গায়ত্রী একটা সিদ্ধান্তের জন্য মনকে মথিত করতে লাগলো। সে কি 'নীড়ে' আশ্রয় নেবে, সেই আশ্রয়হীনাদের সঙ্গে। সে বাড়ির দারোয়ান তাদের মহিলা সমিতির পিওন ছিলো। কিন্তু সেই স্বৈরিণীদের কথা মনে পড়তেই গা ঘিন্‌ঘিন্‌ ক'রে উঠলো তার। তারপরই সে অনুভব করলো, মাথা গরম না হ'লে এমন উদ্ভট কল্পনা কেউ করে ?

'কোনপথে যাব, মাইজি ?'

এখনি বলতে হবে। কার বাড়িতে যাবে যে—এস, ডি,ওর বাড়িতে ? কোথায় ? ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়েছে। এখনি হয়তো সে পিছন ফিরে তাকাবে। ছোট সহর, পথ ইতিমধ্যে নির্জন। গাড়ি একটা পানের দোকানের দিকে এগোচ্ছে। তার সামনে কয়েকটি লোক যেন অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। রাত এগারোটায় একা-একা চলেছে সে। তাকে কি ভ্রষ্টা মনে করবে ড্রাইভার। আর—। শিউরে উঠলো সে।

'মাইজি—'

'তোমাকে যে বললাম কলেজের দিকে যেতে।'

কসুর মাপ করার কথা ব'লে ড্রাইভার গাড়ি ঘোরালো।

'হ্যাঁ, এই বাড়ি।'

'মোহিত, মোহিত।'

'কে ?'

'মোহিত, দরজা খোলো'

'কে গায়ত্রী ? গাড়ি আসে নি ?'

মোহিত দরজা খুললো। সেই নীল আলো জ্বালা ঘরে ঢুকে নিজের হাতে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে দিলো গায়ত্রী।

'কি হ'লো।'

'কিছু না।' গায়ত্রী অত্যন্ত বিবর্ণভাবে হাসলো।

'কি করবো এখন, মোহিত ?'

'বিশ্রামের ব্যবস্থা।'

এটা মোহিতের শোবার ঘর। ঘরের একদিকে একটা বইএর সেল্প, অন্যদিকে তার বিছানা, ঘরের অন্য দেয়ালে একটা গোল দেয়াল-ঘড়ি। তার নিচে একটা ছোটো লিখবার টেবিল। তার উপরে খান দু'চার বইএর পাশে টেলিফোন। একখানামাত্র চেয়ার। বিপরীত দিকে একটি বড়ো সোফা।

সেই সোফায় বসেছিলো গায়ত্রী। মোহিত উঠে এসে গায়ত্রীর হাত ধ'রে তাকে টেনে তুললো. 'ওঠো'। স্নানের ঘরে চৌবাচায় জল আছে। আমি এদিকে তোমার খাবার ব্যবস্থা করি।'

হাতমুখ ধুয়ে পোশাক পালটে ফিরে আসতে তার দেরি হ'লো কারণ সে চিন্তাও করছিলো।

সে ফিরে এসে দেখলো মোহিত স্টোভ ধরিয়ে রান্নার যোগাড় করছে।

'তুমি সরো, মোহিত, আমি একটু চা করে নি।'

'শুধু চা ?'

'তা কেন। কাল সকালের জন্য রুটি মাখন কি কিছু কেনা নেই ?'

এক টুকরো রুটি আর এক কাপ চা নিয়ে গায়ত্রী শোবার ঘরে এসে দেখলো মোহিত সোফার উপরে একটা বিছানা পাতছে।

চা খাওয়া হয়ে গেলো।

গায়ত্রী বললো, 'শেষ পর্যন্ত এই হবে জানলে, আজ তোমাকে রান্না করে খাওয়াতে পারতাম।' সে হাসতে চেষ্টা করলো।

'তা যদি জানতাম তা হ'লে কি মাছগুলো বিলিয়ে দেই ?'

'ঘুমুবে না ?'

'ঘুম কি হবে ?'

'এত চড়া আলোতে ঘুম হয় না। র'সো।'

মোহিত বই পড়ার আলোটা নিভিয়ে আবার ঘুমের নীল আলোটা জ্বাললো। নিজের বিছানা সে গায়ত্রীর জন্য ছেড়ে দিয়েছিলো। সোফায় কোনো রকমে শুয়ে সে বললো, 'এ যেন একটা ষড়যন্ত্র। তোমায় চিঠি দিয়ে ডাকলুম, তা তুমি গোপন করলে। ট্রেন ফেল ক'রে চ'লে এলে আরও গল্প করার জন্যে।' মোহিত হাসলো।

গায়ত্রী হাসবার চেষ্টা করলো।

'আচ্ছা. মোহিত,'

'কিছু বললে ?'

'না। ঘুমাও।'

দেয়াল ঘড়িতে খুব চাপা সুরে একটা বাজলো।

'ঘুমুতে পারছো না ?' মোহিতের গলা।

'গরম লাগছে না ?'

'জানালা খুলে দেবো ?'

'আমি দিচ্ছি।'

গায়ত্রী জানালা খুলে দিয়ে জানালার পাশে দাঁড়ালো। বাইরে অন্ধকারের পর্দা।

'দাঁড়িয়ে রইলে যে ?,

'বাতাসটা—'

'জানো,' মোহিত উঠে গিয়ে দাঁড়ালো তার পাশে, 'অবাক লাগছে। তোমাকে যেন আজই প্রথম দেখলুম। প্রথম দেখাটা ভারি আশ্চর্য জিনিস।'

দেড়টা বাজলো। সে শব্দে ঘড়ির দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে গায়ত্রী কিছুক্ষণ ধ'রে টিক্‌টিক্ শব্দটাও শুনতে পেলো : তার বুকেও একটা শব্দ হচ্ছে যেন।

আকস্মিকভাবে টেবিলে ফোনটা বেজে উঠলো।

'এত রাত্রে ?' মোহিত বিস্মিত হ'য়ে ফোন ধরলো।

'হ্যাঁ, আমি। বলছি। সাবাস। খুব যোগাযোগ করছে তো। হ্যাঁ তা তিনি তো রওনা হয়েছিলেন সাড়ে সাতটায়। ও। তা হ'লে এই সহরেরই কোথাও আছেন। আচ্ছা কাল সকালে স্টেশনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা পেলে জানাবো তোমাকে ফোন ক'রে। না ভয় কি ? এখানে তাঁর পরিচিত লোকের তো অভাব নেই। হ্যাঁ, তা বৈকি, তারা সবাই সমৃদ্ধিশালী।"

মোহিত ফোন ছেড়ে যখন ফিরলো তখনও তার মুখে হাসিটা ধীরে ধীরে বিবর্ণ হচ্ছে।

'কে মোহিত ?'

'সাহেব।'

'সে কি ? আমাকে খোঁজ করছিলো ? গোপন করলে কেন ? আ-মোহিত এ তুমি কি করলে ?'

দুটো বাজলো।

'ঘুমিয়েছো মোহিত ?'

'না। ফ্যানটা কি খুলে দেবো ?'

'না। আলোটা বরং নিভিয়ে দাও।'

'আচ্ছা, মোহিত, কি পড়াও তুমি কলেজে ?'

'অর্থনীতি।'

কথা এগুলো না।

'শোনো মোহিত, তুমি এখানে এসো।'

'কেন ?'

গায়ত্রী নিজেই বিছানা ছেড়ে সোফায় মোহিতের কাছে গিয়ে বসলো। চাপা

গলায় বললো,

'আমরা কি জোরে জোরে কথা বলছি না।'

'না তো।'

'আমার যেন মনে হচ্ছিলো, পাড়ার লোকরা শুনতে পাচ্ছে।' ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো গায়ত্রী।

চারটে বাজলো।

'বৃথা চেষ্টা।' মোহিত উঠে দাঁড়ালো। 'চা করি একটু স্টোভ ধরিয়ে।'

আলো জ্বাললো মোহিত। গায়ত্রীকে যেন চেনা যাবে না এমন রক্তহীন দেখাচ্ছে তাকে।

'তুমিই না হয় একটু চা করো। তারপর ভোর হ'তে হ'তে গাড়ি ক'রে রওনা হবো। ছটা নাগাদ পৌঁছে যাবো সাহেবের বাংলোয়।'

চা খেয়ে দরজায় কুলুপ এঁটে গারাজ খুলে গাড়ি বার করলো মোহিত।

চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। পৃথিবীর চোখ বন্ধ।

'মোহিত।'

মোহিতের কাঁধ থেকে কুনুই পর্যন্ত বাহুতে গায়ত্রী বারবার নিজের দু'হাত ঘষতে লাগলো।

গাড়ি যখন সহরের সীমা ছাড়িয়েছে মোহিত বললো, 'এই ভালো হ'লো, সহরের কারো চোখেই তুমি পড়বে না।'

'কী অন্ধকার!' বললো গায়ত্রী।

'হ্যাঁ, যেন মাঝরাত।'

'মাঝরাত বলছো?'

'অন্তত গাড়ি চালানোর দিক থেকে।'

'আচ্ছা, মোহিত—'

'কিছু বলছো?'

'এ বুদ্ধিটা, এই মোটরে যাওয়ার বুদ্ধিটা রাত এগারোটাতে করলেও চলতো?'

'তা হ'তো। একথা বলছো যে?'

'কেন তবে, আচ্ছা মোহিত—'

'জানো, গায়ত্রী, আমরা যেন এক নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি রাত চারটে পর্যন্ত।'

কথাটাকে রসিকতার জাতে তুলবার চেষ্টা ক'রে বিফল হ'লো মোহিত।

'মোহিত, গাড়ির ভিতরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গাড়ি চালাতে পারো?'

আলোটা নিভিয়ে দিলো মোহিত। রাস্তার ধুলো হেড লাইটের আলোয় পোকার মত কিলবিল করছে।

'আচ্ছা, মোহিত, তুমি সাহেবকে গোপন করলে কেন?'

চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে গাড়িটা থর থর ক'রে কাঁপছে। গায়ত্রীর মনে

হ'লো একটা অন্ধকার নিঃসঙ্গ কুপেতে সে শুয়ে আছে। মেল ট্রেন ছুটে চলেছে। বাইরে কখনো আলোকিত স্টেশন ছিটকে যাচ্ছে। সে আধ-ঘুমন্ত অবস্থায়, তার মনে হ'তে লাগলো: কৃত্রিম। এই শব্দটাই বারবার মনে হ'তে লাগলো একটা অব্যক্ত অনির্দিষ্ট আবেগের মতো। সম্মুখের গতিটাই যেন কৃত্রিমতার পরিহাস। শুধু অন্ধকারটা তাকে যেন শান্তি দিচ্ছে ব'লে সে জানালা খুলে চিৎকার ক'রে কিছু বল্‌ছে না। শুক্তির দুটি ডালায় আটকানো অন্ধকার যেন।

তারপর তার স্বপ্নের পরিবর্তন হ'লো। সে যেন দেখতে পেলো কৃত্রিম রেল লাইনের পাশে ঘাসফুল ছুটে চলেছে। যেন রাজপথের ফাটলে ফুটে উঠতেও পারে তারা।

'মোহিত।'

'কি ?'

'না কিছু নয়, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যেন।'

'গায়ত্রী, কালকের রাত্রিটার কথা যদি সাহেবকে বলি সে কি রসিকতা হিসাবে নেবে না।'

'নাও নিতে পারে। আমরা দুজনে যে নরকযন্ত্রণা ভোগ ক'রেছি সে কথা অন্যকে ব'লে লাভ কি ?'

শুক্তির ডালা কথাটা তার মনে আবার লাগলো। যে গোপনতায় বাইরের বালি কাঁকড় ঢুকে একটি মুক্তো তৈরী করার সূচনা করে সেখানে পৃথিবীর দৃষ্টি যায় না। মনের গভীরে যেন অবগাহনের শীতল অন্ধকার আছে মোহিতের ঘরের জানালা খুলে যে রকমটা চোখে পড়েছিলো। গায়ত্রী গুন্‌ গুন্‌ ক'রে গান গেয়ে চললো।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সাহেব আর্দালিকে পাঠাচ্ছিলো স্টেশনে খবর করতে। এমন সময়ে গাড়ি থামলো দরজায়। নামলো গায়ত্রী, নামলো মোহিত! তারপর সাহেব দুজনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো।

নিজের ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণের জন্য মাথাটা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করলো গায়ত্রীর। সে যেন নীল কিছু দেখতে পাচ্ছে। যেন মোহিতের ঘরের সেই নীল আলোয় এ ঘরের সব কিছু ছোপানো। রাত জাগলে মাথা ঘোরে, তার জন্যেই হয়তো এমন হ'লো। এবং তার জন্যই নিজের পরিচিত ঘর নতুন নতুন লাগছে! অবাক-অবাক বোধ হ'লো।

মোহিতকে কি চিঠিটা গোপন রাখার কথা বলা দরকার ?

সে একটু স্পষ্ট গলাতেই গান করতে করতে ছেলের ঘরে গেলো।

তন্ত্রসিদ্ধি

ঘোষালডাঙার ঘোষালরা এবং ঘোষপাড়ার ঘোষেরা উভয় পক্ষই আভিজাত্য দাবি করতে পারে। দুই আভিজাত্যে কিছু পার্থক্য আছে। গত শনিবারে ঘোষেদের ছোট ছেলে যথারীতি বাড়িতে এসেছে। যথারীতি হীরুর রিকসাতেই। এটা যথারীতি হওয়ার কারণ—মাস ছয়েক আগে, তাকে সওয়ার করা নিয়ে হীরু এবং আর-একজন রিকসাওয়ালাতে মারামারি হয়েছিল। হীরু মার খেয়েছিল, হেরে গিয়েছিল, সেজন্য তার পক্ষপাতী হয়েছিল সুকুমার, ঘোষদের ছোট ছেলে। হীরু সেদিনই সুকুমারকে ব'লে ফেলেছিল, "ডাল-বুটি খাওয়া ছোটলোক শালারা, ওদের সঙ্গে মারামারি করা কি ভদ্রলোকের কাজ।" হাজাম ঠাকুর দাড়ি কামাতে-কামাতে, আর কোন-কোন রিকসাওয়ালা প্যাডেল করতে-করতে গল্প ক'রে থাকে। সুকুমার আবাল্য শিখেছে তাদের গল্প হুঁ-হাঁ না-ক'রে শুনে যেতে হয়। ভদ্রলোকের সেটাই রীতি। অনেকক্ষণ ডাল-বুটি-ছাতুর নিন্দা এবং তারা কত কোটি টাকা বিহারে পাঠায় বাংলাদেশকে শোষণ করে, তার পূর্ণ বিবরণ হীরুর মুখে শুনে সুকুমার জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি বুঝি বাঙালি ?" হীরু বলেছিল, সে শুধু বাঙালি নয়, সৎ ব্রাহ্মণ, ঘোষাল বংশের ছেলে। তিলে পড়ে কালচে হ'য়ে যাওয়া সস্তা টেরিকটনের বুক খোলা জামার মধ্যে থেকে তেলকাস্টে জড়াপাকানো সুতোর গোছা বার ক'রে দেখিয়ে দিয়েছিল হীরু। এখন সুকুমার জানে, ঘোষালদের এককালীন প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের পূর্ব কোণে, বটগাছ গজিয়ে ফেটে হাঁ হ'য়ে যাওয়া একটা ঘরে হীরুর সংসার। কিন্তু কথা হচ্ছিল গত শনিবার সম্বন্ধে।

ঘোষদের বাড়ির সামনে হীরু সুকুমারকে নামিয়ে দিয়ে ফিরছিল। এখন আর কোনো ট্রেন নেই যে সে স্টেশনে যাবে। বরং এখন ডম্বিকালী বাড়িতে যাবে। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির প্ল্যাকার্ড-লটকানো রিকসা স্ট্যাণ্ডে মন্দির-চত্বর ঘেঁষে তার একটা জায়গা আছে রিকসা রাখার, যেটা সহজে কেউ দখল করে না। সেদিন সবই অন্যান্য শনিবারের মতো ছিল। মেঘ বৃষ্টি ছিল না, চড়া রোদ ছিল না, ট্রেন প্রায় ঠিক সময়েই এসেছিল। এমন-কি ঘোষেদের ছেলে যে-আধুলিটি দিয়েছে সেটাও চকচকে, এমন নতুন যে, খরচ করতে মায়া হয়। এখানে ব'লে রাখা যায়,

এটা সুকুমারের রীতি যে হীরুকে সে, তার চল্লিশ পয়সার রেটে না দিয়ে, একটা আধুলি দেয়। প্রথম দিন আধুলি পেয়ে হীরু ফেরত দশ পয়সার জন্য এ-পকেট ও-পকেট হাতড়েছিল। সুকুমার হেসে বলেছিল, রাখ। এখন হীরু এই সওয়ারির কাছে থেকে, এমন-কি ঘোষেদের বাড়ির সকলের কাছ থেকে এক আধুলিই প্রাপ্য ব'লে ধ'রে নিয়েছে। কৌতুকের এই, সুকুমার হীরুকে দেয়ার জন্য এই আধুলি সংগ্রহে যত্ন নিয়ে থাকে। ট্রেনে চাপার আগেই, একটা আধুলি, এবং তাও চকচকে হ'তে হবে, তার মনিব্যাগে আছে কিনা দেখে নেয়। এটা রীতির কথা নয়। কেন সে তা করে তা নিজেও জানে না। দেখা যায়, সব দিক দিয়ে স্বাভাবিক মানুষের এমন একটা খেয়াল জন্মে যেতে পারে। যাই হোক, আধুলিটা নিয়ে যখন হীরু ডাম্বিকালীর মন্দিরের কাছাকাছি এসেছে, হঠাৎ সে বলতে শুরু করলে, "শালা একপুরুষে ভদ্রলোক, রিকসায় বসার কায়দা দেখ, পায়ের ওপরে পা তুলে যেন শালা ফাটন গাড়িতে চড়েছে, নয়তো আম্বাসাডরে।" হঠাৎ সেদিন শনিবারে কেন চ'টে গেল হীরু, তা অন্যান্য রিকসাওয়ালারা বুঝতে পারেনি। একজন বললে, "সব শালা সওয়ারির ওই এক কায়দা, রিকসাওয়ালাকে মানুষ মনে করে না।" যে বললে, সে নতুন গড়া রিকসা ইউনিয়ানের একজন মাঝারি কর্মকর্তা। সে আরও কিছু বলতে গেল, কিন্তু নিজের মনের মধ্যে সায় পেলে না। কৌতুকের এই যে হীরুও খানিকটা থতমত খেয়ে ভাবলে, আরে মজা, সে হঠাৎ চটল কেন ? সে বরং প্যাডলের দুপাশে পা দোলাতে-দোলাতে নিজের রিকসা রাখার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে থামল। আর তখনই তার চোখে পড়ল, নববিবাহিত এক দম্পতি কালীর মন্দিরে গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থায় ঢুকছে। সকলেই জানে ডাম্বিকালী বড়ই জাগ্রতা। তিনি অন্য অনেকের অনেক কিছু দেন, নববিবাহিতকে স্বামীসোহাগিনী এবং আশু সন্তানবতী করেন। হীরু ঘোষাল-বংশের ছেলে। সাধারণ রিকসাওয়ালা নয়। সে বললে, "মাইরি শ্লা, বাসর থেকেই পিল খাচছে, আর এদিকে এসেছে সন্তান চাইতে।"

সুকুমার সেই শনিবারে তার দিদি সুদেষ্ণাকে বললে, "ঘোষালডাঙার ঘোষালদের আভিজাত্য কিন্তু তারাশঙ্করের বই-এ যেমন লেখে অনেকটা সেরকম।"

সুকুমার তার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একটা বই-এর প্যাকেট বার ক'রে বললে, "তারাশঙ্করের খান কয়েক আনলুম, তোমার লাইব্রেরিতে ছিল না।"

সুদেষ্ণা হাতের সেলাই ঝুড়িতে রেখে উঠে দাঁড়াল, বললে, "সেজনাই অভিজাতদের কথা মনে হ'ল ?"

"তাই নয় ? ওদেরও নামের মধ্যে কিঙ্কর, শঙ্কর ইত্যাদি আছে, তন্ত্রমন্ত্রের কথা, কালীর সেবাইত হওয়ার কথা, লাল কেঠো, রুদ্রাক্ষের মালা, দেশী মদ, জোতদারি— এসবও আছে, অন্যদিকে ডোম-মেয়েদের নিয়ে কিছু-কিছু গোলমালও।"

সুদেষ্ণা বললে, "আছে নয়, ছিল। কিংবা বলতে পারিস, ওদের পারিবারিক

ইতিহাসে আছে। যেমন ঘোষালডাঙা নামটার মধ্যেই ঘোষালরা আছে। তুই মার কাছে যা। আমি চা নিয়ে যাচ্ছি।”

একতলার এই ঘরখানাকেই সুকুমার আর সুদেষ্ণা সবচাইতে পছন্দ করে। এই ঘরের পূর্ব আর পশ্চিম দেয়াল ঘেঁষে দুখানা খাট পাতা, ভাই-বোনের। দক্ষিণ দেয়ালে, খাট দুখানার শিয়র বরাবর, দুটি ফ্রেঞ্চ উইনডো। সেই জানলা দুটির ওপারে ফুলবাগান, এখন ফুল নেই বললেই হয়। স্থায়ী কয়েকটা গাছ, যেমন রঙ্গন, চাঁপা, কুটরাজে কিছু ফুল। সিজন ফ্লাওয়ারের বেড শুকনো ঘাসে ঢাকা, পরিত্যক্ত। উইনডো দুটোর বিপরীত দেয়ালের মাঝখানে ওয়াড্রোব। তার দুপাশে দুটো দরজা। ডানদিকেরটির পিছনে বাথ, বাঁয়েরটি দিয়ে ভিতরের করিডর থেকে এই ঘরে আসা যায়। পূর্ব দেয়ালের খাটের ওপারে একটা বড় চৌকোণ গ্রিল আর কাচের শার্সির জানলা। পশ্চিম দেয়ালের খাটের ওপারে পাশের ঘর, অর্থাৎ এখন যেটাকে লাইব্রেরি বলা হচ্ছে, সেখানে যাওয়ার দরজা। এ ঘরটা বেশ বড়, দুখানা দেয়ালঘেঁষা খাটের মাঝখানে একটা ছোট টেবিল বসেছে কয়েকটি চেয়ার সমেত—এতটা চওড়া ঘর। দেয়ালে ইলেকট্রিকের তার বসানো, সিলিং ল্যাম্প এবং দেয়ালগিরির ব্যবস্থাও আছে। তা সত্ত্বেও টেবিলের ওপরে একটা বেশ বড় আকারের ডবল ফিতের পিতলের টেবিল ল্যাম্প। চকচক করছে পিতল এবং ডোমের কাচ। এ-রকমটা আজকাল, এই ইলেকট্রিকের যুগে, সহসা চোখে পড়ে না। এখানে বলে নেয়া যায়, দেয়ালগুলোতে রং নেই, চূনে ধোয়া সাদা দরজা-জানলা, ওয়াড্রোব, টেবল, চেয়ার (খাট ছাড়া) যেখানে যত কাঠ, সব ঘন প্রায় কালো বার্নিশে ঢাকা। খাট দুখানা হালকা মেহগনি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গ্রিলদার জানলাটার কাচের একখানা শার্সিতে লম্বা কাগজের ফিতে দিয়ে ফাটল আটকানো।

সুকুমার বললে, “আমি সাড়ে পাঁচদিন পর-পর বাড়িতে খেতে আসি। বস্।” সে নিজের খাটে শুয়ে জুতো খুলতে মন দিল। বললে, “আমি যে সাইকেল-রিক্সায় রোজ আসি সেটা হীরু চালায়। হীরু কিন্তু ঘোষাল বংশের ছেলে।”

সুদেষ্ণা তার নিজের খাটে ব'সে কপালে নেমে-আসা চুল মাথার উপরে হাতের তেলো দিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, “তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।”

সুকুমার জুতো খুলতে মুখ বিকৃত করলে, বললে, “আমি ট্রেনে একটা গল্প শুনেছিলাম।”

সুদেষ্ণা বললে, “জুতোটা কি মাপে চাপা, না কি পায়ে কড়া পড়েছে ? সে কিরে, মোজা খুলতেও লাগছে পায়ে ?”

সুদেষ্ণা এগিয়ে এল, প্রথমে ঝুঁকে প'ড়ে, পরে সুকুমারের পায়ের পাতা নিজের দু-হাতে নিয়ে নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করলে, বললে, “এ-ধরনের জুতো তোর চলবে না।”

সুকুমার বললে, “এরকম জুতোই আজকাল চলছে। তাছাড়া মিলিয়ে দেখিস,

দাদাও এরকম জুতো পরে। চওড়া জুতো পরলে লোকে স্‌-প্লেফুটেড বলবে।"

"কিন্তু দেখিস, ঠাকুরদার জুতো কত চওড়া, বাবার জুতো কত চওড়া ছিল। দাদার পা এক্কেবারে মায়ের মতো, লক্ষ্মী-ঠাকরুনের পা। তোর পা বরং বাবার মতো। তোর মনে নেই, বাবা বলতেন কৃষকদের পা? চষা জমির দলদলে কাদায় চলতে ও-রকম পা লাগে। ট্রেনে কি গল্প শুনেছিলি?"

সুকুমার বললে, "পায়জামা-পাঞ্জাবি বার করে দে। আর বাবার সেই ফেল্টের চটি জোড়া দিবি? যেটা বাবা কড়া বাড়লে পরতেন।"

সুদেষ্ণা সুকুমারের মুখের দিকে চেয়ে রইল। খুব আস্তে-আস্তে শান্ত গলায় বললে, "তুই সত্যি পরবি সেই সবুজ ফেল্টের চটি?"

সুকুমারের হঠাৎ যেন মনে পড়ল। মনে তো ছিলই, এখন যেন কোনো কিছুর তলা থেকে ছবিটাকে উপরে তোলা হ'ল। দোতলার একেবারে পশ্চিমের ঘরটা বাবার ব্যবহৃত সবকিছু দিয়ে সাজানো। তাঁর বিছানা, তাঁর চশমা, তাঁর ঘড়ি, সিগারেট কেস, এমনকি তাঁর শেষ ব্যবহৃত মদের বোতলটা অর্ধেক তরল সমেত, যার পাশে ওয়াইন কাপ। সে-ঘরের ওয়াড্রোব খুললে, বাবার জামা-কাপড়, কোট, টাই, কয়েক জোড়া জুতো, লাঠি, ছাতা। শুধু এই ফেল্টের চটিজোড়া কি ক'রে বা এই নীচের সুকুমার-সুদেষ্ণার যৌথ ঘরের ওয়াড্রোবে রাখা। মনে হয়, সুদেষ্ণা যখন একা-একা থাকে এই ঘরে, আর সুকুমার পড়তে গিয়ে সপ্তাহে পাঁচদিনই থাকে না আজকাল, ঐ চটিজোড়া তাকে হয়তো সাহস দেয়।

না, দিদি কখনো বলে নি, ভাবলে সুকুমার, তবে আমি একা-একা থাকলে হয়তো সেরকম অনুভব করতেও পারতাম।

"ট্রেনের গল্পটা কি ছিল রে?" সুদেষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে।

"গ্রামের লোকের গল্প। আমাদের এই স্টেশনেই নামল তারা। ডম্বিকালীর কাছে মানসিক দিতে সেই কতদূর থেকে এসেছে। আমি জানতামই না, ডম্বিকালী কেন নাম। জানিস তুই?"

"ডম্বি মানে ডোমনি। এই নাকি একমাত্র কালী যেখানে ডোমদের থেকে এক মেয়ে পূজার ব্যাপারে হাত লাগাতে পারে। সাধারণত তো ডোমদের মন্দিরের প্রাঙ্গণেই উঠতে দেয়া হয় না।"

সুকুমার হেসে বললে, সেজন্যই তো বলছিলাম, যেন তারাশঙ্করের বই থেকে নেমে আসা। নাকি এটা বাহান্ন পীঠের এক পীঠ। কালীমায়ের বাম স্তন নাকি এখানে পড়েছিল। বাম স্তন নাকি অবিদ্যা। যেখানে ডান স্তন পড়েছে, সেখানে মানত করলে ভক্তি-ধর্ম-মোক্ষ লাভ হয়। আর এখানে এই অবিদ্যা স্তন থেকে এঞ্জিনিয়ারিং-ডাক্তারি-লেখাপড়া, টাকা-পয়সা, মামলায় জয়লাভ, এইসব হয়ে থাকে।"

সুদেষ্ণা বললে, "হাত-পা ধুলেই হবে? না স্নান করবি? লোকে বলে, থুত্থুড়ি

যে-বুড়ি মন্দিরের প্রাঙ্গণে ব'সে থাকে, সেই নাকি শেষ ডোমনি। বয়সের গাছপাথর নেই, গালের, কপালের ঝুলঝুলে চামড়ার মধ্যে দিয়ে যে-চোখ বেরিয়ে থাকে, তা দেখলে মানুষ ভয়ে পাথর হয়ে যায়। তা তোর তো ডম্বিকালীতে ভক্তি থাকা উচিত। বায়োকেমিস্ট্রি তো অবিদ্যাই।"

সুকুমার বললে, "এ-কালীর যে এত নামডাক তা কিন্তু জানতাম না।"

সুকুমার উঠে দাঁড়াল। সে বলেছে বটে, পায়জামা-পাঞ্জাবি বের করে দিতে, চটির কথাও বলেছে, কিন্তু সে জানে বাথরুমে তার পায়জামা, পাঞ্জাবি, চটি, গরম জল—এ সবই গুছিয়ে রেখেছে সুদেষ্ণা। ঘড়ি দেখে কাজ করে যায় সে, কখনো বে-মিছিল কিছু ঘটতে পারে না। শুধু এ-কাজটা কেন, সব কাজেই, বলা যায়, কখন সে যে কাজগুলো ক'রে চলেছে তা জানতেও পার না। আমি কাজ করছি, এরকম একটা ভঙ্গি দিদির চোখে-মুখে নড়াচড়ায় দেখতে পাবে না। হাতের আঙুল কিংবা পরনের শাড়ি দেখে ধরতে পার না, সে রান্না করছিল। মুখ দেখে বুঝতে পার না, সে খুব ক্লান্ত কিংবা একটা আঙুল তার এইমাত্র ছেঁচে গেল। ব্যস্ততাও নেই, যেন হাতে অঢেল অনন্ত সময়, অন্যদিকে কাজগুলো হয় ঘড়ির কাঁটায়। গতবারেই সুকুমার বলেছিল, 'আচ্ছা দিদি, করিস কখন কাজগুলো ? আমি দেখি বসে বসে গল্প করছিস আমার সঙ্গে, কিন্তু ঠিক বেলা এগারোটায় বলিস স্নানের জল গরম হয়েছে, স্নান করে আয়, রান্না হয়েছে, খেতে দেব।' উত্তরে সুদেষ্ণা বলেছিল, 'একই কথা। আমিও বুঝতেই পারি না, কখন তুই দেড় দিনের মধ্যে সাড়ে পাঁচদিনের ধুলো, ঝুল, ঝরা পাতা লাইব্রেরি থেকে, শোবার ঘরগুলোর জানলা থেকে, বাবার ঘর, দাদার ঘরের সবকিছু থেকে সরিয়ে দিলি ! পিয়ানোটার ডালা খুলতে গিয়ে কাল ভাবলাম, এতটুকু ধুলো নেই, আশ্চর্য।'

সুদেষ্ণা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবলে, দাদা বলে, কালীমন্দিরটাই ঘোষালদের লক্ষ্মীর ঝাঁপি। আদি ঘোষাল নাকি ছিল ডোমদের পুরোহিত। তাকে নাকি ডোমরা ধ'রে এনে কালীপূজা ক'রে দিতে বাধ্য করেছিল। আর এই ডোমরা ছিল আগাডোম। নবাবদের, জমিদারদের অকাসিলিয়ারী বাহিনী। মাহিনা দিতে হ'ত না। যুদ্ধ মানেই তো লুট। লুটের বখরা টাকা-পয়সা, সোনার দানা, স্ত্রীলোক, বাসনকোসন। তা সে যুদ্ধ দেশপ্রেমেরই হোক আর সাম্রাজ্যবিস্তারেরই হোক।

তারপর যা হয়, মন্দিরে ভেট পড়ে, তাতেও টাকা হয়। সেই টাকায় তেজারতি হয়, তা থেকে ক্রমশ দু-একটা মৌজা কিনে জমিদারির পত্তন। এসব বংশে যেমন হতে পারে, শুধু তুলসী দুর্বা গঙ্গাজলে পূজা হয় না। পূজার সময়ে দিশি মদ চলে কারণ হিসাবে, পূজার পরে নিজের ঘরে বিলেতি মদ চলে জমিদারির আভিজাত্য বজায় রাখতে। তারপর শরিকে-শরিকে জমিদারি ভাগ হ'য়ে ছোট হ'তে থাকে, ঋণের দায়ে কোনো-কোনো শরিকের এ-মৌজা সে-মৌজা বিকিয়ে যায়, আর্মেনি মদওয়ালাকে ঠেকাতে কেউ-বা দামি আসবাব, সোনাদানাও বিক্রি করে। আভিজাত্য

না ক'মে বাড়তে থাকে যেন। ওদের মধ্যে কেউ তান্ত্রিক হবে, সে বেশি কথা নয়। ঘোষালডাঙার প্রান্তে নদীর ধারে, শ্মশানে কোনো কোনো ঘোষাল বিশ-পঁচিশ বছরে দু-একবার কিছুদিন ধ'রে শবসাধনায় বসে। নাকি সিদ্ধ হয়। দেখতে-দেখতে তাদের কালীর নামও নতুন করে ছড়িয়ে পড়ে। পূজায় রক্তের প্রবাহ বাড়তে থাকে আবার। প্রণামী বাড়ে সেই অনুপাতে। শবসাধনাটার প্রচার ভালো হ'য়ে থাকলে কালীর জন্য সোনা-রূপা, রেশম আসতে থাকে। এতে অধিকাংশ ঘোষালেরই লাভ। কারণ, ভূসম্পত্তি প্রতি দশকে একবার ক'রে বিভক্ত হ'লেও, কালীপূজার প্রণামীতে যে ঘোষাল যেখানে আছে, দায়ভাগ রীতি অনুসারে খাড়া করা এক রীতিতে, তাদের সকলেরই নাকি ভাগ আছে। কারো বছরে একদিন, অর্থাৎ তিনশ চৌষট্টি ভাগের এক ভাগ, কারো বা দশদিন, কারো ত্রিশদিন। সুদেষ্ণা হাসল, দাদা এমন খবর রাখে!

সুকুমার স্নানের ঘরে ভাবলে, দেখো কি পরিপাটি ক'রে গোছান সাবান, তোয়ালে, জামা, পায়জামা, চটি, এমনকি মৃদু ক'রে রাখা স্টোভে এই গরম জল। সবই সুদেষ্ণার কাজ, কাজ নয় শুধু, চিন্তাও। অবশ্য এটা এমনই হ'তে হবে, এমনই হতে হবে। দুজন চাকর এবং দুজন ঝি থেকে কমতে কমতে এখন একজন ঝি-তে দাঁড়িয়েছে কাজের লোক। গত তিন-চার বছরে তাদের কমিয়ে দিয়েছে সুদেষ্ণা যেন সইয়ে সইয়ে। এখন এ-বাড়িতে চাকর বলতে সেই নেপালি তিনজন। দাদা কিন্তু বলে, ওরা চাকর নয়। কারণ তারা মাস-মাহিনায় দাদার ধানক্ষেতে কাজ করে। আর লক্ষণীয়, ধানক্ষেতে লাঙ্গল দিচ্ছে, রোয়া বুনছে, তখনও কোমরে কুকরি বাঁধা থাকেই। এখনও।

সুদেষ্ণা পরোটা কয়েকখানা তাওয়ায় উল্টে দিতে দিতে ভাবলে, সুকুমার বলছে, তারাশঙ্করের বই থেকে নেমে আসা আভিজাত্য। কোন বই থেকে নেমে আসা কিছু বলতে অবাস্তব কিছুকে বোঝায় না? অবশ্য এক্ষেত্রে ঘোষালডাঙা নামটা আছে, কালীমন্দিরটা আছে, তার কাছাকাছি প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে একটা বস্তি গড়ে উঠেছে, যার বাসিন্দা হয় ঘোষাল, নয়তো ঘোষালদের দৌহিত্র বংশের কেউ। কোনো কোনো ঘোষাল পরিবার অবশ্য কিছু দূরে দূরে নিজেদের ছোট ছোট বাড়ি ক'রে নিয়ে বাস করে। এখন, কিন্তু, শহরে এমনকি ঘোষালডাঙাতেও, ঘোষাল ব'লে কোন বিশেষ সম্মান কেউ পায় না। যদিও, হয়তো, মনে মনে তারা নিজেরা নিজেদের অন্য রকম ভাবে।

হিবু রিকসাওয়ালা, যে একজন ঘোষালও বটে, যেমন বলেছিল, ঘোষদের আভিজাত্য এক পুরুষেরই বটে। তাদের যা প্রভাব-প্রতিপত্তি তার সূচনা মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে। ঘোষপাড়া নামটার বয়স ত্রিশ বছর হয়েছে কিনা সন্দেহ। এখন যাকে ঘোষপাড়া বলা হয়, তা তো ঘোষালডাঙারই একটা অংশ ছিল। ঘোষালডাঙার সেই অংশ যা বরং শ্মশানের ধার ঘেঁষা আর ধান আর আখ চাষের জমি ছিল, বনবাদাড়

ছিল। এমনকি ঘোষ বংশের প্রতিষ্ঠাতা, সুরেন ঘোষ মশায়, অদ্যাবধি জীবিত। আভিজাত্য বলবে ? তা যদি বলো, সুরেন ঘোষ মশায়ের পুত্র-পৌত্রাদি সম্বন্ধে বলতে পার. কারণ রুপোর চামচ যদি মুখে লেগে থাকে, তবে সে তাদের, সুরেন ঘোষ মশায় নিজে নিতান্ত মধ্যবিত্ত ছিল।

পুলিসের চাকরি করতো সুরেন ঘোষ। বোধহয় এ. এস. আই. হবে। তেমন বড় কিছু নয়। এখন, সব সময়েই দেশের বড় মানুষেরা উপদেশ দিয়ে. বক্তৃতা দিয়ে কি করা উচিত, না উচিত বলে থাকেন। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, আচার্য পি. সি. রায় একই সঙ্গে জীবিত। কোনো কোনো মানুষ থাকে যারা বড় মানুষদের কথা প্রায় আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস ক'রে বসে। সুরেন ঘোষ একই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ রাখতে চাকরি ছেড়ে দিলে, আর আচার্য পি. সি. রায়ের কথা রাখতে গ্রামের দিকে কৃষিকর্মের দিকে চ'লে এল। শুধু কৃষিকর্ম নয়, তখনকার দিনে ভদ্র হিন্দুর পক্ষে যা অকল্পনীয়, যাকে কশাই-এর কাজ বল্‌তো লোকে, এখন যাকে পোলট্রি, অ্যানিম্যাল হাসব্যাণ্ড্রি বলে, সেসব কাজেও লেগে গেল সুরেন ঘোষ। লোকে বলে. এবং সুরেন ঘোষকে জিজ্ঞাসা করলে সে নিজেও বলবে, তখন সুরেন ঘোষ নিজে থাক্‌তো খড়ের চারচালায়, মেঝেটা যা হোক সিমেণ্ট-করা. কিন্তু তার হাঁস-মুরগীর খাঁচা, ছাগল-ভেড়ার,গোরু-ঘোড়ার আশ্রয় দেখে মনে হতো, বিলেতি ছবি দেখছি। লোহা, কাঠ. তারের জাল, কাচ, সিমেণ্ট, একেবারে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত। তারপর চাষের জমি বাড়তে লাগলো। এক সময়ে দেখা গেল, তা বছর দশেকের মধ্যেই, যে তার গোড়াকার দশ একর জমি বেড়ে বেড়ে দু'শ একরে দাঁড়িয়েছে, তার মধ্যে ঘোষালডাঙাতেই প্রায় একশ' একর। তার চাষ কখনও নিষ্ফল হতো না। তার পোল্‌ট্রিতে মড়ক মাত্র একবার লাগতেই, সে শহর থেকে সরকারী ভেটারিন্যারিকে আনিয়ে সামলে নিয়েছিল। কিন্তু শুধু এই নয়, সে জানতো, ব্যবসা-বাণিজ্য • শেষ পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যই. খয়রাতি নয়, দান-ধ্যান নয়। সে মর্টগেজের আইন সম্বন্ধে, সুদের হার সম্বন্ধে ভালো খবর রাখতো কারণ. ব্যাঙ্ক থেকে তাকে কখনো কখনো ঋণ সংগ্রহ করতে হতো। সুতরাং সে ঋণ দিত। জমি, বাড়ি, সোনা বন্ধক রাখতো। এবং ব্যাঙ্ক যেমন দেনাদারের কান্নাকাটিতে রেয়াত করে না, সে-ও রেয়াত করতো না। এবং সে-সময়ের আইন অনুসারে সে ঋণ দেয়ার জন্য লাইসেন্সও ক'রে নিয়েছিল। শেষের দিকে কান্নাকাটি এড়ানোর জন্য সে নিজের প্রজাবর্গের মধ্যে ঋণ দেয়া বন্ধ করেছিল। এবং পাঁচশ টাকার কমের ঋণপত্র লিখতো না। বলতো, সে রকম ক্ষেত্রে, পার্টি যদি সত্যিকারের দয়ার যোগ্য হয়, তাকে দান করা ভালো।

সে যাই হোক, সুরেন ঘোষকে অভিজাত বলা যাক, আর নাই যাক, (আজকালকার চলতি ভাষার ভুল প্রয়োগ হিসাবে তাকে কুলাক বলা যায় হয়তো) এদিকে আসার বছর দশেক পরে, যখন সে দুশ' একরের মালিক, তখন দুটো ঘটনা

ঘটলো। ঘোষালডাঙার ঘোষালেরা এক দারুন আঘাত পেল, পরে, অবশ্য, যার ফলে তাদের কিছু সুবিধাও হয়েছিল। আর সুরেন ঘোষ, বলা-কওয়া নেই, সাতদিনের জন্য অনুপস্থিত থেকে, তার সেই চল্লিশ বছর বয়সে সতের বছরের এক সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এল।

এ মেয়েটি আসবার পর থেকে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। দেখা গেল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষবাড়ির ভিত গড়া হ'ল। দেখ দেখ ক'রে একতলার একাংশ বাসযোগ্য ক'রে সেই বাড়িতে উঠে এল সুরেন ঘোষ, তার সেই প্রায় কিশোরী হাল্কা ছিপছিপে সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে। কলকাতায় যে রিকসাগুলো মানুষ টানে, তেমন একটাকে নিয়ে এসে, তাতে নিজের খামার থেকে যোগাড় করা একটা পনি জুতে, মৃদুমন্দ গতিতে সে ফ্লাই চালিয়ে শহরে যেতে শুরু করলো সাইকেল বর্জন ক'রে। কোন-কোনদিন তার পাশে চোখে কাজল, পিঠে জরি-মোড়া বেণী, গলায় জড়োয়া, তার স্ত্রী থাকতো। এই চোখের কাজলের আর জরিমোড়া বেণীর অন্য এক ব্যবহারও ছিল। মহাত্মা গান্ধীর একটা উপদেশ সে মানতে পারেনি ঃ রাত্রিতে দু-এক গ্লাস পোর্ট সে খেতো। এটা কবে থেকে শুরু তা বলার উপায় নেই। নতুন বাড়িটার শোবার ঘরে (এখন সেটাই সুকুমার ও সুদেষ্ণার ঘর), সুরেন ঘোষ নিচু সোফাটায় বসতো, সন্ধ্যাতে রাত্রির আহার শেষ হ'লে তার হাতে থাকতো রুপোর সাচ্চা জরিতে মোড়া নল-গড়গড়া, আর তাওয়াদার কল্কিও রুপোর এবং কামদার। ঘরের একপাশে বাঁকা বাঁকা পায়ের ড্রেসিং টেবল, (এখন সেটা দোতলার পশ্চিমপ্রান্তে সুদেষ্ণার ঠাকুমার ঘরে বিরাজ করে), তার সামনে ব'সে তার সেই সপ্তদশী স্ত্রী প্রসাধন করতো—বেণী বাঁধতো। এক মুহূর্তের জন্য পাশের ঘরে গিয়ে স্বচ্ছ টিসু বেনারসী গায়ে জড়িয়ে ফিরে আসতো সুরেন ঘোষের সামনে। ফ্লাস্ক থেকে ওয়াইন কাপে পোর্ট ঢেলে স্বামীকে দিত। তখন তার বড় বড় চোখে কাজল থাকতো, গাল লজ্জায় আপেল, সোনার জরিতে জড়ানো সাপদৃশ বেণী নিতম্ব ছাড়িয়ে দুলতো। লোকে বলে, এহেন সজ্জায়, এহেন আবরণে, তেমন উজ্জ্বল আলোয়, স্বামীর সামনে আসতে খুব আপত্তি করতো প্রথম দিকে সেই সপ্তদশী। অথচ তা না হ'লেও, সুরেন ঘোষের সেই নিচু নিচু ইংরেজি সোফা, সেই গড়গড়া, আর দামি পোর্ট মদের কি সার্থকতা ? সুতরাং সেই সপ্তদশী নিজে কখনও পোর্ট না খেয়েও তেমনভাবে পোর্ট পরিবেশন করত। অবশ্য সেই সপ্তদশী পঁচিশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুবার জননী হয়। প্রথমটি পুত্র। দ্বিতীয়া কন্যা। এখনও সুরেন ঘোষ তার প্রচুর বার্ধক্য নিয়ে একতলার পশ্চিমের ঘরে বিরাজ করছে।

পরবর্তী বিশ বছরে সুরেন ঘোষের বৃদ্ধি হয়েছিল। ঘোষালডাঙার বাবুরা সেই দারুণ আঘাত পাওয়ার পরে, যাতে তাদের শেষ পর্যন্ত লাভ হয়েছিল, যার কথা পরে আসছে, সুরেন, স্ত্রীকে গৃহে আনার কিছুদিন পরেই, ঘোষালবাবুর এক মৌজা হাতে পাওয়ার দরুন জমিদার খ্যাতি পেয়েছিল। ফলে স্ত্রীর জন্য সে যে বাড়ি তৈরি

করেছিল তাকে পূর্বপরিকল্পনা না বদলেও জমিদারের উপযুক্ত করে তুললো, গাড়িবারান্দা, মোটা মোটা থাম, বড় বড় ফ্রেঞ্চ উইনডো বসিয়ে। এই বিশ বছরের শেষ দিকে আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। তার পুত্রের তখন বছর আঠার বয়স। সুরেন শুনেছিল, এক সময়ে ঘোষালডাঙায় রেশমের উৎপাদন ছিল। বৃদ্ধ কৃষকদের কেউ কেউ তুঁত, রেশমপলু, রেশমের চরকা ইত্যাদির খবর রাখত। সুরেন ঘোষ, বলা নেই, কওয়া নেই, তুঁত চাষের জন্য দাদন দিয়ে বসলো। বছর ফিরতে মালদহ-মুর্শিদাবাদ থেকে দশজন রেশম-তাঁতি আর তাঁত আমদানি করে বসলো। একটা নতুন বৃত্তি দেখা দিল ঘোষপাড়া আর ঘোষালডাঙার। কিন্তু দু-বছরের মাথায় ততদিনে কয়েক থান রেশমই মাত্র উৎপাদন হয়েছে, একদিন তাঁতিরা, সুতো কাটনে-ওয়ালারা, বিশ-ত্রিশজন এক হয়ে, চলবে না চলবে না' ব'লে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। একমাস কাজ বন্ধ, দু-মাস কাজ বন্ধ। শহরের সেই বাবু দুজন, যারা তাঁতিদের জুলুসের আগে আগে আকাশকে কিলিয়ে কিলিয়ে চেঁচাতো, তারা দেখা করতে চাইলে, সুরেনের দারোয়ান দুজন তাঁদের হাকিয়ে দিলে। তখন ইংরাজ আমল, ঘেরাও চলতে শুরু করেনি। সরকার পক্ষের এক ছোট হাকিম, তা সত্ত্বেও, এসে উপদেশ দিয়েছিল : ল অ্যাণ্ড অর্ডারের প্রশ্ন হ'তে চলেছে, একটু নরম হ'য়ে কিছু দিন ওদের। সুরেন ঘোষ একটা কাজই করেছিল। এক রাতে দেখা গেল, সেই তাঁতের বাড়ি, তাঁত, নলি, চরকা, মাকু, আধবোনা টানা সমেত দাউ দাউ ক'রে জ্বলে শেষ হ'ল। আর সুরেন ঘোষ তার বাড়ির ছাদে, তখন দোতলা ওঠেনি, প্যারাপেটে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে স্ত্রী, ছেলেকে নিয়ে সে মজার দৃশ্য উপভোগ করলে। ছেলের তখন বছর আঠার বয়স, তা আগে বলা হয়েছে। তাকে সুরেন ঘোষ বোঝালে, 'হাজার চল্লিশ পুড়লো।' 'ইনসিওর করা আছে তো ?' 'রাম কহ, সেই টাকাই যদি নেবে, পুড়িয়ে সুখ কি ?' ঘোষালডাঙা থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য রেশম উঠে গেল।

তখন থেকেই দোতলা উঠতে শুরু করলো। আগে একতলা বাড়িটাকে সদরের পুলিস সাহেবের ইংরেজি বাংলোর মতো দেখাতো, এবার দোতলা যুক্ত হ'য়ে ইংরেজি কলোনিয়াল ম্যানশনের রূপ নিলে। দু-বছর লাগলো দোতলা শেষ করতে, আর তার উপযুক্ত নতুন আসবাব বানিয়ে নিতে। আর তারপর থেকে দ্বিতীয় পুরুষের সেই ক্ষণস্থায়ী যুগ শুরু হল। কুড়ি বছরে মাথা থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত র‍্যাঙ্কিনের পোশাকে মোড়া সুরঞ্জন শহরের জিমখানায় বিলিয়ার্ড খেলে তখন। প্ল্যাণ্টার বলে নিজেকে, কুড়ি বছরেই কুড়ি বছরের রূপসী বিদুষী, পিয়ানো-দক্ষা স্ত্রীকে, যৌতুকে পাওয়া মোটরে নিয়ে বাড়িতে এল সুরঞ্জন। হাঁটু সমান উঁচু বুট, খাকি গ্যাবার্ডিনের ওভারঅল প'রে, হাতে রবারের দস্তানা প'রে, মোটা বেতের ডগায় লোহা বাঁধানো লাঠি বগলে, সে তাদের দু-তিন-শ' একর খাস জমিতে আখ, ধান এমন কি পাট চাষের তদারক করতো, পোলট্রিতে পাকাপাকি একজন ভেটকে রাখার বন্দোবস্ত

করা উচিত কি না ভাবতো, শহরের এক্কার জন্য ছোট জাতের ঘোড়া চাষের চাইতে সত্যিকারের পনি চাষ ভালো কি না ভাবতো। তার স্ত্রী ব্যারিস্টারের মেয়ে। তার চোখে তেজারতি ভালো না লাগায়, সুরঞ্জন সুরেনকে বলে শহরের প্রান্তে, বরং ঘোষালডাঙা ঘেঁষে, লোন অফিস নামে এক ব্যাঙ্কের পত্তন ক'রে তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হ'ল। এবং সেই ব্যাঙ্ক সুরেনের তমসুকি দলিলগুলোকে অনেক কিনে নেয়াতে, সুরেনের তেজারতি ব্যবসার খাতকরা ব্যাঙ্কের দেনদার হ'ল। একুশ বছরে সুরঞ্জন সাহেব তার একুশ বছরের স্ত্রীকে নিয়ে দোতলার লিভিং রুমে ব'সে লিকার সিপ করতে করতে কুশিদজীবী থেকে ব্যাঙ্কার হওয়ার পার্থক্য আলোচনা করলে, এবং আলোচনা শেষে দ্বিতীয় মোটরগাড়ি কেনার কথা ঠিক ক'রে ফেললো।

এ যুগ বিশ বছরের বেশি স্থায়ী হয় নি। এ যুগের নতুনত্ব ছিল, দু'খানা বিলেতি গাড়ি আসা সেই পনিতে টানা রিক্সার বদলে, ঘোষপাড়ায় ইলেকট্রিসিটি না আসায় নিজেদের ডায়নামো স্থাপন, এবং জলসেচের জন্য পাম্প ব্যবস্থা। তেজারতি ব্যবসার নিন্দনীয়তাকে পরিহার করতে ব্যাঙ্কার হওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু বোধহয় লিকারে পোর্টের তুলনায় ক্ষতিকর কিছু থাকে, হয়তো আনগণ্টুরার সঙ্গে সঙ্গে আঁবসাতে এবং ভার্মুথও এসে যায়। ঘোষালদের কেউ কেউ বলে, ব্যারিস্টারের মেয়ের যা সইতো ঘোষের পো-র তা সহ্য হ'ল না। অন্য কেউ বলে, রাতে লিকার চললে সন্ধ্যায় জিমখানায় হুইস্কি আসবেই। মোট কথা বেয়াল্লিশেই সুরঞ্জনের মৃত্যু হ'ল।

যুগটা শেষ হওয়ার আগেই জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হ'ল। সুরঞ্জন তখন কলকাতায়। রোগ শয্যাতেই। সে বলেছিল কমপেনসেশনের টাকায় কিছু হবে না। এখন, বোধহয়, খাস জমির উপরেও হাত দেবে। ব্যাঙ্ক আর ইণ্ডাস্ট্রিতে যাওয়া দরকার। কারণ, যারা আইন করছে, তারা ব্যাঙ্ক আর ইণ্ডাস্ট্রি আর শহরের সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগকরনেওয়ালা। তার ব্যারিস্টার শ্বশুর এ বিষয়ে একমত ছিল তার সঙ্গে। বোধহয় আশি উত্তীর্ণ সুরেন, যার হাতে আবার ঘোষপাড়ার ভার ফিরলো, তার প্রসার প্রবৃত্তি খর্ব হ'য়ে এসেছিল। বাজারে দাম কমার আগে সে তার দু-তিনশ' একর খাস জমির প্রান্তভাগ বিক্রি করতে শুরু করলে চড়া দামে।

এখন আবার ঘোষপাড়া সেই সুরেনের হাতেই। দেখাই যাচ্ছে এই আভিজাত্য এক পুরুষের, যেখানে আরম্ভ সেখানেই ফিরে এসেছে। তাদের সেই খাস জমির প্রান্তভাগ বিক্রি ক'রে ক'রে যখন একশ' একরের কাছাকাছি, তখন আবার খবর পাওয়া গেল এক শ' একরও থাকবে না। সুতরাং সেই এক শ' একর বসতবাটি, বাগান, পোলট্রিফার্ম এবং খাস জমিতে বিভক্ত ক'রে পৌত্র ও পৌত্রীর নামে লিখে দিয়ে, এবং হাইকোর্টে ইনজাংশন জারি ক'রে ক'রে, ঘোষপাড়ার আভিজাত্য এখন ধুঁকছে। সুরঞ্জনের মৃত্যুর পরে তার পুত্র, সুদেষ্ণা-সুকুমারের দাদা, সুরথ তাঁর নামে লিখে দেয়া ত্রিশ একর জমি চাষের তদারক করতো নিজে, সেখানে কাঠ আর

টনে ছোট বাংলো করেছিল, একটা রাইফেল আর একটা কুকুর নিয়ে কখনো রাত কাটাতো। সুদেষ্ণা-সুকুমারের নামে লেখা পোলট্রিফার্ম ও জমির তদারকও করতো, তবে সেটা তারা অল্প বয়স্ক বলে। বোঝাই যাচ্ছে, জমি খাস করার আইনকে নাজেহাল করার জন্যই এসব। ইতিমধ্যে খরচ কমাতে তারা মোটরগাড়ি দুটোকে গ্যারাজে ভ'রে ফেলেছিল। সাইকেল চড়তো সুরথ আর সুকুমার। পুরনো পনির বদলে নতুন পনি জুতে সেই পুরনো রিকসা-গাড়ি, কিছু দিনের মধ্যে রিকসা আর পনি দুই-ই আবার বদলেছিল, চলতে শুরু করলো। নব্বুই বছরের বুড়ো সুরেনকে পাশে নিয়ে কখনো, কখনো সুদেষ্ণা একাই শহরে যায় এখন সেই ফ্লাইতে।

সুরথের কাল বছর পাঁচেক চলেছিল, যদিও তাকে পৃথক যুগ বলা যায় না। সে তার বাবার গ্যাবার্ডিনের ওভারঅল এবং দস্তানা ব্যবহার করার মতো বড় হয়েছিল। এবং জমিতে আয় আগের চাইতে কমল না তার হাতে। কিন্তু তৃতীয় বৎসরেই গোলমাল লেগে গেল চাষীদের দিনমজুরি নিয়ে। সুরথ ব'লে বসলে, যারা আইন করছে তারা শহরের লোক। জমির ইনপুট প্রোডাক্‌টিভিটি সম্বন্ধে নিরেট। ওসব আইনে ভোট পাওয়া যায়, জমি রাখা যায় না। ওদিকে কিছুদিনেই, ঘোষ পাড়ার বাবু মানলে, আর সব শালাকেই মানতে হবে, কাজেই তাকে দিয়ে মানিয়ে নেবার জন্য মিছিল-জুলুস, বয়কট চলতে লাগলো। এক সাল তার জমি পড়ে পড়ে রইল। হঠাৎ সে ঘোষপাড়া থেকে উধাও হ'ল। মাস চারেক পরে ফিরলো চারজন চাষী নিয়ে। নেপালে তারা ধান বুনতো, গরু মোষ চরাতো। তারা কোমরে কুকরি বেঁধে, খালি গায়ে, হাফ প্যাণ্ট প'রে সুরথের জমিতে চাষ দিতে শুরু করলো! তারা বছর ধ'রে দেড় শ' টাকা মাস মাহিনায় খুশি। এত শত্রুতা কি করতে হয়? এক সকালে সুরথকে তার জমির উপরে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া গেল।

বাথরুম থেকে অবেলায় একেবারে স্নান ক'রে ফিরলো সুকুমার। তার মনে হয়েছিল বাথরুমের সব বন্দোবস্ত যেন দিদির স্নেহের স্পর্শে। দরজা পর্যন্ত আসতে আসতেই সে চিৎকার ক'রে বললে, "এ ঘরেই খেতে দে দিদি। তারপর যাব দোতলায়।" তার চিৎকার শুনে একটা কুকুর ডেকে উঠল। আনন্দের উত্তেনায় সে ডাক। আর সেই দারুণ ভারি গলার ডাক থেকে অনুমান হয়, অন্তত সাধারণ টেবলের সমান উঁচু মণ দুয়েক ওজনের কোনো জানোয়ার সেটা।

সুদেষ্ণা ঘরে এল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্রেট ডেন, সুরথের নিত্যসঙ্গী সেই কুকুর। সুদেষ্ণা ফ্রেঞ্চ উইনডো দুটোকে বন্ধ করলে। ইলেকট্রিক নেই, ডায়নামো উঠে গেছে গুদামে। সুতরাং বড় পিতলের টেবল ল্যাম্পটা জ্বাললে সে। আবার গিয়ে দুজনের খাবার নিয়ে এল। আলোটার দু-পাশে খেতে বসলো তারা আর গ্রেট ডেনটা টেবলের উপরে তার নাক তুলে আনতে লাগলো তাদের প্লেটগুলোর কাছাকাছি।

আলোটা উজ্জ্বল। পিতলটায় ব্র্যাসো লেগে, তা সোনার মতো। তার গায়ে নীল

মনোগ্রাম। ঘোষালদের বাড়ির, তার প্রমাণ। মনোগ্রামটায় জি এই ইংরেজি অক্ষর থাকায় ঘোষদেরও মানিয়ে গিয়েছে। সুদেষ্ণা বললে, "ঘোষালদের কালীর কি গল্প শুনেছিস তা বল।" কিন্তু সুকুমার গল্প বলে সাধ্য কি? তার গল্পের চরিত্রগুলোর চাইতে প্রবল হয়ে উঠল সেই গ্রেট ডেন। টেবলের উপরে মুখ তুলে দিচ্ছে, সুকুমারের হাত চেটে দিচ্ছে, সুকুমারের কোলে মাথা রাখছে, তার কোলে সামনের দু-পা রেখে কাঁধে মাথা রাখছে, আর যেন কত বাচ্চা সেই ধেড়ে কুকুর, তা দেখাতে ল্যাজ দোলাচ্ছে। শব্দেরই কি শেষ আছে তার গলার? কুঁই কুঁই থেকে শুরু ক'রে পেটা ঘড়ির ঘং ঘং শব্দ পর্যন্ত। সুদেষ্ণা ডাকলে, তার কাছে গিয়ে তাকে কিছু বলে যেন, সুকুমারের কাছেই ফিরে আসছে। অগত্যা সুদেষ্ণাকে উঠে গিয়ে প্লেটে করে দু-একখানা ডগবিস্কুট এনে রাখতে হ'ল মেঝেতে।

তখন সুকুমার বললে, "এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে নাকি নরবলি হয়েছিল ডম্বিকালীর সামনে। আর তাতেই নাকি প্রকৃতপক্ষে সে কালী জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। তার আগে ঘোষালদের কোনো কোনো কর্তা শ্মশানে শবের উপরে ব'সে সাধনা করতো বটে। কিন্তু এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ত্রিশ সালের কাছাকাছি সময়ে এক তান্ত্রিক ঘোষাল নাকি নরবলি দিয়েছিল। সাংঘাতিক কথা নয়? বনে-জঙ্গলে নয়, শহরের প্রান্তে, প্রায় মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে।"

সুদেষ্ণা বললে, "গল্পটাকে গল্প বলে উড়িয়ে দেয়া যেতো, যদি না সেই ঘোষালকর্তার নরহত্যার দায়ে ফাঁসি হতো।

সুকুমার শিউরে উঠল। বললে, "তন্ত্রটন্ত্রকে আমি এতদিন ভণ্ডামি আর গাঁজাখুড়ি মনে করতাম।"

সুদেষ্ণা গল্পটা বললে। এক ঝড়-বৃষ্টির সন্ধ্যায় এক নতুন দম্পতি মন্দিরে আসে প্রণাম করতে। দারুন ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। তাদের সঙ্গে দু-একজন ছিল, তারা তাদের মন্দিরে রেখে ছাতা আর আলো, যোগাড় করতে নিজেদের গ্রামে চ'লে যায়। তাদের ফিরে আসতে তিন-চার ঘণ্টা দেরি হ'য়ে যায়। তারা ফিরে এসে দেখে মন্দিরের দরজা বন্ধ। নবদম্পতি উধাও। তারা আবার গ্রামে ফিরে গিয়েছিল এই ধারণায় নবদম্পতি গ্রামে ফিরে থাকবে। পরদিন সকাল থেকে খোঁজ আরম্ভ হ'ল আবার কোথাও তাদের পাওয়া যায় না। আর একটা ব্যাপার ঘটল যে মন্দির-দ্বার সব সময়ে খোলা থাকে, তাতে তালা বন্ধ। চার-পাঁচ দিনে অনেক লোক এই অদ্ভুত ব্যাপারের সাক্ষী হয়েছিল। ঘোষালদের অন্য শরিকদের মধ্যে কানাকানি উঠল। অবশেষে সেই করালীকিংকরের স্ত্রী বললে, কর্তা শ্মশানে আছেন। এদিকে এক রাখাল খবর দিল, নদীর ধারের জঙ্গলে মুণ্ডু কাটা একটা মরার উপরে সে কর্তাকে ব'সে থাকতে দেখেছে। তাতেও হয়তো কিছু হতো না। সেই জঙ্গলে জেলেদের বহুদিনের পরিত্যক্ত এক কুঁড়ে থেকে কান্নার শব্দে আকৃষ্ট হ'য়ে এক কাঠকুড়ানি দড়িতে হাত-বাঁধা এক উলঙ্গ-প্রায় যুবতীকে দেখতে পেলে। আর ঘোষালের শরিকরা পূজা বন্ধে

অকল্যাণ হবে ব'লে, ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম নিয়ে তালা ভাঙলে মন্দিরের। রক্ত-পচা গন্ধ দরজার কাছেই পাওয়া যাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে ফুলের রাশির তলে মানুষের অর্ধগলিত মুণ্ড পাওয়া গেল, মেঝেতে শুকনো জমাট রক্ত, দেয়ালে হেলিয়ে রাখা খাঁড়ায় মানুষের চুল।

সুকুমারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। 'তারপর?' এই প্রশ্ন ছাড়া আর কোনো মন্তব্য সে করতে পারলে না।

সুদেষ্ণা বললে, "লোকে বলে, যে-ডোমনি বুড়ি ব'সে থাকে মন্দিরের প্রাঙ্গণে, যাকে আজকাল লোকে প্রায় পূজাই করে. সেই সে দম্পতির একজন। দু-তিন বছর সে পাগলের মতো হ'য়ে গিয়েছিল। কিছু মনে করতে পারতো না। এখনও তার ধারণা, তার স্বামী মন্দিরের ভিতরে আছে। ফাঁসি হয়েছিল করালীকিংকরের। কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার এনে লড়েছিল তার ছেলে-বউ। সে-সময়েই মৌজাটা আমাদের কাছে বন্ধক, পরে বিক্রি করেছিল। ফাঁসির হুকুম হ'লে সে নাকি জজকে বলেছিল, "ধ্বংস হবি তোরা, বিশ বছরের মধ্যে তোদের সাম্রাজ্য যাবে।" সুদেষ্ণা হাসলো। বললে, "তা বিশ বছর লাগেনি। সাতচল্লিশের মাঝামাঝি ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল।"

"দিদি, তুই হাসতে পারছিস?"

"তুই খোঁজ করে দেখিস, ভক্তরা বলে, এটাও স্বাধীনতা পাওয়ার একটা কারণ, সেই অভিসম্পাত। আর তাছাড়া. সেই যে মৌজাটা ওদের বিক্রি হয়েছিল, আর ঠাকুরদা যা কিনেছিলেন. তার আয় ছিল হাজার দশেক। এখন শুনি ডম্বিকালীর দরুন আয় গড়ে বছরে হাজার চল্লিশ।"

"লাভই হয়েছে তাহ'লে ঘোষালদের সেই নরহত্যায়।"

"তা বলতে পারিস. কোনো কোনো শরিক এখনও অভিজাত ঢং বজায় রাখতে পারছে। তবে আগে নিজেরা পূজা করতো না, দু-একজন যারা তান্ত্রিক হয়ে যেতো তারা ছাড়া। এখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পালা অনুযায়ী নিজেরাই পূজা ক'রে থাকে। দু-এক শরিক আছে, যারা আর্থিক সচ্ছলতার দরুন মাইনা-করা পুরোহিত রাখে পালার কয়েক দিন।"

তারা এবার চা ঢেলে নিলে। কুকুরটা তার খাওয়া শেষ ক'রে সুকুমারের চেয়ারের পাশে বসেছে। সুদেষ্ণা হাত বাড়িয়ে আলোটাকে একটু মৃদু করলে। তার হাতে কাচের চুড়ি। সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, "এবার বল তোর এদিকের খবর।" সুদেষ্ণা ভাবলে গত পাঁচ দিনে বলার মতো কিছু ঘটেছে কি? তারপর বললে, "বলার মতো কিছু দেখছি না। তুই কি ওখানকার ব্যাপার সব ঠিক ক'রে এসেছিস।" সুকুমার বললে, "হ্যাঁ। বড় মামা বলেছেন, এই সপ্তাহে মাকে আর ঠাকুরমাকে নিয়ে যেতে। ঠাকুমার চোখের অপারেশনটা হ'ক। মার হার্টটাও আর একবার দেখিয়ে নেয়া দরকার। সোমবারে যাওয়ার সময়ে নিয়ে যাব ভাবছি। তুই

কয়েক সপ্তাহ একা পারবি না ম্যানেজ করতে?"

সুদেষ্ণা বললে, "এবার চল মায়ের কাছে।"

কুকুরটাও উঠলো। ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা করিডর ধ'রে দোতলার সিঁড়ির দিকে চললো। কুকুরটা খানিকটা এসে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। মনে হয় ঘড়ির বদলে, কুকুররা অন্ধকারের তারতম্য, উত্তাপের তারতম্য থেকে বোঝে তার কোন কাজের সময় হয়েছে। সে করিডর থেকে লাফিয়ে নামলো। এখন সে অন্ধকারে বাড়িটার চারদিকে চক্কর খাবে। এখানে-ওখানে এটা-ওটা শুঁকবে। দু-একবার ফাঁকা গলায় ঘং ঘং ক'রে ডাকবে, এক-আধবার চাপা গলায় তর্জন করবে। তারপর অত্যন্ত ধীর গতিতে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এদের দাদা সুরথের ঘরের দরজার কাছে রাখা রাগটায় গিয়ে শোবে। প্রায় প্রতি ঘণ্টাতেই একবার ক'রে উঠবে। ঘরটায় ঘুরপাক খাবে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে বাড়িটার চারদিকে ঘুরপাক খাবে। কি যেন খুঁজবে। পেটা ঘণ্টার মতো ডাকবে। প্রায় সারারাত তার এই কাজ চলতে থাকে। নতুন কেউ এলে, তার ধারণা হ'য়ে যেতে পারে কুকুরটি সারারাত সিঁড়ি বেয়ে ওঠে আর নামে। করিডর দিয়ে চলতে চলতে সুদেষ্ণা বললে, "ও, একটা খবর আছে। পলাশ, পলাশ ভটচাজ ফিরে এসেছে।"

সুদেষ্ণা সুকুমারের মায়ের ঘর দোতলার মাঝামাঝি জায়গায়। ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ে, নিচু, সাদা ল্যাকারে পালিশ করা, ডবল-বেড। যার শিয়রের রেলিং-এ হেলান দেয়া জীবিত-পরিমাপ আবক্ষ পোর্ট্রেট সুরঞ্জন সাহেবের। বিরল-আসবাব সেই ঘরের সাদায় সবুজ আর হলুদে মোজেইক করা মেঝেতে, খাট থেকে বরং অন্য পাশে, মাটিতে বিছানা পাতা। তার উপরে স্থির হ'য়ে ব'সে সুদেষ্ণাদের মা। সেই বিলেত ফেরত ব্যারিষ্টারের কন্যা ও ভগিনী। চুল চিরকালই কাঁধ পর্যন্ত ছিল, এখনো তাই। আগে ঠোঁটে রং থাকতো এখন তা এমন ফ্যাকাশে, যেন নীলাভ। পরনে জাফরান শাড়ি। কিছুক্ষণ আগে নিজে হাতে তৈরি ক'রে চা খেয়েছে। এখন স্থির হ'য়ে ব'সে, সেই ঘরের অনতিউজ্জ্বল আলোতে যেন রঙিন পাথরের ভাস্কর্য। শুধু সামনের তামার অ্যাশট্রে থেকে মৃদু ধোঁয়া উঠছে সিগারেটের, তাতে বোঝা যায় জীবিতা। নতুবা যেন চোখের পাতাও নড়ে না। তা, শাড়ি-গহনা, আমিষ খাদ্যের সঙ্গে সেই লিকার, ওয়াইন, এমনকি কফিও বর্জিত। শুধু সিগারেট আছে। এখন বোঝা যায় না, দিনের আলোয় দেখা যেতো, ত্বক আর-তেমন উজ্জ্বল নয়, যেমন বোঝা যেতো নীল টেম্পারা করা দেয়াল আর ছাদের জোড়ে বৃষ্টিজলের কালচে দাগ, যেমন সেই সুদৃশ্য ডবল বেডের সাদা সাটিনের বেডকভারে হাল্কা গেরুয়া ধুলো। এতো বোঝাই যাচ্ছে, স্বামী ও পুত্রের অকালমৃত্যুতে চোখের জল আর নেই। হয়তো হৃদ্‌যন্ত্র খারাপ হয়েছে। কিন্তু বসার ওই ঋজু শুদ্ধ ভঙ্গি থেকে তার কিছু আন্দাজ হয় না।

এসো, ব'লে তাদের অভ্যর্থনা করলে, ছেলেমেয়ে মেঝেতে বিছানার ধারে

বসলো। এখন তাদের এখানে আধঘণ্টা কাটবে। সুকুমারের পথে কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা, তার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে, সুদেষ্ণার উলের ডিজাইনটা কাল সকালে একবার দেখা দরকার, এমন সব আলাপ হ'ল। ঝিকে একবার বাজারে পাঠানো হয়েছিল—সে টাকা-পয়সার অঙ্কে কী রকম গোলমাল করেছে তা নিয়ে হাসাহাসি হ'ল। চোখের কোণ ভিজলো না, গলা কাঁপলো না, মৃদু, সমান থেকে গেল। একবার একটা ছোট হাইয়ের মতো দীর্ঘশ্বাস পড়লো, তা, সেজন্যই তো হার্ট দেখাতে সোমবারে শহরে যাওয়া। "তোমাকে আর ঠাকুমাকে নিয়ে সোমবারে কলকাতায় যাচ্ছি।" বললে সুকুমার, "বড়মামা ব'লে দিয়েছেন।"

মায়ের ঘর থেকে উঠে ঠাকুরমায়ের ঘরে গেল তারা। দোতলার একেবারে পশ্চিমের ঘর, যাকে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং এপারের ঘরগুলো থেকে পৃথক করেছে। ঘরের দক্ষিণ জানালার কাছে সরু সেকেলে খাট। উত্তর দেয়ালের কাছে সেকেলে উঁচু ড্রেসিং টেবল। পুব দেয়ালে, দুটো দেয়াল-আলমারির মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় একটি বছর ত্রিশেক যুবকের পাশে পনি-র পিঠে বছর আটেক বয়েসের এক শিশুর এনলার্জ করা ফটো। ফটোর সামনে একটা পাথরের কী মূর্তি। তার সামনে ব'সে রুদ্রাক্ষের মালা জপ করছেন একজন। সুদেষ্ণার ঘরে যে-উজ্জ্বল টেবল ল্যাম্প ছিল তার আলোর চাইতে মায়ের ঘরের দেয়ালগিরির আলো কম উজ্জ্বল ছিল। এ-ঘরেও একটা বড় টেবল ল্যাম্প জ্বলছে, পুরনো সেই ড্রেসিং টেবলের কাচের সামনে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আরো যেন মৃদু। তাহলেও এগিয়ে গেলে বোঝা যায়, ফটোর সেই ত্রিশ বছরের যুবকটি সুরঞ্জন সাহেব আর পনি-র পিঠে সেই বালকটি সুরথ (কারণ ফটোতেই দাঁড়ানো পুরুষটি অন্তত তিন ফুট উঁচু) আর কালো হ'য়ে আসা ব্রোঞ্জের মূর্তিটি নৃত্যপরায়ণ মহাকালের।

এখন এই ষাট পার হ'য়ে আসা পুষ্টকায়ার মধ্যে সেই সপ্তদশীকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সুদেষ্ণা ও সুকুমার তাঁর কাছে মেজেতে বসতেই তিনি মুখ ফেরালেন। হাতে মালা আর নড়ছে না এদিকে মনোযোগ দেয়ায়, কিন্তু মুখ তোলা দেখে অনুমান হ'ল চোখে ছানি প'ড়ে থাকবে। আঁচলে চোখ মুছলেন হাসবার আগে। সেজন্যই তো চোখ দেখাতে কলকাতা নিয়ে যাওয়া।

বললেন সুকুমারের গায়ে হাত বুলিয়ে, "প্রোটিন কমেনি তো খাদ্যে ?"

"কী যে বলো !" বললে সুকুমার প্রবোধ দিয়ে।

"এখানে সুদেষ্ণা আজকাল রাতে প্রোটিন খায় না। শুকনো রুটি খায়।"

"বাহ ! মোটা হ'য়ে যাচছি না। তোমার কম বয়েসি সেই টিসু শাড়ি পরা ছবির কথা ভাবো। কী সাহস দাদুর। সেই কলার্ড ফটো বোর্ন অ্যাণ্ড শেপার্ডকে দিয়ে তুলিয়ে আবার বাঁধিয়েও রেখেছে।"

"বুড়োর কাণ্ড।"

"হ্যাঁ, দিদা, তোমার-মতো একটা বুড়ো বর জুটিয়ে দেবে ?"

"নি গে না, যা, নিচুতেই আছে।"

"এখনই যাব," ব'লে সুদেষ্ণা উঠে দাঁড়ালো। সুকুমারও। এখন তারা একতলায় পশ্চিমের ঘরে বৃদ্ধ সুরেন ঘোষকে দেখতে যাবে। তাদের ঠাকুরমা জপের মালা হাতে তুলে নেবেন। পুত্র আর পৌত্রের ফটোর সামনে রাখা নৃত্যপরায়ণ মহামরণের অথবা মহাকালের নাম জপ করবেন।

একতলায় পশ্চিমের ঘরে বিছানায়, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে, সুরেন ঘোষ প্রায়ান্ধকার ঘরে তামাকের মৃদু মদির ধোঁয়ায় ডুবে আছে।

বললে,—"বুঝতে পারছি, প্ল্যান আছে।"

"তা আছে,"—বললে সুকুমার, "সোমবার কলকাতা চলুন।"

"তা মন্দ হয় না," বললে সুরেন ঘোষ। "ব্যারিস্টারের সঙ্গে পরামর্শ নেয়া দরকার, কনটেমপট অব কোর্টের মামলা হয় কিনা। আমাদের অনুকূলে যে ইনজাংশন, তার নকল ওরা কুকুরের ল্যাজে বেঁধে ঘোষপাড়ায় ঘুরিয়েছে। হাসছিস ?"

"করবে, কিন্তু সাক্ষী হবে কে ?" সুদেষ্ণা বললে।

"তা বটে। করালীকিঙ্কর যখন নরবলি দিয়েছিল, তখন সাক্ষীরা দাঁড়িয়েছিল ঘোষপাড়ার ভরসায়। তা নিয়ে যাবি, স্টেশনে যাব কিসে ?"

"তোমার সেই ফ্লাই আছে। দিদি চালিয়ে নেবে।"

"কিন্তু আমার জামা, কাপড়, জুতো, লাঠি ?"

" সব ঠিক আছে।"

"আচ্ছা। যাব তাহলে। ও, জানিস, দিদু, সেই ছোকরাটা তোর দিকে তাকিয়েছিল আজো, যখন তুই তোর পনি রিকসায় বাজার ক'রে ফিরছিলি। তুই তো ঘোড়াটার কান দুটোর মাঝখান দিয়ে রাস্তাই দেখিস শুধু।"

"তাই ?" হাসল সুদেষ্ণা, "ভাবছিল নাকি, রিকসাপনি শুদ্ধু গিলে ফেলা যায় কিনা ?

'না রে, কেমন ভীতু-ভীতু অবাক চোখে দেখছিল। ওর নাম পলাশ। জানিস পলাশের এক গল্প আছে।"

সুকুমার বললে, "বলো দাদু।"

"পলাশ হচ্ছে গিয়ে করালীকিংকরের পসথুমাস ডটার কাত্যায়নীর কনিষ্ঠ সন্তান। ওর মায়ের বিয়েতে ধার করেছিল হাজার পাঁচেক। বিশ বছরে তা শোধ হয়েছিল। তোদের বাবা সুরঞ্জন সাহেব গুড নেবারলিনেস পছন্দ করত বলে সুদটুদ বাদ দিয়েছিল। বিয়েটা তত ভালো হয়নি। ছোটখাট জোতদার ছিল ক্যাত্যায়নীর বর। বেয়াল্লিশে একবার মাস ছয়েকের জন্য জেল খেটে থাকবে। পলাশ যেবার হায়ার সেকেণ্ডারি দেয়, তার দু-তিন বছর আগে ওরা ও-দেশ থেকে পালিয়ে আসে, ঘোষালদের এক বেওয়ারিশ জমিতে ছাপরা-টাপরা তুলে বাস করতে থাকে।

জমিটা ঘোষালদের সেকেলে বাগানের অংশ। পলাশের বাপ বেদখল করেছিল বলা যায়। ওদিকে ঘোষালদের মধ্যে ওটা ঠিক কার তার নিষ্পত্তিও হয়নি ব'লে তারাও চুপ-চাপ ছিল। পলাশ হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করলে, তার বাবা সেই জমি বন্ধক দিয়ে কিছু ঋণ করতে এসেছিল, নাকি পলাশকে ডাক্তারি পড়াবে। সুরঞ্জন সাহেব বলেছিল, আমরা ব্যক্তিগতভাবে ঋণ কাউকে দিই না আর। ব্যাংক জমি বন্ধক রেখে টাকা দেবে না, কারণ ও-জমির উপরে কার হক তা স্থির করতে হ'লেই হাইকোর্টে যেতে হয়। তাছাড়া ছেলেকে বরং চাকরিটাকরিতে ঢুকিয়ে দিন। আমাদের ফার্মেই কাজ শিখুক না। পলাশের বাবা বলেছিল, পলাশ ভালো ছেলে, হায়ার সেকেণ্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েছে। তা, তোদের বাবা বলেছিল, ফার্স্ট ডিভিসনটা এমন কিছু বিষয় নয়। এ শুনে পলাশের বাবা রেগে উঠে গিয়েছিল, বলেছিল, আপনার কাছে উপদেশ নিতে আসিনি মশায়।"

সুদেক্ষা বললে, "এ গল্প তো জানতাম না। আচ্ছা দাদু, সোমবার সকালের দিকেই কিন্তু ট্রেন।"

এক একটা পরিবারে কোনো কোনো নাম এমন থাকে যার উল্লেখ হলে সেটা কিছুক্ষণের জন্য মনের মধ্যে পাক খেতে থাকে।

সুকুমার সুদেক্ষা দুজনের মনের মধ্যেই পলাশ শব্দটা যেন একটা অসুস্থ স্নায়ুর মতো থিক থিক ক'রে লাফাতে লাগল। শুধু চেনার মতো লেগে থাকা নয়। যেন দূষিত বাষ্পের মতো ঘোরা-ফেরা করা। মুখের ভিতরটা যেন তুঁতেতে তিক্ত হওয়া।

সেজন্যই দুজনে যেন বাইরে খোলা আকাশের নীচে চলে এল, সেই খোলা আধ-ময়লা কর্কশ মাটির ওপরে, যেখানে অতীতে বাগান ছিল ফুলের। কেউই বললে না পলাশের কথা, কিন্তু নামটা সম্বন্ধে দুজনের ভাবনা একটা চিন্তায় একত্র হলঃ এ গল্পটা নতুন।

তাদের পাশে এখন ঘোষদেরই বাড়ি। অর্থাৎ তাদের নিজেদেরই তো। ভিতর থেকে যা বোঝা যায় নি, এখন তা বোঝা যাচ্ছেঃ এখনও সন্ধ্যা আলো বাইরে, ভিতরে সেই ল্যাম্পগুলোর জন্য বন্ধ দরজা-জানলার ওপারে রাতের অন্ধকারই ছিল। এখানে সন্ধ্যার অন্ধকার বোঝা গেল এই জন্য, যে ঘোষদের বাড়িটা এখন যে-রকম হওয়া উচিত সেরকম আন্দাজ হচ্ছে; দেয়ালের রং বর্ষার শুকনো শ্যাওলায় কালো, এখানে কার্নিশটা ভেঙে পড়েছে, ওখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে আস্তর খ'সে গিয়েছে, জানলা দরজাগুলোর কাঠের উপর থেকে রং বার্নিশ জ্ব'লে পুড়ে গিয়েছে, এক জায়গায় কার্নিশের উপরে খানিকটা জঙ্গল গজিয়েছে। পরিত্যক্ত একটা জীর্ণ বাড়ি। সুকুমার মুখ তুলে চাইল, আর তখনই তার চোখে পড়লো। দু ফার্লং দূরে, বরং তাদের বাঁদিকে, যেন আলোক-ছড়ানো হীরার কণ্ঠী, যেন অমর্তলোকের প্রাসাদ। আলোর জন্য এমন হয়। ভাঙাচোরা, ফাটল-ধরা, দরজা-জানলা খ'সে যাওয়া, দেয়ালে অশ্বত্থ-গজানো ঘোষালদের তিনতলা প্রাসাদের পশ্চিমমুখী অংশটা। এখন

সন্ধ্যায় এতদূর থেকে ভাঙচুর, ফাটল, দরজা-জানলায় কপাটের বদলে ঝোলান চট ইত্যাদি চোখে পড়ে না, কিন্তু ইলেকট্রিকের সরবরাহ থাকায় সেইসব ফাঁকফোকর জানলা থেকে আলো ছড়ায়।

প্রায় বিপরীতই। এখানে এই ঘোষদের বাড়ির কালো হ'য়ে যাওয়া, ইটের পাঁজরা বার হওয়া, এই বাইরের দেয়ালের ওপারে, সাদা কলি ফেরানো ভিতর পিঠের দেয়ালে যে-আলো, তার এতটুকু এখানে চোখে পড়বে না। আলো উত্তাপের কথা মনে করিয়ে দেয়। একপুরুষের আভিজাত্যের ভিতর দিকে মুখ ফেরানো উত্তাপ বাইরের দেয়ালের এই উদাসীনতায় বোঝা যায় না।

সুকুমার একবার ভাবলে, পলাশের কথা তার মনে উঠছে, তা যদি সে না বলে, তবে কি দিদির সঙ্গে ছলনা করা হয়? সে বললে, "কিন্তু দিদি, তা, এক সপ্তাহ, এক সপ্তাহ তুই একা, একেবারে একা থাকছিস কিন্তু।"

পট-পট ক'রে একটা শব্দ হ'লো। মৃদুই। পচা শুকনো ডালে পা পড়েছে। সুকুমার দেখলে গ্রেট ডেনটা হাঁটার চাইতে একটু দ্রুত এসে সুদেষ্ণার গা ঘেঁষে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটতে শুরু করলো।

এটাই কি সুদেষ্ণার উত্তর? তাছাড়া, তারা বাড়ির বাইরে এই বাগানে, সে তো প্রায় পাঁচ বছর হ'লো, কোনো আলাপ করছে না। তারা যেন বাড়িকে প্রদক্ষিণ ক'রে বাড়ির ভিতরে যাবে। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে তারের খসে-পড়া ফেনসিং। তার দু-একটা পিলার এখনো আছে, এখনো সাদা দেখায় এ-রকম অন্ধকারে। সুকুমার দেখলে, একজন কেউ সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে একটা পিলারে হেলান দিয়ে। সে ভাবলে, "ও, আচ্ছা, এটাও দিদির উত্তর হতে পারে না কি?"

তারা ভিতরে যাওয়ার জন্য খিড়কির দরজার দিকে এগোল। তখন সুকুমার দেখলে, ঠিক পঞ্চাশ না হ'লেও প্রায় সেরকম দূরে আর ঐ-একজন-কে আর-একটা পিলারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুকুমারের মনে প্রশ্ন উঠল: সেই লোকটিই, না কি অন্য আর-একজন? সেই হ'তে পারে। তারা তো খুব আস্তেই হাঁটছে। বাড়ির বাইরে তারা আর জোরে-জোরে হাঁটে না, তা সে পাঁচ বছর হবে। হয়তো সেই লোকটিই, যেন তাদের দুজনকে একটা বৃত্তের গণ্ডির মধ্যে রেখে পাহারা দিচ্ছে। হয়তো কুকরি ছাড়ে নি।

অন্যান্য শনিবারে সুদেষ্ণা রান্নাঘরে যায়, আর সেখানে তার ব্যাঞ্জো নিয়ে গিয়ে বসে সুকুমার। এক একদিন কোনো-কোনো পরিবারে চিন্তা এক বিশেষ খাতে বইতে থাকে। সুকুমার বললে, "ওটাকে কি তোর উন্মাদ রোগ মনে হয়, দিদি, করালীকিঙ্করের সেই নরবলি?"

"অন্তত তার উকিল কোর্টে সেই যুক্তি দেখায় নি।"

"তবে এ কি আদিমতায় ফিরে যাওয়া? পূর্বগানুকৃতি?"

"তা হলে কিন্তু আদিকে অনুসরণ বলতে হবে। দু-আড়াই হাজার বছর ফিরে

যাওয়া তো বটেই। যখন শস্যক্ষেত্রের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য যুবকের রক্তপাত করার উৎসব করতো মানুষ।"

"কিংবা মহামারী নিরোধ করতে। আমি কিন্তু জানি না, কারো মধ্যে অ্যাটাভিজম দেখা দিলে, সেটা আবার কিছুদিনের জন্য তার বংশধরদের মধ্যে চলতে থাকে কি না।" এই ব'লে সুকুমার পায়চারি করলো খানিকটা।

সুদেষ্ণা কিছু ভেবে শিউরে উঠলো। বললে, "ভাবো এক সুস্থ সবল যুবককে বেশ কয়েকজন মিলে জমির উপরে চেপে ধ'রে, তার গলা কাটছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে, তখনো সেই হতভাগ্যের হাত-পা হয়তো মাটিতে আছড়াচ্ছে। আর সকলে উৎসব করছে। কি ? না, নতুন ফসল উঠবে।"

"আসলে", বললে সুকুমার, "রক্তটাকে খুব মিস্টিরিয়াস, রহস্যজনক, গূঢ় অর্থপূর্ণ কিছু মনে করা হয়। মনে করা হয়, ওটা নিয়ে কিছু রিচুয়াল করলে সব দিক দিয়ে ভাল কিছু ঘটবে।"

সুদেষ্ণা বললে, "এখনো আছে, এখনো আছে এ ধারণা। পরশু দিন কাগজে পড়ছিলাম, কাম্পুচিয়ায়, যে-দেশে নাকি আঙ্করভট তৈরি করার মতো সভ্যতা এসেছিল একদিন, সেখানে গেরিলা যোদ্ধাদের হ্যাভারসাকে পাতায় জড়ানো শুকনো নরমাংস পাওয়া গেছে।"

"অবশ্যই গৃহযুদ্ধের শত্রুর মাংস, মেটুলি। কিন্তু তুই তো জানিসই সে শুধু সুস্বাদু ব'লে খাওয়া নয়। শত্রুর মাংস নাকি সাহসী করে, শরীরে ও মনে বল এনে দেয়।"

"হ্যাঁ। কেমন অবাক লাগে না ? এখন তো জানা যাচ্ছে, ডাইআকদের মধ্যে নরমাংসভক্ষণ এই সেদিনও ছিল। ফিলিপাইনের কোনো দক্ষিণতম দ্বীপে নাকি এখনো নরমাংস ভক্ষণের ব্রত হয়। আর আমাদের দেশেও—"

সুকুমার বললে, "কিন্তু এ কি শুধু অ্যাটাভিজম ? তোর মনে পড়বে, বাবার অসুখের সময়ে কলকাতায় একবার রক্তের বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। কোনো-কোনো ডাক্তার টাটকা রক্ত প্রেসক্রাইব করে। যেমন লিভার ভালো করতে লিভার খেতে বলে। ষাঁড়ের হরমোন হরমোনের ঘাটতি হ'লে।"

সুদেষ্ণা বললে, "এসব কি তুকতাক ? রোগীর যেটুকু উপকার হয় তা মনস্তাত্ত্বিক ? সেই সেকালের যুবকের রক্ত জমিতে দেয়া নতুন ফসলের আশায় ?"

সুকুমার বললে, "জানি না, জানি না। মনে হয়, রক্ত খেলেই সে রক্ত সোজাসুজি ভক্ষকের শিরা-উপশিরায় যায় না, লিভার খেলেই লিভার শক্তিশালী হয় না। পাকস্থলী সেই রক্ত, লিভার, হরমোনকে অন্যান্য খাদ্যের চাইতে বেশি খাতির করে না।"

"এসব থাক, এসব থাক। চল, একটু বাজাই। অনেকদিন বাজাই না।"

স্টোভ নিভিয়ে তারা সেই ঘরে এসেছিল যাকে লাইব্রেরি বলে। শোবার ঘরের

টেবল ল্যাম্পের মতো একটা আলো জ্বেলেছিল। বাইরের দিকের অর্থাৎ দক্ষিণের জানলা-দরজা সবই বন্ধ ছিল। ভারি-ভারি মোটা আর ধূসর হ'য়ে ওঠা পর্দাগুলোকে টেনে-টেনে দিলে। যেন শব্দ বাইরে না যায়। পুরনো আর ছোটো পিয়ানোর সামনে ব'সে খুব মৃদু শব্দের এক সোনাট্যা মৃদুতর ক'রে বাজালে সুদেষ্ণা। ভিতরের দিকে কিছুটা সে সুরলহরী ছড়ালো। প্রমাণ গ্রেট ডেনটার নিঃসঙ্গ বোধ ক'রে আকাশমুখী হ'য়ে একবার ডেকে ওঠা, যা থামাতে সুকুমার বাইরে গিয়ে তার কপালে মৃদু মৃদু চাপড়ে এল।

শনিবারে ব্যাখ্যাত একপুরুষের আভিজাত্যে এই লক্ষণ : যে আলো, সুস্বর এখন আর কিছুই বাইরে থেকে জানতে পার না। দক্ষিণের সেই জানলা দরজাগুলো সব চিরকালের জন্য বন্ধ এখন।

তারপর সোমবারের সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা এল। বাইরে থেকে দেখতে ঘোষেদের বাড়ির কোনো পরিবর্তন চোখে পড়লো না। কিন্তু ভিতরে একটা পরিবর্তন ধরা দিচ্ছে। কাচের সিলিণ্ডারের মসৃণ গায়ে কিছু নড়ে না, সরে না, কিন্তু ভিতরে একটা তরল ফোটে, ঘুরপাক খায়, নানা রঙে ভাগ হয়। সুদেষ্ণা শনিবার আসার অনেক আগেই স্থির করেছিল, পলাশের সঙ্গে সে কথা বলবে। পলাশ নিজে থেকে এগিয়ে এসে কথা বলে, তা হ'লে ভালো, নতুবা সে নিজেই দেখা হওয়া মাত্র আলাপ করবে। কী বলবে ? কি হ'তে পারে তাদের আলাপের বিষয় ? এটা আগে থেকে ঠিক করা যাচ্ছে না, তা যায়ও না বোধহয়। সে যেন একটু অবাকই হয়েছিল, সোমবারের সকালে স্টেশনে সুকুমারের সঙ্গে মা, ঠাকুরমাদের রওনা ক'রে দিয়ে তার সেই পনি-রিক্সায় বাড়ির দিকে ফিরতে-ফিরতে। পথ চলতে তার দৃষ্টি সেই রিক্সার হাতল ডাণ্ডা দুটোর মাঝ-বরাবর রেখে সে ভেবেছিল, ষড়যন্ত্রের মতো নয় ? কিন্তু স্বাভাবিকও, ঠাকুরমার চোখ-কাটানো আর মার হার্টটা পরীক্ষা করিয়ে নেয়া। একই সঙ্গে দুটোর ব্যবস্থা করা, ঠাকুরদাকেও কলকাতায় যেতে রাজি করানো—এ সব বন্দোবস্ত স্বাভাবিক। তাও স্বাভাবিকই, চোখের অপারেশনের সময়ে ঠাকুরমা ঠাকুরদা এবং তার বেটার বউ-এর সান্নিধ্য চাইবেন না ? ষড়যন্ত্র এই শব্দটা মনে হওয়ায় আপন মনে হেসেছিল সুদেষ্ণা। আর যেহেতু সে স্বাস্থ্যবতী, যুবতী সে হাসিকে রহস্যময় মনে হয়েছিল। ওরা অর্থাৎ ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, মা, সুকুমার—কেউই এই নিঃসঙ্গ বাড়িতে তার এক সপ্তাহ থাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে নি, কারণ তারা সকলেই জানে, যদিও কেউ কাউকে বলে নি, যে তাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব এখন ভিতর থেকে তৈরি হ'য়ে ওঠা এক রকমের বুলেটপ্রুফ জামা পরা। এ কথাটা মনে-মনে তৈরি ক'রে সুদেষ্ণার মুখ কঠোর হ'য়ে উঠেছিল। কোনো-কোনো সুন্দর মুখে ডিম বা পানের গড়নের বদলে চতুষ্কোণের ভাব থাকে, তখন বোঝা গেল সুদেষ্ণাকে দেখে।

কিন্তু যার সঙ্গে কোনো দিন একবারের জন্যও আলাপ হয়নি, কী ক'রে তাকে

নিভৃতে আলাপ করার মতো কাছে পাওয়া যায়। বাড়িতে ফিরে সে পনিটাকে গাড়ি থেকে খুললে না। শাড়ি পালটে ম্যাকসি পরলে। চোখে সানগ্লাস। হাতে সিগারেট হোল্ডারে সিগারেট, আবার পনি রিকসায় বেরুল। ঘোষালডাঙ্গার এপথে ওপথে, শহরে বাজারমুখো রাস্তায়, ঘোষালডাঙ্গা থেকে ঘোষপাড়া যাওয়ার অপেক্ষাকৃত নির্জন পথে। সে স্থির করেছিল, একদিন না একদিন, সকলে বিকেলে বেড়াতে-বেড়াতে সে পলাশকে দেখে ফেলবে। আর তার পনি-রিক্সা এবং নানা বর্ণের ম্যাক্সি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে অবশ্যই।

সোমবার দুপুরেই, ঝি যখন সারাদিনের কাজ সেরে বাড়ি যাচ্ছে, সুদেষ্ণা তার দাদার প্যাডে চিঠি লিখলে পলাশকে। ঝিয়ের হাতে দিয়ে বললে, "পলাশকে চেন তো, সেই যে পলাশ যাকে পুলিস ধ'রে নিয়ে গিয়ে আবার এখন বেকসুর ছেড়ে দিয়েছে, তার হাতে দিও, কিংবা তার বাড়ির কাউকে।" সে চিঠিতে লিখলে, একটু দরকার পড়েছে। আজ, কাল, কিংবা এ সপ্তাহের যে-কোনো সন্ধ্যায় যদি আসেন।

সন্ধ্যায় সে কিমনো পরলে অনেকদিন পরে। সেই কালোয় সাদা হলুদ ফুল ছাপা, জাপানে তৈরী, জাপানী সিল্কের, যা তার দাদা নিজের জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল। নিজের শোবার ঘরের একটা ফ্রেঞ্চ উইনডো খুলে রাখলে। সন্ধ্যায় উজ্জ্বল আলো জ্বাললে। আলোটা বাইরে গিয়ে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে যেমন আশা করা গিয়েছিল, বড় মাপের মথ উড়ে এসে চিমনির গরম শক্ত গায়ে ডানা ঝাপটাতে শুরু করলো! আর তা দেখে আপন মনে হাসলো সে।

আসল কথা, পলাশ যদি যদি আসে, তখন কী বলা হবে তা যেন স্পষ্ট নয়। যেমন ইতিমধ্যে তার মনে হচ্ছে, কিমনো পরা উচিত হচ্ছে কিনা তা ঠাহর করতে পারছে না। একটা অজানা দেশে ভ্রমণ করার মতো, যখন যে-রকম তখন সে-রকম ব্যবস্থা নিতে হবে নাকি? এমন সময়ে সে দেখতে পেলে, ফ্রেঞ্চ উইনডোটার মধ্যে দিয়ে আলো গিয়ে যে লম্বাটে আলোর সামন্তরিক তৈরি করেছে ন্যাড়া বাগানে, সেখানে একজন মানুষ। যুবকই বটে, রোগাটে আর লম্বাটে। সুদেষ্ণার সময় লাগলো ঠিক করতে। সে কি বসে থাকবে মুখ নিচু দিকে রেখে, যাতে তার মুখের উপরের দিকটায় শুধু আলো পড়ে? আর তার সেই অবস্থায় পলাশ এগিয়ে আসতে থাকলে বলবে, বসুন, আমিই সুদেষ্ণা যে আপনাকে চিঠি পাঠিয়ে ডেকেছে? কিংবা সেকি নিঃশব্দে ছায়ায় ছায়ায় স'রে যাবে আর পলাশ এসে বসবে কোনো চেয়ারে, আর সে নিজে বাথরুমের দরজা কিংবা করিডরের দরজা দিয়ে তার অজ্ঞাতে ঘরে ঢুকে চমকে দেবে।

ততক্ষণে পলাশ চ'লে এল। উইনডোটার সামনে ইতস্তত করল। ঘরে ঢুকলো। চিত্রার্পিতের মতো সুদেষ্ণাকে আবিষ্কার করলে এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে। খুক করে কাশলো। সুদেষ্ণা মুখ তুললে, বললে, "বসুন। আপনি পলাশ ভট্টাচার্য?

বসুন। আমি এক মিনিটে আসছি।”

পলাশের কাশি আর নিজের মুখ তোলার মধ্যে সুদেষ্ণা ভাবলে, কিমনো পালটে শাড়ি পরা কি উচিত? এখন সাদামাটা শাড়িতে গেলে তার কী অর্থ হবে? এরকম কি হ'তে পারে?—এ পোশাক তোমার কাছে কোনো সুন্দরী মেয়ের গায়ে এই প্রথম, তোমার চোখে ধাঁধা লাগাতে যথেষ্ট, কিন্তু আসলে এটা আমার বাড়িতে থাকার পোশাক। আমি সেজেগুজে তৈরী হ'য়ে ছিলাম, তা নয়। বরং উল্টো। চিঠি দিয়ে ডেকেছি ব'লেই আসবে, তা মনে করিনি, তার জন্য ব্যস্তও হইনি।

পলাশ বসলে সুদেষ্ণা উঠলো, কিমনোটাকে যেন লজ্জার দরুনই গায়ের কাছাকাছি জড়িয়ে ধ'রে বেরিয়ে গেল। এক মিনিট নয়। অন্তত দশ-বার মিনিট পরে ফিরে এল। তখন সে লাল পাড়ের কালো সিল্কের শাড়ি পরেছে, যার আঁচলা বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে রানীদের দরবারি ট্রেইন হেন পিছনে মাটিতে লুটিয়ে চলেছে। চুলগুলো এখন আর জাপানি প্রজাপতি নয়, বরং খানিকটা পিঠে খানিকটা ডান বুকে আলুলায়িত, আর চোখের নীচে ইস্পাত নীল ম্যাসকরা। দুহাতে হাল্কা ট্রেতে চা, কিছু কেক।

সুদেষ্ণা হাসিমুখে বললে, “টিপয়টাকে একটু টেনে নিন।”

পলাশ টিপয়টাকে টানলে, তার উপরে চায়ের সরঞ্জাম সমেত ট্রে নামিয়ে বিপরীত দিকের চেয়ারটায় বসে টিপটের ঢাকনা খুলতে-খুলতে সুদেষ্ণা বললে, “আমি কে তা চিনতে পেরেছেন?”

পলাশ বললে, “আন্দাজ করতে পারছি, কিন্তু কী দরকার ছিল চায়ের বন্দোবস্ত করা? কী একটা কাজ ছিল আপনার।

সুদেষ্ণা বললে, “তা পারবেনই তো, দাদার প্যাডেই তো চিঠিটা দিয়েছিলাম। কাউকে বাড়িতে ডাকলে, এই সন্ধ্যায় এক কাপ চা অফার করব না, তা কি হয়?”

দাদার প্যাড এই শব্দ দুটোও যেন পলাশকে ধাক্কা দিল, যার ফলে তার হলুদ রুগ্নমুখে খানিকটা লালচে ভাব হ'ল। সে মুখ তুললে। সুদেষ্ণা চোখ নামালে না, বরং পলাশের চোখের মণি দুটো, তাদের আকার রং, এসব লক্ষ করলে।

সুদেষ্ণা ভাবলেঃ যদি আমার চোখের মণির পাশে কেন লাল হয়ে উঠছে কেউ জিজ্ঞাসা করে, তা হ'লে বলা যাবে, ওটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার। কিছুদিন থেকে যখন-তখন জল পড়ে। জল পড়ে-পড়ে লাল হ'য়ে ওঠে। ঠাকুমার চোখ দেখাতে কলকাতা যেতে হ'ল আজ সকালেই। আর জল পড়া ভালো, নতুবা ভিতর দিকে চোয়াতে থাকলে বুকে দারুণ ব্যথা হয়।

সে বললে, বেশ করে পলাশকে দেখে নিয়ে, কাপে চা ঢেলে, চিনির চামচ হাতে নিয়ে, হাসি হাসি মুখে, “কটা? দুটো?”

পলাশ ভাবলেঃ এসব গল্পে পড়া যায়, সিনেমাতে দেখা যায়। এই সব টিপট, সুগারপট, মিল্ক জাগ, এমন কটা চিনি লাগবে জানা—এ-রকম ধরনের তার জীবনে

এই প্রথম। কিন্তু এখানে কি সে চা খেতে পারে, এই বাড়িতে আর সুন্দরী, ফ্যাকাশে, চোখে ম্যাসকারা এই মেয়েটির হাত থেকে ?

সুদেষ্ণা বললে, "নিন। আমিও নিচ্ছি। একটা গল্প আছে, যা শুনলে আপনার বরং ইনট্রেস্টিং মনে হবে এই পেয়ালায় চা খেলে।"

টি-সেটটার দিকে চাইলে পলাশ, যেন ভালো ক'রেই সে দেখবে কি কৌতুক আবার আছে এই সুদৃশ্য টি-সেটে। কাপ হাতে নিলে সে।

সুদেষ্ণা নির্লজ্জার মতো নিজস্ব টি-সেটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, যেন তা একপুরুষের আভিজাত্যের ফলেই, বললে সে, "কেমন, ভালো নয় সেটটা ?"

পলাশ বললে, "আপনাকে সত্যি বলতে লজ্জা নেই। আমি কাচের গ্লাসে চা খেতে অভ্যস্ত, আর জেলখানায় তাও জুটতো না।"

"ভারি ইনট্রেস্টিং তো। কিন্তু এই সেটটা সম্বন্ধে—আপনি কিছু ধরতে পারছেন না, না ? এটা সত্যিকারের চায়না নয়। অর্থাৎ দু-তিনশ' বছর আগেকার বা তার চাইতেও আগেকার চীনদেশে তৈরি নয়। এর প্রথম মালিককে কলকাতার এক ইরানি তা বলেছিল বটে, যাচাই ক'রে দেখা হয়েছে এটা ড্রেসডেনের। সেদিক দিয়েও দুষ্প্রাপ্য। এটা প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর। তখন ইংরেজরা চাকে টি না ব'লে টে বলত। ইউরোপে এখন অষ্টাদশ ড্রেসডেনেরও খুব দাম। রেয়ার আর্ট পিস।"

হেসে পলাশ বললে, "এত দামি সেটে চা খাওয়া কি উচিত ?"

সুদেষ্ণা কী বলা উচিত, তা খুঁজলে মন হাতড়ে। বললে, "শেষে ভেঙে গেলে, আঠায় জুড়ে কাচের শো-কেসে উঠবে তখন, তখন পিওর ওয়ার্ক অব আর্ট।"

সুদেষ্ণা হাসল আবার, বললে, "কিন্তু গল্প শোনেন নি আগে, এ-রকম সেট সম্বন্ধে ? বোঝা যাচ্ছে, আপনার চিনি ঠিক হয়েছে। আসলে গল্পটা—আচ্ছা, আপনি নিশ্চয় মহীতোষ ঘোষালের নাম শুনেছেন ? করালীকিঙ্করের খুড়তুত ভাই। আপনি কি ছোটবেলায় শোনেননি মহীতোষ ঘোষাল দামি দামি জিনিস বন্ধক দিয়ে ঋণ যোগাড় করতেন ? শুনেছেন ?"

"তা, ওঁরা ঋণী হয়ে পড়েছিলেন বটে।"

"এই টি-সেটটা মহীতোষ ঘোষাল পাঁচ হাজার টাকায় ঠাকুর্দার কাছে বন্ধক রেখে পরে আর ছাড়াতে পারেন নি।"

পলাশ হেসে বললে, "তা হলে এর দাম তো এখন লাখ টাকা।"

"বলেছেন ঠিকই। তখনকার পাঁচ হাজারের দাম এখনকার হিসাবে সুদ ছাড়াই লাখ টাকা। কয়েক বছর আগে কিছু বিক্রির কথা হয়। তখন কলকাতা থেকে একজন এসে, এ সেটটার জন্য আশি হাজার দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আপনি কিছু খাচ্ছেন না। এ সেটটার উপরে আমার চাইতে কিন্তু আপনার দাবি বেশি। বলুন খেতে ইচ্ছা করে না ?"

"কারণ ঘোষালরা আমার মাতুল-বংশ ?"

সুদেষ্ণা হেসে বললে, "তাই নয় ?"

"চাইলেই কি সব জিনিস পাওয়া যায় ?" পলাশ সহজ সুরে বললে।

"আমি যদি হঠাৎ এ সেটটা আপনাকে দিই ?"

"কেন ?"

উত্তর দেবার আগে ভাবতে হ'ল সুদেষ্ণাকে। তাকে তো ভেবে-ভেবেই এগোতে হচ্ছে।

সে বললে, "এ-রকম একটা কথা কোথায় যেন শুনেছি। ধ'রে নিয়ে এসে খাইয়ে-দাইয়ে, খুব দামি ভোজন দক্ষিণা দিয়েছিল কেউ কাউকে।"

পলাশ হেসে বললে, "বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প ? গল্প সত্যি হয় না। আর গল্প অনুসারে মানুষ চলে না।"

"আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হওয়া যায় না। ইতিহাসের কতটুকু আমরা জানি ? তার অনেকখানি তো মনগড়া গল্প। যে যার খুশি গল্প তৈরি করে, অথচ তার উপরে বিশ্বাস ক'রে মানুষ তার বর্তমানকালকে ব্যাখ্যা দিতে চায়।"

"আপনি কি মার্কস সম্বন্ধে এ-রকম বলছেন ?"

"আমি অত লেখাপড়া করিনি। ধরুন অন্য দেশের গল্প। সেই সব গল্প অনুসারে আমরা চলতে চাই না ? কিন্তু আপনি খাচ্ছেন কোথায় ?"

পলাশ তবু হাসলো, বললে, "কিন্তু এত খাব কেন ?"

"এত কোথায় ? এত দেয়ার শক্তি কি আমার আছে ? আজ দাদার জন্মতিথি।"

কেউ যেন এক নিমেষের এক প্রচণ্ড আঘাতে পলাশের মুখের চেহারা বদলে দিল। আর ঠিক তখনই যোগাযোগের মতো ঘরের গোল ক্লকটায় টং টং করে সাতটা বাজলো। বাইরে প্রচণ্ড ফাঁপা গলায় একটা কুকুর ডেকে উঠল।

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ডেকে ওঠাতেই, কুকুরের বাহাদুরিতে খুশি হ'য়েই যেন হাসলো সুদেষ্ণা। পলাশের হলুদ মুখ প্রায় নীল দেখাচ্ছে। তা দেখে তাকে আশ্বস্ত করতে বললে, "ওটা আমাদের সেই গ্রেট ডেনটা। সাতটার শব্দ শুনলে ওটা ডেকে ওঠে। এ সময়ে দাদা ফিরতেন ক্লাব থেকে এই ঘরে। এই ঘর ছিল তখন আমাদের তিন ভাইবোনের সন্ধ্যার বৈঠকখানা। কিন্তু খান আপনি। বিশ্বাস করুন ওতে বিষ নেই। এই দেখুন আমি আপনার প্লেট থেকেই একটু ভেঙে খাচ্ছি।"

"না বিষ দিয়েছেন মনে করি নি।"

"তবে ? ঐ কুকুরের ডাক ? ভারি মজা দেখছি। ওটা অন্যদিনের মতো, সেদিনও দাদার পাশে ছিল, আর আপনার কাঁধে কামড়ে ধরেছিল।"

বিবর্ণ মুখে পলাশ বললে, "শুনুন একটা কথা বলব। সে সবই ভুল।"

"কী সব ভুল ?"

"আমাদের পলিসিটা ভুল ছিল। অ্যাণ্টিডুহ্রিঙে এঙ্গেলস বলেছেন..."

"যে আপনাদের নরহত্যাগুলো ভুল ছিল ? তো অ্যান্টিড্যুরিঙ কবে ছাপা হ'ল ? না কি আগেই ছাপা ছিল, আপনারা তখন পড়ার সময় পান নি ?"

"আমরা ভুল স্বীকার করেছি। আত্মসমালোচনাও করেছি।"

"তা হ'লে তো সে সব চুকে-বুকেই গিয়েছে। নতুবা আপনারা সবাই মুক্তিই বা পাবেন কেন ? কিন্তু তা হ'লে আপনার খেতেই বা সঙ্কোচ কি ? বরং আপনি খেলেই বুঝব আপনার মনে আর দাগ নেই।" এই ব'লে সুদেষ্ণা টি-পটের গায়ে আস্তে আঙুল ছোঁয়ালো। বললে, "কিন্তু এ আপনাকে খেতেই বা দেব কি ক'রে আর ? একেবারে জুড়িয়ে গিয়েছে। আপনি বরং ঐ সিডকেকগুলো খান। খুব হাল্কা। ওয়েফারের মতো পাতলা হ'ত আগে। আমি ততটা পাতলা করতে পারিনি। আমি বরং—ওর সঙ্গে একটু রেড ওয়াইন দিই।"

সুদেষ্ণা উঠল। পশ্চিমের দিকে দেয়ালের দেয়াল-আলমারি খুললে। সে যদি রেড ওয়াইন আনতে গিয়ে থাকে, তবে সেটা হাতের কাছে পাওয়া গেল না। বরং এটা-ওটা আগে নামাতে হ'ল। একটা পুরনো হ'লেও টেপ-রেকর্ডার, একটা ক্যামেরা। তারপরে একটা বাইশ বোরের রিপিটার রাইফেল। পুরনো হ'লেও, এগুলোকে যত্ন ক'রে রাখা হয়। রাইফেলটার কুঁদোর পালিশ, এমন কি তার চোং, এমন চকচকে যে চোখে না প'ড়ে পারে না। রাইফেলটাকে নামিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখলে সুদেষ্ণা। কয়েকটা কাচের গ্লাস নামালে।

ঠিক এমন সময়ে কুকুরটা আবার ডেকে উঠলো। এবার যেন খানিকটা উত্তেজিত হয়েছে সে। অবশেষে রেড ওয়াইনের বোতলটাকে নিয়ে সুদেষ্ণা টেবলের কাছে ফিরলো। রেডই বটে। যেন রক্তই, পুরনো ব'লে একটু যেন কালচের দিকে রং।

সুদেষ্ণা যেন অবাক হ'য়ে গেল। তাড়াতাড়ি বললে, "সেকি আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন।"

পলাশ রুমাল বের ক'রে কপালের ঘাম মুছলে।

সুদেষ্ণা বললে, "আসুন, সিডকেক দিয়ে এই রেড ওয়াইন ভালো লাগবে।"

সে টেবিলে সেই ওয়াইন আর গ্লাস রাখলে। কিন্তু তাকে যেন বিব্রত হতে হ'ল। হাসলো সে, বললে, "আপনার আসা উচিত হয় নি, এত যদি ভয়। আপনি কি ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়েন নি ? আপনি কি মনে করেছিলেন, রাইফেলটা নামিয়েই আপনার উপর ব্যবহার করবো ? কেউ কি এত বোকা হ'তে পারে, প্রমাণ রেখে খুন করবে ? ঝি হয়তো জানে না, আপনার কাছে চিঠিতে আমি কী লিখেছিলাম। কিন্তু চিঠিটাই তো প্রমাণ করবে যে আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। বাইশ বোরের এই রাইফেলও যত্রতত্র পাওয়া যায় না। সুতরাং এত শত প্রমাণ ছিটিয়ে রেখে আমি আপনাকে খুন করবো, আমাকে অত বোকা ভাবা আপনার উচিত হয় নি।"

দুটো গ্লাসে ওয়াইন ঢাললে সুদেষ্ণা। চড়বড় করে একটা শব্দ হ'ল। আলোটা কাঁপলো একবার। সেই মথটা চিমনির চোং দিয়ে ঢুকে প'ড়ে পুড়ে মরলো।

পলাশ পকেট থেকে একটা দোমড়ানো কাগজ বার ক'রে সুদেষ্ণার দিকে এগিয়ে ধ'রে বললে, "এই নিন আপনার চিঠি ?"

সুদেষ্ণা হাসতে পারলে। হাত বাড়িয়ে নিলে না চিঠিটা বটে, বললে, "এই তো স্বাভাবিক হয়েছেন আবার। প্রমাণ নষ্ট ক'রে, সাহস আছে প্রমাণ করলেন।"

"—আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আপনি বিশ্বাস করলে সুখী হব। আমাদের ভুলের জন্য যাদের প্রাণ গিয়েছে, তাদের মধ্যে আমাদের নিজেদের অনেক তরুণ বন্ধু ছিল। আমরা সকলেই তাদের জন্য দুঃখিত। জানেন তারা অনেকে পুলিসের গুলিতে মরেছে, খাঁচায় আটকানো থেঁতলানো ইঁদুরের মতো জেলখানায় মরেছে, ফাঁসিতেও মরেছে কেউ-কেউ। আমাদের দলের যারা শিকার হয়েছিল, ব্যক্তিগতভাবে, মানে দলগতভাবে না হলেও, আমি তাদের জন্যও আন্তরিক দুঃখিত। আমাদের দলের মৃত তরুণদের বাবা-মা আত্মীয়-স্বজনের কাছে দুঃখ জানানোর সুযোগ হয়, কারণ তাঁদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। বরং আপনাদের মতো যাঁরা, যাঁদের প্রিয়জন আমাদের অ্যাকশনের লক্ষ্য ছিল, তাঁদের কাছে দুঃখ জানানোর সুযোগ হয় না। আপনার চিঠি আমাকে সেইরকম দুঃখ-জানানোর এক দুর্লভ সুযোগ এনে দিয়েছে।"

সত্যই অবাক লাগলো সুদেষ্ণার। সে ভাবলে—এ সত্যি হয় ? বললে, "আমি স্বীকার করছি, আপনার সাহস আছে।" হাসলো সে, বললে "আবার চিঠিটা ফেরৎ দেয়া ব'লেই নয়, একটা চিঠির ডাকে শত্রু পুরীর মধ্যে ঢুকে পড়া সাহসের কথা বৈকি। অবশ্য, আমি লিখেছিলাম একেবারে একা পড়ে গিয়েছি। আসুন তা হ'লে এবার আমরা একটু ওয়াইন খেতে পারি। না, (সে হাসল আবার) এতেও বিষ নেই। আর তিন-চার গ্লাস না খেলে নেশাও হয় না। আজকের এই তিথিতে এই সিডকেক আর রেডওয়াইন আমাদের বরাদ্দ ছিল। দাদা খুব খেতেন। ওর ঠোঁট রাঙা হয়ে যেত। একবার তো গ্লাস মুখের কাছে ধ'রে হাসতে গিয়ে, মদ চলকে ফেলে সাদা সিল্কের নতুন শার্ট, ট্রাউজার্সে যেন রক্ত মাখামাখি। এটাকে আমরা দাদার ইউক্যারিস্ট বলতাম।"

পলাশ বললে, "বেশ, একটু সিডকেক আর এক চুমুক রেডওয়াইন খেলে যদি আপনার সব স্বাভাবিক হয়েছে মনে হয়—"

সে একটা গ্লাস হাতে নিয়ে একটুখানি মদ ঢেলে নিলে।

কিন্তু একেবারে অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল সুদেষ্ণা। আশ্চর্য. সে তো আগেই শুনেছে, কিন্তু মিলিয়ে দেখেনি। ইউক্যারিস্টের রুটি আর মদকে ক্রাইস্টের মাংস এবং রক্ত কল্পনা করা হয় নাকি? তা যদি সত্যি হয়, মহতের বীরের সুস্থ-দেহীর রক্ত-মাংস খেয়ে তার মহত্ত্ব, শৌর্য, শক্তিকে নিজস্ব করার আদিম সঙ্কল্পের রেশ এই

ভ্যধর্মেও থেকে গেছে নাকি ? আর এ সবই রক্ত এক দারুণ রহস্য ব'লে ? দিনের রিদিকে যখন উগ্রতা আর দৈন্য, মানুষ তখন রক্তপাতের রহস্যময় ব্রত পালন ক'রে নি থেকে উত্তীর্ণ হতে চায়।

সে বললে, "কিছু বললেন ?"

"এই তো আপনার রেডওয়াইন খেলাম।"

সুদেষ্ণা হাসলো। বললে, "আর ওতে আপনার—ক্ষতিও করবে না। ভেবে দেখলাম ডোম্বি কালীর আসল প্রসাদ তো নরকপালে রাখা কারণ। সেটা তো দেশী দ, যাতে প্রায় সবটাই এলকোহল। শুনেছি কালীর বেদির নীচে পাশাপাশি পাঁচটা নরকপাল সাজানো থাকে সেই মদে বোঝাই। এখন হয় তো আপনি খান না আর, কিন্তু ছোটবেলায় ঘোষালদের দৌহিত্র হিসাবে প্রসাদ হিসাবে দু-চার চামচ প্রায়ই খেতে হ'ত। তাই নয় ?"

পলাশ কিছু বলতে গেল। কুকুরটা বাদ সাধলে। তার ডাকে দুজনেই চমকে উঠলো যেন। এতক্ষণ তো তবু দরজার পাল্লার আড়াল ছিল। এবার যেন কানের গোড়ায় সেই দারুণ কাঁপা ঘড়িপেটা ডাক। সুদেষ্ণা দেখলে, ফ্রেঞ্চ উইনডো দিয়ে আলো প'ড়ে ন্যাড়া বাগানে যে আলোর সামন্তরিক তৈরি করেছে, তাদের সেই গ্রেটডেনটা সেই সামন্তরিকের প্রান্তে নাক রেখে কিছু শুঁকছে, আর মাঝে-মাঝে মুখ তুলে গরগর করছে।

পলাশ বললে, "তা খেতে হ'ত, কিন্তু—"

সে তার কথা শেষ করতে পারলে না। পট-পট করে দ্রুত শব্দ হ'ল। ফ্রেঞ্চ উইনডোটা দিয়ে গ্রেটডেন ঘরে ঢুকল। ভঙ্গিটা এই রকম, যেন সে একটা সিংহ, আর তাকে খাঁচা থেকে সার্কাসের এরেনায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সেটা সুদেষ্ণার দিকে ছুটে গেল, কিন্তু মাঝ পথে থেমে, পলাশের দিকে ফিরে, ঘরঘর, ক'রে ডেকে জিভ বার ক'রে, হাঁ ক'রে মাথা দুলিয়ে অস্থির হ'য়ে উঠল।

পলাশ ন'ড়ে উঠলো। ভাব দেখে মনে হ'ল, সে চেয়ারে উঠে দাঁড়াতে চাচ্ছে। কিন্তু একেবারে মরার মতো মুখ ক'রে ব'সে রইল, দুহাতে চেয়ারের হাতল চেপে ধরে। কুকুরটা আরো এগিয়ে গেল। সামনের দু পা পলাশের গায়ের উপরে তুলে দেয়ার চেষ্টা করতেই, সুদেষ্ণা উঠে তার কলার চেপে ধ'রে বেশ জোর দিয়ে তাকে সরিয়ে আনলে।

কিছু একটা বলা দরকার মনে ক'রে পলাশ বললে, "মস্ত কুকুর।"

সুদেষ্ণা কিন্তু গম্ভীর গলায় কুকুরটাকে ধমকাল, গো আউট, অ্যাণ্ড ডোণ্ট বি এ ডগ। সে কুকুরটার কলার ধ'রে টেনে নিয়ে উইনডো দিয়ে বার ক'রে দিলে। উইনডোটাকে বন্ধ ক'রে দিলে।

পলাশের মুখের ভিতরটাও শুকিয়ে উঠেছিল। তা গোপন করতেই যেন সে বললে, "ওকি আপনার ইংরেজি গাল বোঝে ?"

"রাগের আর বিরক্তির সুর ধরতে পারে। কিন্তু আমরা যেন কী বলছিলাম ?"

"ও সেই নরকপালে রাখা দেশী মদ খাওয়া। শুনেছি কখনো কখনো তাকে মেজেণ্টা দিয়ে লালও করা হয়।"

পলাশ বললে, "আমি ঠিক জানি না। তবে নরকপাল আর মদ সত্যি। খুব যারা বেশি ভক্ত তারাই ঐ প্রসাদ নেয় শুনেছি।"

সুদেষ্ণা হাসতে পারলে। বললে, "আপনি কি ভেবে দেখেছেন সেই কারণ রক্তের প্রতীক।"

"তা হ'লে তো বলতে হয়," পলাশ বললে, "কেউ অসুখ সারাতে, কেউ টাকা-পয়সা রোজগার করবে ব'লে, কেউ-বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য রক্ত পান করতে চায় ?"

"তাই মনে হয় না ? অদ্ভুত! সেই কবে থেকে মানুষ রক্ত, এই রহস্যময় জিনিসটাকে, নিয়ে কত রকমের ব্রত করছে। আর একটু দিই রেডওয়াইন পলাশকে ?"

"না। এবার বলুন, আপনার কি দরকার ছিল, কেন ডেকেছিলেন।" সুদেষ্ণা বললে, "কুকুরকে আপনার এত ভয়। শুনেছি নেপোলিয়ন নাকি বেড়ালকে ভয় পেতেন। নাকি সে রোবসপীয়র ? নাকি আপনার সেই গল্পটা মনে পড়েছে, যাতে এক খুনীকে এক বৃদ্ধা তার কুকুর দিয়ে খুন করিয়েছিল।"

পলাশ বললে, "সাড়ে সাতটা বাজলো।"

"তা হ'ল। আমি আপনার কাছে ডোম্বি কালীর কথা শুনব ভেবেছিলাম। শনিবারে আমার ভাই সুকুমার বলছিল, তাতেই আমার আগ্রহ বেড়েছে। করালী-কিঙ্কর, মানে আপনার দাদামশায়, নরবলি দিয়েছিলেন। রক্তে নাকি মন্দির ঘরের মেঝে ভেসেছিল। তারপরে সেই বলি দেয়া পুরুষটার শবে ব'সে সাধনা ক'রে সিদ্ধ হ'তে চলেছিলেন।"

"এ সব ব্যাপারে আমি ঠিক খবর আপনাকে দিতে পারব না।"

"আমি শুনেছি," বললে সুদেষ্ণা, "আপনার দাদামশাই যখন সিদ্ধিলাভ করছেন, ঠিক সেই সময়েই আপনার মায়ের জন্ম। তিনিও কি সিদ্ধাই কিছু পেয়েছেন মনে হয় ? জানেন কিছু ? কেউ-কেউ নাকি তাঁর কাছে মন্ত্র নিতে যায় ?"

"এই কি আপনার কাজের কথা ?" পলাশ বললে। সে যেন কিছু বিরক্ত।

সুদেষ্ণা বললে, "আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রে যা জানব ভেবেছিলাম, এই কিছুক্ষণ আগে, ইউক্যারিষ্টের গল্প বলার সময়ে নিজেই বুঝতে পেরেছি। এখন বরং একটা মজার কথা মনে হচ্ছে। আপনার দাদামশাই, কিন্তু, নিজের রক্তসম্বন্ধীয় ব্রতকে ভুল বলেন নি, ভুল ব'লে পার পাননি। কত ভালো ছিল, যদি ভুল স্বীকার করতেন।"

পলাশ প্লেট আর গ্লাস সরিয়ে রাখলে।

সুদেষ্ণা বললে, "ভালো হ'ত না? দেখুন সকলেই জানে, করালীকিঙ্করের াসির পরই ঘোষালরা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। তার অকাল মৃত্যু না হ'লে, াপনার মায়ের জীবন অন্য-রকমের হ'তো। তার নিশ্চয়ই কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত সচ্ছল রে বিয়ে হ'তো। পূর্ববঙ্গের এক গ্রামের এক স্কুল মাস্টারের সঙ্গে বিবাহ হ'তো । ফলে আপনার জীবনও অন্য ধারায় বইতো। হয়তো এতদিনে আপনি লেতে যেতে পারতেন এম-আর-সি-পি হ'তে। আপনারা উদ্বাস্তু হ'য়ে এদেশে াসতেন না। সব সময়ে মনে করতে হ'তো না, আপনারা স্বাধীনতার সুফল থেকে ঞ্চিত হচ্ছেন।"

পলাশ বললে, "কী হ'তে পারতো তা নিয়ে কল্পনা ক'রে এখন লাভ নেই, তা াপনি নিজেই জানেন। তা হ'লে আমাকে দিয়ে আর দরকার নেই।"

সুদেষ্ণা বললে, "আপনি আমার কথায় মূল্য দিচ্ছেন না। কিন্তু ভেবে দেখুন। াপনার কি মনে আছে, হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করার পর আপনি ও আপনার াবা ডাক্তারি পড়ার খরচ ঋণ করতে এসেছিলেন এ বাড়িতে? কিন্তু অপমান বোধ রে ফিরে গিয়েছিলেন?"

"একথা এখন তুলে লাভ নেই।" এই ব'লে পলাশ উঠে দাঁড়াল।

সুদেষ্ণাও উঠলো। সে বললে, "তা ছাড়া আপনি কি আর সে সব গল্পও শানেন নি যে, করালীকিঙ্করের বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল, তারা সবাই প্রায় -বাড়ির আশ্রয়ের ভরসায় তা দিয়েছিল।"

পলাশ বললে, "আপনি কী বলতে চাইছেন, তা ঠিক ধরতে পারছি না।" সে াসল, আবার বললে, "দাদামশায়ের রক্ত সম্বন্ধে এক রহস্যময় আকর্ষণ ছিল আমি সটা পেয়েছি কিনা, আশৈশব ঘোষরা আমাদের অর্থাৎ ঘোষালদের সঙ্গে শত্রুতা করছে, তাদের কাছে ঠকেছি, হেরেছি, এই সবই আমার মনে কাজ করে—এই কি বাঝাতে চাইছেন?"

সুদেষ্ণা খিল খিল করে হেসে উঠলো। যেন তাতে ঘরের আলোটা ছলকে উঠলো। তারপর সে হাতের পিঠ ঠোঁটের উপর রেখে হাই তুললে। বললে, "আচ্ছা পলাশবাবু, আপনি কি কোন সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে আপনার মনের মাটির নীচেকার ঘরগুলোর খোঁজ-খবর নিয়েছেন?"

পলাশ কী বলবে, কিছু বলবে কিনা, তা নিয়ে দ্বিধায় দুলতে লাগলো। অবশেষে—তারা তখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সে বললে, "আপনাকে সিডকেক আর রেডওয়াইনের জন্য ধন্যবাদ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমাকে অংশ নিতে বলেছিলেন, এ জন্যও বোধহয় ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু আপনাকে জানাতে চাই সে সব অপচয়ের জন্য আমরা, অন্তত আমি, সত্যি দুঃখিত।"

সুদেষ্ণাই খুলে দিলে উইনডোটা। পলাশ সেই আলোর সামন্তরিকে নেমে গেল।

সুদেষ্ণা একটা পাল্লা চেপে ধরলে। কি অসহায় নিঃশেষিত মনে হচ্ছে নিজেকে! আবার হাই তুললো। কিছু একটা যেন তার বুকের নীচে থেকে উঠে আসছে। সে যে এক টুকরো সিডকেক, আর এক চুমুক রেডওয়াইন খেয়েছে তা যেন একটা দারুণ বমির আকার নিয়ে উঠে আসছে। বরং তার ইস্পাতনীল ম্যাসকারা করা দু চোখ ভ'রে গেল জলে। সে অবসন্নের মতো পাল্লাটায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। ভাবতে চেষ্টা করলে, কখনো প্রতীকরূপে, কখনো প্রত্যক্ষভাবে, মানুষের রক্তকে এখনো আমরা সকলেই কি নিজের চারিদিকের দীনতা, ঊষরতা, গ্লানিকে দূর করার উপায় বলে মনে করি?

কিন্তু সে একটা চাপা গর-গর শব্দ শুনতে পেল। সে বাইরের দিকে চাইলো। একটা পট-পট শব্দ, আর একটা ধুপ-ধুপ শব্দ হচ্ছে। যেন ধুপ-ধুপ শব্দটার পিছনে ঐ পট-পট শব্দটা তেড়ে চলেছে। সে এবার বাইরের অস্পষ্ট আলোতে দেখতে পেলে, একটু ঝুঁকে দাঁড়ানো মাত্র, কেউ দৌড়চ্ছে আর তার পিছনে গ্রেটডেনটা ছুটে চলেছে বাগানের শেষ সীমার কাছাকাছি।

সুদেষ্ণা মন্তব্য করলে, কাউয়ার্ড! সে কি হাসবে এই কেলেঙ্কারিতে? কিন্তু তাকে তাড়াতাড়ি ক'রে ফ্রেঞ্চ উইনডোর দুটো পাল্লাই বন্ধ ক'রে দিতে হ'ল। কারণ একটা আর্ত রবে আকৃষ্ট হ'য়ে সে দেখে ফেলেছে কুকুরটা মানুষটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে বুকের উপরে চেপে বসেছে। মানুষটা লুটিয়ে, গড়িয়ে, ছটফট ক'রে, হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে কুকুরটাকে সরাতে চেষ্টা করছে। একটা অর্ধস্ফুট আর্তনাদ যেন মাঝ পথে গলার মধ্যে ডুবে গেল। পশু যে দেহকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে ফেলে তা দেখতে শুধু বীভৎস নয়, কুৎসিতও। সুদেষ্ণা উইনডো ছিটকানি তুলে আটকে তাড়াতাড়ি স'রে এল।

'সবই পুরনো বিদেশী গল্প।'

বেতাগ, বাইতোড়, সরসুনা প্রভৃতি

এটা এক অসমাপ্ত উপন্যাসের প্রথম অংশ যা আমাকে সুমিত ভট্ট দিয়েছিল। সে আশা করেছিল, হয়তো এডিট করে কিছু করা সম্ভব। কাঁচা হাতের লেখা, জীবনের প্রথম উপন্যাস. যা সুমিত ভট্টর মেয়ে, এখন তো বুঝতেই পারছি, লিখতে আরম্ভ করেছিল, হয়তো মাস তিনেক মাত্র সময় পেয়েছিল লিখতে। তার নিজের কথাই ডায়েরির মতো ব্যাপারই, আর সেই সময়ে লেখা, যখন নিজের জীবনের তুচ্ছ ঘটনাও নিজের কাছে দারুণ মূল্যবান বলে মনে হয়। কিন্তু উত্তম পুরুষের বর্ণনা নয়। বরং রাখী নামা একটা মেয়েকে মাঝখানে রেখে সদু, সুহাস, মুকুল প্রভৃতির কথা লেখা। পড়তে পড়তে মনে হয় বেতাগ, বাইতোড়, সরসুনা, এমন-কি খড়দ রাখীর বুকের মধ্যে উষ্ণ হয়েছিল। কিন্তু কি করে রাখী তাদের সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ-প্রায় হল তা বলা হয়নি। ধরে নিতে হয়, সদুরা কোনো-না-কোনো সময়ে হয়তো তাকে কিছু বলে থাকবে। তারা যে বলতে চেয়েছে এটা তাদের চরিত্রের ডেভেলপমেণ্ট। কিছু বলতে এসেই কি সব কথা বলা যায়? সুতরাং রাখী-নামা সেই চরিত্রের অসাধারণ বুঝবার, অনুভব করার, আন্দাজ করে নেয়ার দক্ষতা ছিল এইরকম ধরে নিতে হবে।

আমাকে এ জন্য বলা যে সুমিত আশা করেছিল, রাখী নামা সেই মেয়েটির ডায়েরি হয়তোবা আমি পুলিসের হেপাজত থেকে পড়ে নিতে পারবো। তাদের যা প্রমাণ করার তা তো করেছেই। সুমিত ভট্টর আশা পূর্ণ করা সম্ভব নয়; ওরা নিজেরাই তো অর্ধসমাপ্ত, ওদের নিয়ে সমাপ্ত উপন্যাস হয় না। সেই অর্ধসমাপ্ত উপন্যাস এইরকম :

প্রথম পরিচ্ছেদ। বেতাগ।

সুমিত ভট্ট (৪৫)। পূর্ব নিবাস বেতাগ (ঢাকা)। ১৮ বছর থেকে ২২ বছর কলকাতায় ছাত্রাবস্থা। ২২-২৭ ঢাকায় প্র্যাকটিস্; ২৭ বছরে (১৯৪৮) দেশত্যাগ। ২৮ থেকে কলকাতায় প্র্যাকটিস্। ১৭/১৮ বছর বাগবাজার গলির

এই পুরনো তিন কামরার দোতলায়। অ্যাডভোকেট। মাসিক আয় আট-নশো। বাড়িভাড়া দুশো। হলুদ, ফোলা-ফোলা চেহারা, ভিটামিনের অভাব। ধুলো-ঢাকা, হলুদ-হওয়া পুরনো ব্রীফ, মেয়েরা আবিষ্কার করেছে তার মধ্যে ঢাকা কোর্টেরও আছে। কাঠের পার্টিশন দিয়ে বড় ঘরটা থেকে কেটে নেয়া বাইরের দিকের অংশে কাঠের র‍্যাকে কিছু পুরনো বই। কয়েকটা বই-এর চামড়া তো বয়সে কালো। পুরনো বইয়ের দোকান থেকে কেনা। বোধহয় সে-সব ল' রিপোর্ট এখন অকেজো। এখন আর বই কেনা হয় না। সুমিত এ ঘরে বসেনও না। বাগবাজারের এই গলিতে গত দশ বছরে ক্লায়েণ্ট আসে নি। ঘরটা এখন তাঁর দুই মেয়ে ললিতা আর রুক্মিণীর দখলে। এ ঘরে মেয়েরা পড়ে, এই ঘরে তারা একটা জানলা আবিষ্কার করেছে যার তলার অংশটাকে (কাঠের সেটাও) খুলে দেয়াতে একটা ফ্রেঞ্চ উইনডোর মতো ব্যাপার হয়েছে। পাশের বাড়ি আর তাদের সেই ঘরের মধ্যে যে তিন ফুট ব্যবধান, তা দিয়ে সকালের দিকে ঘণ্টা দু এক আলো, এমন-কি বছরের কোনো কোনো সময়ে রোদ আসে। তা ছাড়া উনুনে আঁচ দিলে যে ধোঁয়া অন্য-সব ঘরগুলোর মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, দেয়ালগুলো বাদামী করে, তাও এ ঘরে কম।

মেয়ে দুটির নাম ললিতা ও রাখী। ললিতা, ফরসা, লম্বা, ছিমছাম। তা এক রকমের রূপ আছে। ২০। বি. এ. পার্ট ওয়ান দেবে। রাখীরও পোশাকী নাম আছে। তা থাক। সে ১৮, শ্যামলা, একটু লম্বাই বোধ হয়, অন্যের চোখে চপলা। বি. এ-তে ভর্তি হয়েছে। বাড়িতে এখনও ফ্রক পরে। কলেজের জন্য শাড়ি কিনতে হচ্ছে। শাড়ি মানে ব্লাউজ, ব্রা. পেটিকোট। এমন-কি দুগাছা বালাও, যা মায়ের একটা হার ভেঙে তৈরি করাতে হয়েছে। যার ডায়মনকাটা গা থেকে আলো ঝলকায়, যদিও তা স্বাতীর পাথর বসানো বালার চাইতে কম, কিন্তু কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিও যেন তার, যা তাদের মা কমলার হতে পারে। তাদের মা কমলা (৩৯), রোগাটে, শ্যামলী, এখনও ব্রাহ্মিকা খোঁপা বাঁধেন।

রাখী স্থির করলে, বাবার জন্মদিনে বাবা-মা বেড়াতে যাবে। দিদিটা কি বোকা! 'আচ্ছা, দিদি, ওঁদের কথা বলতে ইচ্ছা করে না ? আমাদের কথা না ভেবে শুধু নিজেদের কথা ? কি এমন বয়স হয়েছে, বল।' ললিতা সুমিতের জুতো ব্রাশ করতে বসে। রাখী নিজে পারে না, মাকে দিয়ে বাবার একটা ধোয়া শার্টের কাপ্ সংস্কার করায়।

কিন্তু যাওয়া হল না। কারণ কমলার বাইরে যাওয়ার মতো, বয়স অনুযায়ী শাদা, অথচ ভালো শাড়ি নেই। যা আছে তা দশ বছরের পুরনো রঙিন সিল্ক, যা থেকে ন্যাপথালিনের গন্ধ ছাড়ে। কমলা বললেন, 'তোমার বাবাকে আমি অপমান করতে পারি না।' রাখী রেগে বলতেন 'রাখো, এ যদি তোমাদের ব্রাহ্ম কায়দা না হয়ে থাকে—'

শেষ পর্যন্ত রাখী বাবা সুমিতকে নিয়ে বার হল। কমলা বললেন, 'জ্যাঠামি।'

কমলা বিরক্ত হলেন। নিজের দোষে আর একটা চান্স হারিয়ে কি? ভাবলেন : সব সময়েই মেয়েটা আগ বাড়িয়ে বাপকে আড়াল করবে। বড় হয়েছে। এখন অত বাপসোহাগী হওয়া কি ভালো?

(এখানে প্রশ্ন, রাখী কি করে বুঝল কমলার মনে কি হচ্ছে? নিছক কল্পনা যা সে আধুনিক কোনো মনস্তত্ত্ববিশারদ ঔপন্যাসিকের ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ থেকে সংগ্রহ করেছে? কিংবা এটা তার সেই অত্যন্ত সহানুভূতিপ্রবণ মনের সেই ক্ষমতা যাতে সে মুখ দেখে মনের কথা বোঝে?)

ললিতা বই হাতে নিয়ে প্রফেসরের কাছে যাবে। দয়া করে প্রফেসর তাকে ইংরেজি সাহিত্য-পাঠে সন্ধ্যার পরে সাহায্য করবেন বলেছেন। ফিরতে রাত আটটা হবে। সাতটা-আটটা এই সময়েই প্রফেসরকে একা পাওয়া যায়। খেয়ে যেতে হয় তা হলে। ভেবে ভেবে কমলা বললেন, 'রাতের জন্য আলুসিদ্ধ আছে. খেয়ে যা তা হলে তাই।' ললিতা না খেয়ে চলে গেল।

কমলার আবার রাগ হচ্ছে। উনানে আঁচ দেয়ায় ধোঁয়া এখন। মাথা টিপ্ টিপ্ করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চুল বাঁধলেন আজ। আর মেয়েরা কেউ নেই এ সুযোগে, ধোঁয়া কমে গেলে, একটু দুধের সর গালে মেখে জল দিয়ে মুখ ধুলেন। কমলার চোখ ভিজে উঠল আবার। বিনষ্ট যৌবন। এখন এক পো দালদার সাহায্যে জন্মদিনের লুচি ভাজতে হবে। দুটি সন্দেশ আনিয়েছেন। না আনিয়ে উপায় ছিল না। দুই মেয়েই ঝগড়া করত। তাদের বাপের জন্মদিন। কমলা মনে মনে বললেন, কিন্তু তোদের মুখে না দিয়ে খাবে কি করে? বোধ হয় তিন-চার মাস আগে এক হালখাতা উপলক্ষে একটা করে রসগোল্লা খেয়েছিল তার মেয়েরা। কমলা ভয় পেয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। কেউ শুনে ফেলে নি তো তার চিন্তা? মেয়েটাও, দেখ, জেদ করে ফ্রক পরে বার হল।

রাখী আর সুমিত কলেজ স্কোয়ারে এসেছিল। কেন? জন্মদিনে কি কেউ এক আশার দেশে ফিরে যেতে চায়? রাখী ট্রাম থেকে নেমে বললে, কী, বাবা?' সুমিত ভট্ট বললেন, 'কলেজ স্কোয়ার। দীঘিটার কি নাম হয়েছে এখন কে জানে। চারিদিকের দোকান পুকুরটাকে ঘিরে ফেলেছে। আমাদের সময়ে খুব সাঁতার হত। হয়তো এখনও কেউ কেউ। বিদ্যেসাগরের গলা কাটা হয়েছে। ওদিক দিয়ে গেলে ইউনিভার্সিটি ল কলেজ।' সুমিতের মুখ দেখে বোঝা যায় তিনি ভয় পাচ্ছেন। রাখী ভাবলে, কেউ যদি অ্যাডভোকেট হিসাবে আশানুরূপ সার্থকতা না পেয়ে থাকে, তবে মুখটাকে নিশ্বাস নিতে না পারার মতো দেখাবে কেন। সুমিত বললেন, 'এর চাইতে হেদো ভালো।' রাখী তখন ভাবলে, সুমিত ঢাকা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন পড়তে, স্কটিশে পড়েছিলেন। ডাকাবুকো সেই সুমিত, দুরন্ত তেজ আর আশা। রাখী এইরকম আবিষ্কার করলে : ল কলেজের পরে ব্যর্থতা।

স্কটিশের পরে ল কলেজের তখনও অনির্বাপিত আশা। সেজন্য হয়ত সুমিতের স্মৃতিতে স্কটিশ এখনও উষ্ণ। সুমিত ভাবলেন, ল-এর রেজাল্ট বরং ভালো, কিন্তু তার পরে ব্যর্থতা বলেই বি. এ.-র রেজাল্ট বরং তুলনায় খারাপ হলেও ভালো লাগে। যেমন যেন রাখী। ললিতার তুলনায় কম উজ্জ্বল হলেও। ললিতার কি দোষ? টিবির মতো হতে পারে। যৌবনে শরীর যত বাড়তে থাকে তত নাকি সেটা প্রকাশ পায়। হয়তো এতদিনে ধরা পড়বে আমরা বি-ক্লাস। রাখীর কিন্তু গর্ব বাবাকে নিয়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। বাইতোড়।

হেদোয় যাওয়া হয় না। হ'লে ক্লান্তিই হত। পথে সেই মন্দিরটা পড়ল। একেবারে নতুন। এখনও একদিকে রাজমিস্ত্রীর ভাড়া বাঁধা। দেখ, রাস্তা বেদখল করে মন্দির উঠছে, উঠে গেছে। গাছ ছিল বটে ওখানে একটা। তাকে ঘিরে দিয়েই মন্দির। দেয়ালে ভাস্কর্য। মোটেই নয়। কাছে গিয়ে রাখী দেখলে, রাজমিস্ত্রীর কাজ, মোটা মোটা গোব্দা। ওটা তো হনুমান, কিন্তু মুখটা বিড়াল হয়েছে। পথচারীদের ফুটপাত ছেড়ে পথে নামতে হচ্ছে। মন্দিরের কাছে ফুটপাতে ফুল, মালা, ফলমূল, বাতাসার ডালা নিয়ে বসেছে হকাররা।

রাখী বললে, 'নতুন মন্দির, চলো না।'

ভিড়ের মধ্যে মন্দিরের বারান্দায় গিয়েছিল তারা। বারান্দায় একপাশে কালো পাথরের তৈরি এক হনুমান। তার কাছে একজন প্রৌঢ়। ৬০ হবে। শ্যামল রঙ, কাঁচাপাকা চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ, সোনার হার, পৈতা, পরনে কেঠো। 'বাইতোড়ে' এই শব্দটা শুনে সুমিত প্রৌঢ়ের গল্প শুনতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মন্দিরের ভিতরে স্বর্ণসীতা। মূর্তির স্টাইল মিউজিয়ামের পুরনো মূর্তির মতো। সিল্কের শাড়ি। বাজনাতেও নতুনত্ব আছে—বাঁশি, চোঙ, করতাল, মালগুঞ্জি বাজছে। ছন্দটা একক নাচের।

গল্পটা ফেরার পথে সুমিত বলেছিলেন রাখীকে। এসেছে কানন চৌধুরী, বাইতোড় থেকে এই স্বর্ণসীতা বুকে নিয়ে। সপ্তদশ শতকের এই মূর্তি। চন্দ্রাবতী নামে এক মহিলা কবি এঁ'র প্রথম পূজারী। তারপর বাইতোড়ের চৌধুরীরা বংশানুক্রমে পূজা করে চলেছে। হ্যাঁ, এর মন্ত্র আলাদা। লক্ষ্মীর মন্ত্র নয়। সব চাইতে বড় পূজা সীতা নবমীতে। বছরে তিনদিন পূজা হয় না। মা লক্ষ্মীরা বুঝতেই পারছেন। পূজা কি বন্ধ আর? ভোগরাগ চলে না। এঁ'র এই এক প্রথা, স্ত্রীরা সকালে একে স্নান করান, বস্ত্র পরান। পুরোহিত স্নান করান না। ওটা আমাদের পরিবারে নিষিদ্ধ, তা বোধ হয় ঊনবিংশ শতক থেকে। পূজারীর স্ত্রী পুত্রবধূকে বলে দেয়, সে আবার তার পুত্রবধূকে। এইভাবেই চলে আসছে। জাগ্রতা বৈকি, এই প্রথা থেকেই প্রমাণ হয় না? দেখুন না মূর্তি। বেদির নীচে রামচন্দ্র এখানকার

তৈরি। শ্রীবাস্তবজি উপহার দিয়েছেন। এখন রামচন্দ্র আর মহাবীরজির পূজাও হচ্ছে। বেদীর নীচে এইজন্য—আপনাদের মনে নেই সেই শিশির ভাদুরীর গলা ? শিল্পী পারিবে না মাতা, নিজে আমি স্বর্ণসীতা করিব নির্মাণ। একজন শ্রোত্রী চোখ মুছলেন, দু একজন উলু দিয়ে উঠল। বোঝা যাচ্ছে এরা সবাই পদ্মার ওপারের লোক। কানন চৌধুরী বললে, এই মূর্তি রক্ষা করতে গিয়ে তার বড় ছেলে, বাইশ বছরের ছেলে অভীক প্রাণ দিয়েছে। সে বলেছিল : বাবা, তোমরা মূর্তি নিয়ে পালাও, আমি মন্দিরের দরজায় ওদের ঠেকিয়ে রাখি। সুমিতের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। বেতাগ বাইতোড় জোড়া নামের মতো উচ্চারিত হত। তখন তাঁর তের বছর। বাইতোড় গিয়েছিলেন। কিন্তু মন্দির কি দেখেছিলেন ?

কিন্তু ততক্ষণে রাখী মূর্তির স্টাইল দেখছে দরজার কাজে কার্ফার ছন্দে মাল-গুঞ্জি শুনছে। ভেট রাখছে লোকে। একটি যুবক, দে'হারা, গলায় মোটা সাদা পৈতা, পরনে চাঁপা সিল্ক, আলো নাচিয়ে আরতি করছে। আলোর নাচন এমনি ভালো লাগে। আর তা যদি বাঁশির সুরে হয় ! এমন সুন্দর ! স্বর্ণসীতা, দুঃখিনী সীতা, সে পূজা পায়, আশ্চর্য তো ! রাখী অনুভব করলে, তা হলে দুঃখ পূজা পাওয়ার মতো হতে পারে ! কি আশ্চর্য, তা হলে কলেজে 'আমি সুখী, আমার আছে,' এই অভিনয় না করলে হয় ?

আরতি শেষ হল। আবার উলু। রাখী তো চমকেই উঠল। যারা ভেট এনেছিল তারা নিয়ে যাচ্ছে। সেই আরতিওয়ালা যুবকেরই কাজ সেটা। সে একটা বড় পাত্রে ভেটের থেকে কিছু তুলে রেখে রেখে, ভেটের থালা রেকাবি দিয়ে দিচ্ছে পূজার্থিনী-দের। ঝন ঝনাৎ করে একটা পুষ্পপাত্রে টাকা আধুলি সিকি পড়ছে দক্ষিণার। অবাক হয়ে দেখছিল রাখী। সেই যুবক কখনও নাম জিজ্ঞাসা করে ভেটের পাত্র আনছে, চেনা পার্টি হলে মুখ দেখেই এনে দিচ্ছে। কাজেই স্ত্রীলোকদের মুখের উপরে নিঃসংকোচে চোখ বুলচ্ছে সে। দু একবার রাখীর মুখের উপরেও চোখ বুলাল। একবার তো রাখীকে জিজ্ঞাসাই করলে, আপনার নাম ? রাখী মাথা নাড়লে এই বোঝাতে, যে সে ভেটদাত্রীদের একজন নয়। কিন্তু অবাক করলে পূজারী। বেশ একটা বড় বাদামী কাগজের ঠোঙায় কয়েকটা আস্ত আপেল, শসা প্রভৃতি ফল, আর একটা মাঝারি নতুন ঠোঙায় ছানা সন্দেশ এসব ভরে রাখীর হাতে দিয়ে বললে, ধরুন। তার মুখটা যেন চকিতে লাল হল।

কী করবে ? ফেলে দেবে ? পালানো ভালো ? রাখী প্রায় দৌড়ে সুমিতের কাছে এল। ফেরার পথে মনে হল রাখীর, ছেলেটিকে কি সে চেনে ? তার এই লজ্জাও হল, হাঁটু দেখানো ফ্রক পরা উচিত হয়নি তার। শাড়িতে তবু বুক ঢাকা থাকে, গড়ন ধরা পড়ে না। ততক্ষণে সুমিত বাইতোড়ের স্বর্ণসীতার ইতিহাস বলছেন।

রাখী বললে, 'দুঃখকে মলিন না ভেবে পূজা করা হচ্ছে, তাই না বাবা ? সব

উদ্বাস্তু মানুষের, ব্যর্থ মানুষের প্রাণ পূজা পাচ্ছে, তাই না বাবা ? ভগবানকে তো আমরা নিজের মতো করে কল্পনা করি।' সুমিত ভাবলেন, বেশ ইনটেলিজেন্ট তার মেয়ে। রাখী ভাবলে, এখন থেকে সে আর মায়ের সঙ্গে ছলনা করবে না।

বাড়িতে কমলা অত ফল, অত ছানা, অত সন্দেশ দেখে অবাক। রাখী অভিনয় করে—'কেনা যায় না বুঝি ?' কমলা বললেন 'এত ছানা দিয়ে কি হবে ? দুশো তো হবেই।'

'তুমি যে ছানার ডালনার কথা বল। তাই কর। গরম মশলা এনে দিচ্ছি ধারে।'

কমলা খুশি হয়ে হাসিমুখে বলেন, 'তা হলে একটু দালদাও আনিস। সকলকেই লুচি করে দেব। একদিনই তো।'

কিন্তু তার পরই কমলা আসেন রান্নাঘর থেকে। ললিতা ফেরে নি, রাত আটটা হয়।

রাখী বললে, 'কেন ভয় পাও মা ?' প্রফেসর কি বাঘ যে তোমার মেয়েকে খেতে বসে আছে ? তার হয়ত দাঁত নেই, এমন বুড়ো।'

'অসভ্যের মতো কথা বোলো না, রাখী।'

'তুমি কেন সব পুরুষকে সন্দেহ করবে ?'

'কেন করি ? কেন করি ? আমার কপাল—।'

…এ কথা মনে করে, আর কমলার উপরে রাগ থাকে না রাখীর। কারণ শেষ কথাটা তো সব কথাতেই বলেন। আর দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে সব কমলার এই ছোট্ট কপালটায় লেখা আছে, ভাবলে রাখীর হাসি পায়ই। একেবারেই যেন আমাদের আর এক বোনই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। দুই বোন।

এটা রাখীর উপন্যাসের একটা দুর্বল অংশ। দুই বোনের ছবি অস্পষ্ট নয় কিন্তু তাদের পাশাপাশি কুমুদ বলাসী নামে যে এক অধ্যাপক সে আদৌ স্পষ্ট নয়। মনে হয় রাখীর এখানে সংকোচ হয়েছিল লিখতে। অনেক কথা ভাবা যায়, লেখা যায় না। কিংবা এমন একটা ঘৃণার ভাব দেখা দিয়েছিল, যে কুমুদের অতি প্রৌঢ়ের বালকোচিত যৌনতা আঁকতে তার ধৈর্য ছিল না। সে শুধু লিখেছে কুমুদ বলাসী রোগা। চিমসে, বা একই সঙ্গে নোংরা, দুর্বল এবং হাস্যকর তা…

খারাপ লিভারের দরুন হলুদ। তার ধারণা, এখনও সে যৌবনের মতো রমণী-মনোহর যদিও যৌবনেও তার চোখ দুটো ড্যাবডেবে এবং লোভাতুর থাকায়, নিমফো-ম্যানিয়াক ছাড়া কাউকে আকর্ষণ করেনি, এবং হয়তো টাকার জন্য স্বজাতীয়া ম্যাট্রিক পাস কালো মেয়েকে বিয়ে করার পর থেকে, কলেজের উচ্চবর্ণের শাণিতা মেয়েরা তার মনে এখনও অশান্তির কারণ, যে মনের কয়েক ইঞ্চি মাত্র দূরে তার

হৃৎপিণ্ড এমন গোলমেলে যে পেস-মেকার বসানোর কথা ভাবতে হচ্ছে।

এখন এই ঘর দুই বোনের। এক সময়ে সুমিতের ক্লায়েন্টরা বসবে বলে র‍্যাকে আইনের বই সাজিয়ে যে ঠাট, তা এখন নেই। সেই ধুলোর ময়লা পুরনো অকেজো ল' রিপোর্টগুলো তার র‍্যাকে এখনও আছে। কিন্তু সে-সব আসবাবকে ঘরের কোণে দেয়াল ঘেঁষে সরিয়ে দিয়ে মেঝেটা এখন দখল করেছে ললিতা আর রাখী। মাদুরের উপরে সতরঞ্জি আর বালিশ দিয়ে বিছানা পেতে ঘুমায়। সকালে সতরঞ্চি, বালিশ আর মশারি ভাঁজ করে চোখের আড়ালে সরিয়ে ফেলে দুই বোন পড়তে বসে। এ ব্যাপারে দুজনেই সিরিয়াস। তারা অল্প বয়সে এটা বুঝেছে, জীবন বলতে যদি আলো, বাতাস ইত্যাদি বোঝায়, তবে তা পাওয়ার একমাত্র উপায় পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশনের বেশি কিছু করা। তা হলেই বা কী হবে—এ রকম প্রশ্ন মনে ওঠে বটে কিন্তু এ পথে তবু আশা জোনাকির মতো জ্বলে।

সকালে মুখ হাত ধুয়ে এসে রাখী দেখলে, ললিতা তাদের বিছানা পাটি তুলেছে বটে, কিন্তু মাদুরের উপরে শুয়ে আছে। তার মুখটা বিবর্ণ। সে পড়তে বসে নি। কাল রাতে অনেকক্ষণ পড়েছিল ললিতা। 'কেমন? ক্লান্ত লাগছে তো, দাঁড়া চা নিয়ে আসি' বলে চা আনতে গেল রাখী। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা থালার উপরে এক বাটি মুড়ি আর দু-পেয়ালা চা নিয়ে ফিরল সে। 'আয় দিদি,' বলে সে চা নিয়ে মাদুরে বসল। চায়ে চুমুক দিয়েই সে মনে মনে বললে এখন মার এখানে না আসাই ভালো। অন্য দিনের মতো আজও দিদি মুড়ি খেতে চাইবে না, আজ তো তার উপরে ওকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সাত-আট দিন আগেকার সেই দৃশ্যটা ঘটতে পারে আবার। প্রথমে কমলা অনুযোগ, অনুরোধ করবেন, তার পরে লাটসাহেবের মেয়ে ভালো খাবারের কথা বাপকে বললেই হয়, বলে, শেষ পর্যন্ত দিদিকে কাঁদিয়ে নিজে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নেবেন। রাখী স্থির করে ফেললে, যদি তাই হয়, কমলা এলে আজ সে মুখ নিচু করে বসে থাকবে। সে বললে, 'দিদি একটু খা। জানি তোর ভালো লাগে না। তা হলেও।'

কিন্তু ললিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রাখী অনুভব করলে, এটা অন্য ব্যাপার, ক্লান্তি নয়। সে জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁ, দিদি, মাথা ধরেছে আজও? জানিস দিদি তোর চোখটা দেখাতে হয়।'

চা শেষ করে ললিতা, অভ্যাস বশে যেন, বই নিয়ে বসল। কিন্তু বই খুললে না। বরং আঁচলে ফুঁ দিয়ে চোখে ভাপ দিলে। রাখী বই আনলে না। সে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে, উঠে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে দুটো টব বার করে এনে, ঘরের মেঝেতে যেখানে রোদের একটা বৃত্ত পড়েছে সেখানে রাখলে। টবে দুটো ডালিয়া গাছ। টব দুটো মাটি সমেত ফুটপাত থেকে কেনা। কাটিং দুটোর একটা ইতিহাস আছে। বাগবাজারের সেই থামওয়ালা বাড়িটার খোলা ছাদে সারি সারি ডালিয়া আগের বছরে ফুটতে দেখেছিল তারা। এবার একদিন সেই বাড়িটার সামনে

দিয়ে যেতে যেতে রাখী বলেছিল, 'দিদি দেখ আজ এরা ফুল লাগাচ্ছে।' ললিতা বলেছিল, 'এরা বোধ হয় প্রাইজ পায় ফুলের জন্য।' এই সময়ে রাখী বলেছিল, 'দাঁড়া, দিদি।' সে অকুতোভয়ে সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে দেখেছিল টবে টবে কাটিং লাগানো হচ্ছে। তখন অবশ্য সে জানত না তাকে কাটিং বলে। মাঝবয়সী সুপুরুষ সেই ভদ্রলোক বোধ হয় প্রশংসা পেতে অভ্যস্ত। রাখীকে দেখে সেজন্য স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলেছিল। এমন-কি সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিংবা হয়তো তার নিজের টবে লাগানোর পক্ষে অনুপযুক্ত, সুতরাং ফেলে দেয়ার মতো কয়েকটা কাটিং রাখীকে দিতে রাজী হয়েছিল। রাখী তো হাসিমুখে তার দুরন্তপনা শেষ করে আবার কাটিং হাতে করে ফুটপাতে ললিতার কাছে এল। কিন্তু কাটিং লাগাবে কোথায় ? তিন চার দিন চেষ্টা করে ফুটপাত থেকে মাটি সমেত টব কেনা গিয়েছিল। ততদিন কাটিং দুটো লাগানো ছিল কমলার মাটি রাখার কাঠের বাক্সে। কিন্তু মরে নি। আলোর বৃত্তটায় রেখে রোদ খাইয়ে, জল খাইয়ে, রাখী বরং তাদের ফুল প্রসবের সময়ে এনেছে।

ললিতা বললে, 'আয় তোকে একটু পড়িয়ে দিই কবিতাটা।' রাখী বললে, 'আজ পড়া বাদ দে, দিদি।' সে টব দুটোর কাছে উবু হয়ে বসে বসে বরং কলি দুটোকে দেখতে লাগল। যেন সেই সবুজ ছোট কলি দুটোর মধ্যে সে রঙের আভাস দেখতে পাচ্ছে, এই রকম তার ভঙ্গি। হঠাৎ সে প্রায় জোরে জোরে বলে উঠল, 'দিদি, দিদি, এ ফুল দুটো কিন্তু দু রঙের হবে দেখে নিস। আমি তো দেখতেই পাচ্ছি তোরটা কমলা রঙ আর আমার এটা কাপিং রঙ। ঠিক দেখিস, দুটোই এমন হবে যে লোকের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।'

কিন্তু রাখীর চোখে তা সত্ত্বেও জল এসে গেল, সে ফুলের টবের কাছে থেকে উঠে এল। বললে, 'দিদি, তোর চোখ দেখিয়ে চশমা নিতে কত লাগবে বল তো। ষাট সত্তর টাকা ? তার জন্য তোর অমন সুন্দর চোখ দুটো নষ্ট হবে ?'

রাখী ললিতার কাছে গিয়ে বসল। ললিতা বললে, 'কাল তুই যে কবিতাটা পড়ছিলি, তা ঠিক পড়া হচ্ছিল না। কবিতা কিন্তু মানে, আর সেণ্ট্রাল আইডিয়া নয়। বরং সেণ্ট্রাল আইডিয়া ধোঁয়া ধোঁয়া থাকে থাক, শব্দগুলোকে আগে চিনতে হবে। তাদের আকার, ওজন, ভর, স্বাদ, ঘ্রাণ, রঙ। আয় পড়িয়ে দি।'

রাখী বই না এনে, ধীরে ধীরে বরং দিদির কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। সে দিদির দিকে মুখ তুলে বললে, 'তার চাইতে তোর পড়ার কথা বল। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার পর কী করবি ?'

'পাব ?'

'সে কি, পাবি না ?'

ললিতা বললে, 'এমন তো হতে পারে, রাখী, আমরা সকলেই 'বি' ক্লাস।'

রাখী রাগ ক'রে উঠে বসল, বললে, 'এ কখনও সত্যি নয়, দিদি। ললিতা

বললে, 'আচ্ছা তা সত্যি হবে না।'

রাখী বললে, 'একজন অধ্যাপকের কাছে পড়লে হত। কত করে নেয় রে?' 'মাসে আড়াই শো।'

এই শব্দটা এমন অদ্ভুত রকম ভয়ঙ্কর, যে রাখী ভয় না পেয়ে হেসে ফেলল। 'আচ্ছা, দিদি, তুই যে প্রফেসর বলাসির থেকে নোট এনেছিলি, তা খুব পুরনো দেখলাম, লেখাগুলো হলুদ, কাগজটা বাদামী। ওটা বোধ হয় এখন অকেজো, তাই না?'

ললিতা বললে, 'না।'

'তা হলে, আচ্ছা দাঁড়া, আমি কপি করে রাখব। তুইও আরও নোট নিয়ে আসবি। তুই ওটাকে আর কপি করছিস না কেন?'

ললিতা ভাবলে, বোধ হয় কপাল। সব ছাত্র-ছাত্রী এই সত্যটা জানে। প্রফেসর বলাসির নোট পাওয়া আর ফার্স্টক্লাস পাওয়া এক কথা। তারা বলে, গত পনর বছরে যারা ফার্স্টক্লাস পেয়েছে, তাদের অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ওই নোটে মানুষ। সকলকে নোট দেন না। এক অদ্ভুত উপায়ে বুঝতে পারেন ফার্স্টক্লাসের উপাদান কার মধ্যে আছে। তখন তাকে তুলে নিয়ে ওই নোটের মধ্যে রেখে তাকে তৈরি করেন ফার্স্ট-ক্লাস রূপে। নতুবা হাজার-পাঁচেক আগাম দিলে ১৯৪২-এ লেখা তার সেই নোট বইয়ের সেট পেতে পার। কেমন যেন গল্পের মতো লাগে। সে সেই সেটের একটা পেয়েও কপি করতে পারছে না। অদ্ভুত লাগছে তার।

এমন এক একটি বিখ্যাত বই থাকে, যা যত না, পড়া হয় তার চাইতে বেশি আলোচনা হয়। যারা সাহিত্যের ধার ধারে না, তারাও তা নিয়ে আলোচনা করাকে আধুনিকতার লক্ষণ মনে করে, তার সম্বন্ধে গুজব ছড়ায়। ললিতা, এমন-কি রাখী, এমন-কি স্কুলে থাকতে, লরেন্সের লেডি চ্যাটারলির নাম শুনেছে। যদিও সেই বইটা যথেষ্ট পুরনো, এমন-কি আমাদের দেশে সব সময়ে পাওয়াও যায় না। কিন্তু অধ্যাপক বলাসি যখন বলেন, তখন ব্যাপারটা অন্য রকম হয়। বলাসি বলেছিলেন: 'মুক্ত মন না হলে সাহিত্য হয় না। সামাজিক নীতিবিধান দিয়ে যতক্ষণ পৃথিবী দেখি, ততক্ষণ ঔপন্যাসিকের স্বাতন্ত্র্য কী বোঝা যায় না। বিংশ শতাব্দীর সব চাইতে অরিজিন্যাল ঔপন্যাসিক এই লরেন্স। এটা নিয়ে যাও।' হাত বাড়িয়ে প্রফেসরের হাত থেকে লেডি চ্যাটারলি নিতে ললিতার হাত কাঁপছিল। গলা শুকিয়ে উঠছিল। ললিতা অনুভব করে কেউ যেন তাকে নির্লজ্জ করে দিচ্ছে। বইটাকে সে লুকিয়ে রাখে যাতে রাখীর হাতে না পড়ে।

একদিন রাখী বললে, 'সেই বাড়ির মালিকে জিজ্ঞাসা করলে হয় কি সার লাগে, কোথায় সেই সার পাওয়া যায়। তাকে না-হয় চার পাঁচটা টাকা দেব।'

ললিতা বললে, 'ফুলের জন্য তাকে করাপট্ করবি?'

রাখী হেসে উড়িয়ে দেয়। সত্যি কি করাপশান? বললে, 'দিদি, সে হয়তো

ইতিমধ্যে বিকৃত।'

সেদিন ললিতা সময় বেঁধে রাখীকে রসেটির ব্লেজেড ড্যামোজেল বুঝিয়েছিল। রাখী বললে, 'সত্যি কি তা হয় দিদি, যে প্রেমিকার আত্মা তেমন করে স্বর্গের প্রাচীরের কাছে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে ?'

ললিতা বললে, 'তা না হোক. ছবিগুলো দেখ, ছবিগুলোর কারুকার্য আর রঙ দেখ ; ফুলগুলোর সুগন্ধ আসছে না শব থেকে ?' ললিতা অন্য সময়ে ভাবে। রসেটিকে এক সময়ে ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলে গাল দেয়া হয়েছে। এটা হয়তো স্বপ্নে কামনাবাসনার তৃপ্তি চাওয়া। লরেন্সের ভাব যেন এখনই পেতে হবে, মরার আগে অভাববোধকে তৃপ্ত করে যেতে হবে। আর তা আত্মার নয়। স্বামী অক্ষম হলে মালির সাহায্য নিতে হবে। ললিতা নিজের চিন্তায় ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। অথচ লরেন্স কিন্তু এবারের পাঠ্যই নয়।

রাখী একদিন একটা পুরনো ফ্রক পরে, চটি ফট্‌ফট্‌ করতে করতে, একাই স্বর্ণসীতার মন্দিরে চলে গেল আরতি দেখতে। আরতির সময় বটে, আরতি হচ্ছেও, কিন্তু সেদিনকার সেই ছেলেটি উপস্থিত নয়। কানন চৌধুরী বারান্দায় জমিয়ে আলাপ করছে ভক্তিমতীদের সঙ্গে। রাখী শুনতে পেল : 'না। আমার বড় ছেলে নয়। আমার বড় ছেলে এই প্রতিমা বাঁচাতে গিয়ে বাইতোড়েই প্রাণ দিয়েছিল। বর্শায় এফোঁড় ওফোঁড়। এটি আমার মেজ ছেলে যে আরতি করে সাধারণত।'

রাখী ভাবলে, কেন এসেছে সে ? কিছু ভালো খাবার যদি পাওয়া যায় ? সেই ছেলেটির মুখ সেদিন লাল হয়েছিল তাকে দেখে ? না, না, স্বর্ণসীতা তাদের জন্মদুঃখী দলের দলপতি।

রাখী তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে মন্দিরের কাছাকাছি সেদিনের সেই আরতি-ওয়ালার মুখোমুখি হয়ে গেল। আজ জামা প্যাণ্ট পরা। তাতেই হঠাৎ যেন তাকে চিনতে পারে রাখী। সংকীর্ণ পথ, সে সরতে চায়, ছেলেটিও। 'ফেট্‌ কি হাস্যকর ভাবে আসে দেখুন।' আধমিনিট কোলাকুলির মতো দুজনেই এদিক ওদিক করে। তারপর ছেলেটি হেসে ফেলে।

বলে, 'কিপ্‌ টু দি লেফট্‌।'

রাখী বলে, 'রোল নম্বর ষোল না ?'

রাখী নিজের ফ্রকপরা শরীরের কথা ভেবে লজ্জিত হ'য়ে পালালে। কিন্তু রসেটির স্বপ্ন আর লরেন্সের লেডি এক নয়। দিদির অগোছাল বই গোছাতে গিয়ে একদিন রাখী লেডি চ্যাটারলি দেখতে পেয়ে হতভম্ব। একি সেই বই যার কথা স্বাতী বলেছিল স্কুলে থাকতেই। যা নাকি তার মেজদা বিলেত থেকে কিনে এনেছে। নাকি আন-অ্যাব্রিজড্‌, প্রতিশব্দ কিছুমাত্র বাদ না দিয়ে ছাপানো। উল্টে দেখতে গিয়ে অধ্যাপক বলাসির নাম ফ্লাইলিফে দেখে আরেকটু অবাক হল সে। এই বইয়ের দু-একটা ঘটনা স্বাতীর মুখে শুনে স্কুলেই তাদের দম বন্ধ হয়ে আসত।

মেয়েদের শরীরের সেই সব কথা।

রাখী বললে একদিন, 'দিদি, তুই বলাসির বাড়ি আর যাবি না ?'

ললিতা বললে, 'যাব আর একদিন। নোটটা কপি করা হচ্ছে না।'

'কপি না করে ফেরত দিবি ?'

ললিতা ভাবলে, 'যেতে তো হবেই, অন্যের নোটখাতা আর উপন্যাস আটকে রাখা যায় না।'

রাখী আর এক সময়ে বললে, 'দিদি, একলব্যের গল্পটা কিন্তু—'

'কি ?'

'না। একেবারে বাজে।'

'ট্র্যাজিক্ হলেই বাজে হবে কেন ?'

'আসলে কিন্তু, দিদি, তোর চশমা দরকার। একটা সোনার ঘড়ি হলে তোকে মানাতো। আজ সোমা পরে এসেছিল, এক হাতে ঘড়ি, অন্য হাতে বালা। স্বাতীর পাথর বসানো বালা জব্দ। স্বাতী তখন বললে, হ্যাঁ দুটো বালার বদলে একটা বালা আর একটা ঘড়ি সস্তা হয়। এমন করে বলে যে সোমার মুখও কালো হয়ে যায়।'

সেদিন রাতে পাশাপাশি দুজনে শুয়েছে তারা। রাখী অন্ধকারকে আজন্ম ভয় করে। কমলার হুকুম, রাত দশটায় আলো নিবাতে হবে। এজন্যও হয়তো রাখীর রাগ হয়ে যায় মায়ের উপরে। অবশ্য রাখী মনস্তত্ত্বের কতটুকুই বা বোঝে। মা এখন কোলের মধ্যেও রাখে না, আলোও নিবিয়ে দেয়।

আলো নিবতেই ললিতার বুকে মুখ গোঁজে রাখী। আর সেই অবস্থায় ললিতা বোনের মাথায় হাত রাখে। বোঝাই যায় বোনের জন্য তার মন কোমল হয়ে ওঠে। সে মনে মনে হিসাব করে, একটা ঘড়ি হলে রাখীর হাত দুটোকে কেমন দেখাতো। রাখীর মনের মধ্যে রোল নম্বর ষোলর কথা ওঠে। উপন্যাসের ভালোবাসা ? ও সেই পুরনো উপন্যাস, মন্ত্রশক্তি কি একটা নাম, বোধ হয় এক তরুণ পূজারী তার নায়ক। উপন্যাস বেশ জোর ব্যাপার। ও না হলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় পৃথিবীকে আর কতটুকু জানা যায় ? রাখী অবিশ্বাস্য স্বপ্নে হাসে।

কিন্তু ঘুমই নষ্ট হবে বুকের ধুকপুকানিতে। দিদির বুক এত ধুকপুক্ করছে কেন ? ললিতা কি ভাবছে, লরেন্সের লেডি, তা যে কোন বিষয়ে হোক, অপূর্ণতাকে, যে কোনো ভাবে হোক, পূর্ণ করে তোলার প্রতীক হতে পারে ?

হয়তো তখন তারা প্রাপ্তবয়স্ক হচ্ছিল। হয়তো সাহিত্যপাঠের জন্য যে বয়স্ক অভিজ্ঞতা দরকার সেই ময়লাটুকু অধ্যাপক ললিতার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কেন এমন হল ? সকলের জন্য কি পৃথক ভাগ্য লেখা থাকে। বলাসির কাছে ললিতার যে অভিজ্ঞতা হল, তা আর কারো হয় নি বোধ হয়। এটা কি বলাসির দুর্বল নোংরা ওভারচার ?

এরকম মনে হ'তে রাখী ভাবলে : বলাসিরা তাদের এই বেয়াল্লিশ খ্রীস্টাব্দের

নোটগুলো ছেপে বিক্রি করে না কেন? নিজেই উত্তর দিল সে। বাহ্ তা হলে ধর, আট পেপারের জন্য আটখানা নোট বই অর্থাৎ একশো টাকার মধ্যে ফার্স্ট ক্লাস হতে পারে। এদিকে দেখ মাসে প্রতি ছাত্র ২৫০, হলে চার জনে বছরে বারো হাজার করে হচ্ছে বলাসির, এই বেয়াল্লিশের নোট দিয়ে ত্রিশ বছর ধরে। অবশ্য চিরকাল চলবে না, কারণ বলাসির ছাত্ররাও তো আবার এই নোটগুলোর কপির কপি ওইভাবেই ছড়াচ্ছে।

রাখী ভাবলে, দিদিকে বলবে তুই লেডি ফেরত দিয়ে দিস কিন্তু। লরেন্স কি তোর কোর্সে আছে? কি নোংরা!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। সরসুনা।

এটা রাখীর অপরিণত বুদ্ধির সাহিত্যকৌশল যে সরসুনার কথা সে এ জায়গায় বলেছে। সুমিতের কথা থেকে এবং পাণ্ডুলিপি পড়ে ধারণা হয় সে এসব জেনেছিল অনেকটা পরে, সদুর বড়দার এবং মেজদার মৃত্যুর পরে এবং নিজের মৃত্যুর কিছু আগে যখন জানাটা কিছু কাজে লাগেনি, শুধু কলকাতা শহরটাকে হয়তো আরও ধূসর মরু বলে মনে হয়ে থাকবে।

সরসুনার এই একতলা বাড়ি, যা অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় বেশ পুরনো, যেমন যার কোনো কোনো জানলা হয়নি, সেখানে চট; যেমন বাঁ দিকটায় ইঁটের উপরে আস্তর ধরানো হয়নি। কয়েক বছরের বর্ষায় ইঁট শ্যাওলা-কালো : তার এক ঘরে গণেন পাঠক (৬০), স্কুলের বি. এস. সি মাষ্টারের সামনে তার তিন ছেলে; বড় ছেলে ২৮, মেজ ২৫, ছোট সদু (স্বদেশ)। গণেন তাঁর জীবনের একটা বড় সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। গণেন তাম্রপত্র এবং আড়াই শো টাকা বৃত্তি রিফিউজ করছেন। যদিও আগামী তিন মাসের মধ্যে তাঁর স্কুলের চাকরি শেষ হয়ে যাবে, এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে তিনি সামান্যই পাবেন। তার পরে কী হবে, ভাবতে তাঁর বুক-পেটের শিরা ভয়ে কোঁচকাতে থাকে। যদিও তিনি চাকরিতে আছেন পোলিটিকাল সাফারার বলে, চাকরি জুটেছিল সেই দাবিতেই, তাই বলে তাম্রপত্র? পুরস্কার? তিনি এতক্ষণ ধরে নিজের ব্যক্তিত্বকে ছেলেদের চোখের সামনে নষ্ট করে বলেছেন, কাজটা ভালো করেছি কিনা সন্দেহ। হয়তো বিশ্বাসঘাতকতাই। গণেন ও তাঁর বন্ধু সুকুমার পালিত পুলিস ইন্সপেক্টর সুখরঞ্জন দস্তিদারকে খুন করতে গিয়েছিল। সুখরঞ্জনকে সুকুমার ঠিকই খুন করেছিল। কিন্তু তার ছেলে বিজন যে গণেনের সহপাঠী ছিল সে মাঝে এসে পড়েছিল। সুকুমারের পিস্তলের গুলি সুখরঞ্জনের সঙ্গে লড়াইয়ে শেষ হয়েছিল। সুকুমার তখন গণেনকে বলেছিল বিজনকে গুলি করতে। গণেন তা করেনি। বরং বলেছিল ওর কি দোষ ওকে কেন মরতে হবে? বিজন তার সাক্ষ্যেও এই কথা বলেছিল। সুকুমারের ফাঁসি হয় আর গণেন তার এই মানবতার জন্য ফাঁসির বদলে আন্দামানে যায়।

মেজছেলে (সদুর মেজদা) বললে, 'তুমি ঠিক করেছ। বাবা, ইতিহাস বলে তোমাদের সে-সব বাজে ব্যাপার ছিল।' বড় ছেলে বললে, 'তা হলে ইতিহাস সম্বন্ধেই আমার মত বদলে যাবে, যদি কেউ বলে স্বাধীনতা এসেছে মহাত্মা গান্ধীর জন্যই শুধু।'

সদু বললে, 'স্বাধীনতার পরে পঁচিশ বছর হল, এখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? তবে অ্যাটলির নিজের সাক্ষ্য দেখ, রমেশ মজুমদারের লেখায় পাবে, ইংরেজদের সরানোর ব্যাপারে মহাত্মার প্রভাব ছিল মিনিম্যাল্।' মেজছেলে বললে, 'বলো এ-সব জন্যই শুধু আমরাই আমাদের বাবার কথা জানব। তাঁকে নিয়ে কেউ আলোচনা করে তা চাই না।' বড় ছেলে বললে, 'তা এটা ভালো, বাবাকে নিয়ে কেউ টানা-ছেঁড়া না করুক। কিন্তু তুই, সদু, এখন পড়তে যা। পরীক্ষায় কী লিখবি তা ভাব। এটা তো এখন আর পসিবল্ কোএশ্চেন নয়।'

সদু ভাবলে, তা নয়। হায়ার সেকেণ্ডারিতে ছিল। সে বাঙালি বিপ্লবীদের কথা, সুভাষ বোসের কথাও লিখেছিল। তার ধারণা, ইতিহাসে হঠাৎ ঊনসত্তর পেয়ে যাওয়ার কারণ এরকম দু-একটা প্রশ্নের উত্তর। পরীক্ষকের রাজনৈতিক মতের সঙ্গে মেলেনি। অথচ এই এগার নম্বর পেলে সে প্রথম দশজনের মধ্যে থেকে যেতো। সদু তার ঘরে গেল। এখন সে ইতিহাস পড়ে না। ফিজিক্সে আর যাই হোক রাজনৈতিক মত দিয়ে এগোনো যায় না। কিন্তু তাও কি সে পড়ে?

গণেনের ঘর থেকে বেরিয়ে সদুর বড়দা আর মেজদা কথা বলার জন্য বাড়ির বাইরে ন্যাড়া বকুল গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল।

মেজদা বললে, 'কাল তোমাকে যে পোশাকে শেয়ালদায় দেখলাম সন্ধ্যায়—'

'তা কি?'

'ওটা তো ফিটারের পোশাক।'

বড়দার চোখ দুটি ধক্ করে জ্বলে উঠল। যাকে খুনীর চোখ বলে, যদি সত্যি খুনীর চোখ অন্য মানুষের চোখ থেকে আলাদা হয়। একটু পরে তা স্তিমিত হল। বড়দা বলল, 'তো, কি?'

মেজদা কিছু বললে না।

বড়দা বললে, 'কেন তুই পুলিসের চাকরি নিলি, মেজ?'

মেজদা বললে, 'এর চাইতে ভালো চাকরি আমার হতে পারে না, তা তুমি জান। আমার বি-কমের ষাট পার্সেণ্টের কানাকড়ি দাম নেই। আসলে আমি এত মেঝ।'

বড়দা বললে, 'কিন্তু কি উপায়, কি উপায়। তুই একা পারিস। সদুর প[illegible] কি হবে?'

মেজদা বললে, 'এর পরে তোমাদের সঙ্গে আমার থাকা অসম্ভব হচ্ছে ন[illegible]

বন্ধুদের কয়েকজন যাদের সঙ্গে ও যায়-আসে ট্রেনে, তাদের উপরেও পুলিসের চোখ আছে।'

আলাপ শেষ করে বড়দা আর মেজদা বাড়িতে ফিরল। বড়দা ধীরে ধীরে হেঁটে সেই ঘরটায় ঢুকল যেখানটায় সে আর সদু থাকে। তার মনে হতে থাকল যেন সে ঘরখানাকে চিনতে পারছে না, যেন এ ঘরের সব কিছু অলীক, যেন সে নিজেও অলীক, যেন সে একটা মৃতদেহ। তার মনে হল, এ ঘরখানা পূর্বজন্মে কিংবা সে রকম কোনো সময়ে তার প্ল্যানেই তৈরি হচ্ছিল। তার মনে হল, কোনো এক-জন্মে বা স্বপ্নে বোধহয় সে ইলেকট্রিক এঞ্জিনীয়ারিং-এর একটা ডিপ্লোমা পেয়েছিল।

সদু খানিকক্ষণ আগে থেকেই তার টেবিলে বসেছিল। সে এই সময়টার জন্যই ভয়ে ভয়ে প্রতীক্ষা করছিল। সে বললে, বড়দা, শরীরটা তেমন ভালো নয় তোমার।'

ভালো তো নয়ই। বড়দা রাত্রিতে ফিরলে একসঙ্গে সদু আর বড়দা খায়। মাঝে মাঝেই রাত এগারোটা-বারোটা হয়। কিন্তু এই মাসেই, কালকের রাত্রিকে ধরলে তিন রাত হল, দুই ভাই-এর ভাত ঢাকাই থেকে গিয়েছে, খাওয়া হয়নি। বড়দার জন্য অপেক্ষা করতে করতে সদু টেবলের সামনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত দুটো স-দুটোয় বড়দা ফিরেছিল দারুণ পেটে ব্যথা নিয়ে। এখনও তো বড়দা পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, সে কি ব্যথা ভুলতে?

সদু, অবশ্য, জানত না, মাস-কয়েক আগে বড়দা ভুল করেছে। বুঝতে পারেনি প্রকৃতপক্ষে কোন্ ইউনিয়ন শক্তিশালী। এই বোঝার ভুলে তার অস্থায়ী চাকরি থেকে সে ছাঁটাই হয়ে গিয়েছে। তার পরে দুটো পথ খোলা ছিল, কোনো তৃতীয় পথ নেই, আত্মহত্যা, কিংবা—।

বড়দা ভাবলে, সদু কাদের সঙ্গে মিশছে? তারা কি সেইসব ছেলে যারা বদলাতে চায়। সে কি ভালো? আর তা যদি হয়, তবে মেজ'র এ বাসায় থাকা উচিত হয় না।

সে বললে, 'কিন্তু সদু, তোর সব বই কি কেনা হল? সদু, ভালো করে পড়তে হবে। সদু, ঠিক পাঁচ বছরের মাথায়, প্রথম চান্সে তোকে আই. এ. এস. হতে হবে।'

সদু টেবিলের উপরে রাখা তার বইগুলোকে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

বড়দা রেগে উঠে বললে, 'আমি আর পারছি না।'

অন্যদিন সদু আর মেজদা একই সঙ্গে ট্রেনে চলেছিল। ডেলিপ্যাসেঞ্জাররা পরস্পরের পরিচিত হয়। সেই সুবেশ, মৃদুভাষী ভদ্রলোক যার শব্দচয়ন এত ভালো যে, যে কেউ আন্দাজ করে নিতে পারে সে অন্তত অধ্যাপক (পি. কে.?) এবং ধারে কাছের প্যাসেঞ্জাররা নিজেদের গল্প কমিয়ে তার গল্প শোনে। (পি. কে.?)

সেই ভদ্রলোক বোঝাচ্ছিলেন, ভালো ছাত্ররাই বিপ্লবী হয়। সবই প্রায় ফার্স্ট'ক্লাস বয়েজ এই আর্বান গেরিলারা। সুন্দর হাসেন সেই ভদ্রলোক।

মেজদা হঠাৎ থপ্ করে বলে বসলে, 'আচ্ছা, মশায়, ক' ঘণ্টা পড়লে কতগুলো বই পড়লে ফার্স্ট'ক্লাস হয়? নাকি আজকাল না পড়লেই ওটা পাওয়া যায়? যদি তারা ফার্স্ট'ক্লাস পায়, তবে পড়ে, বিপ্লব করে না। আর যদি বিপ্লব করে, তবে তাকে তো পালিয়ে বেড়াতে হয়। বই খুলবে কখন? আর যদিবা বই খোলে মথায় ঢোকে পড়া? তা যদি তারা ফার্স্ট'ক্লাস পেতে থাকে, বুঝতে হবে অধ্যাপকরা কোএশ্চেন বলে দেয়।'

সেই ভদ্রলোকের সংযম ছিল। এতোগুলো লোকের সামনে এমন জবাব আশা করেন নি। তবুও হাসলেন। তা অবশ্য দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁট গুটিয়ে নিয়ে ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো বার করা। তিনি বললেন, 'আপনি অনেক জানেন দেখছি।'

সেই কামরার লোকেরাও মেজদার উপরে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। তাদের একটা চলতি আলাপের বিষয়ে সময় কাটানোর একটা অবলম্বনে আঘাত পেল। যেন একটা রহস্য উপন্যাস, দার্শনিক-দার্শনিক আলাপের বিষয় হয়ে উঠছিল তাদের। তারা এই আনন্দনষ্টকারী মেজদার উপরে বিরক্ত হল।

শেয়ালদায় নেমে সদু বললে, 'কি দরকার মেজদা সব লোককে শত্রু করে?'

মেজদার তখন তাড়াতাড়ি। গেটের কাছে দাঁড়ানো সদুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে হেসে সে অফিসে ছুটল।

শেয়ালদা থেকে হাঁটতে হাঁটতে সদু কলেজের দিকে এগিয়ে চলল, আর তখন মেজদার কথা মনে হতে থাকল। ...হ্যাঁ গত এক বছরে তারা কি ক্লাস করেছে?...এটা সূর্য সেন স্ট্রিট। কি যেন? বিপ্লবী। ওরা কিন্তু জানত না। স্বাধীনতা নয় শুধু। কিন্তু কথাটা কি ডিস্‌ইন্‌ট্রিগেশন, মানে বিভাজন, বিগলন, অণুগুলো খুলে খুলে ভেঙে পড়া সব বদলানোর আগে। ও আচ্ছা...সব কলেজের সব ছাত্র, যারা জানে, যাঁরা অনুভব করে, সকলেই যদি একসঙ্গে একবার দূর হও বলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি ভেঙে, চুরমার হয়ে, ছাতু ছাতু হয়ে ধুলো হয়ে উড়ে যেতে পারে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ। সরস্বনা বাইতোড় বেতাগ

কিছুদিন পরে কলেজের গেটের কাছে সদু রোল ষোল (সুহাস -কে দেখতে পায়। সদু, যে দীর্ঘ নিশ্বাসে কলেজগুলোকে অণুতে বিভাজিত করে উড়িয়ে দেয়। রোল ষোলকে দেখে মনে হচ্ছে সে অসুস্থ। সেই পোশাক, সেই শাদা আর মারা লালে স্ট্রাইপ শার্ট, হাল্কা বাদামী প্যান্ট, আর ধূলিধূসর চপ্পল। কিন্তু মুখে যেন কালির পোঁচ। চোখের কোলে কালি। সুহাস এদিক ওদিক তাকায় পরস্পরকে দেখে দাঁড়ায় না, বরং একে অন্যের পিছনে চলতে থাকে, সেই অবস্থায় নিচু গলায়

কথা বলে। যেন সামনে পিছনে হাঁটছে মাত্র।

সুহাস : রামমোহনে বোম্।

সদু : নুউস্যান্স ভ্যালু!

নুউস্যান্স ভ্যালু?

ওকে?

পিকে।

দেড়টা।

ক্যাণ্টিন।

সুহাস ঘোরা পথে সদুর পিছন ছেড়ে আবার গেটের দিকে গেল। যেন সে আর কারো জন্য অপেক্ষা করছে। সে একটু অবাক বোধ করলে। নাটকে কেউ যখন সাজে তখন সব সময়ে কোনটা অভিনয়ের কোনটা নিজের, জীবন তা কি পৃথক রাখতে পারে? স্টেজের সেই রানী কি কিছুক্ষণ নিজেকে রানী মনে করতে থাকে না? যেমন ধর, তাদের বাড়ির স্বর্ণসীতা পূজা, যা তাদের বাড়ির দারুণ মূল্যবান ব্যাপার। তার খুঁটিনাটি আয়োজন, তার মন্ত্র, তা থেকে পাওয়া টাকা—সে সবের বাইরে এসে, দু এক মিনিটের জন্য কি মা স্বর্ণসীতার পূজারী ছাড়া অন্য কিছু হন? যেন তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে যে মাছ জন্ম থেকে মৃত্যু কাটায়, হঠাৎ ডুব দিয়ে সে দেখতে গেল আরও গভীরে কিছু আছে কিনা। যেমন ধর, একটা মুভমেণ্ট যা তোমার জীবনকে জীবন করছে মনে কর, তা থেকে সরে এসে নিজের বাঁচা, নিজের নিশ্বাস নেয়া, নিজের হয়ে গান করা। কিন্তু রাখী দেরী করছে কেন? হয়তো ক্লাসে গেছে। সুহাস ক্লাসে যেতে যেতে ক্লাসের দরজা বন্ধ হল।···

ক্যাণ্টিনের ধার ঘেঁষে এই একটা গাছ। অনেকে বলে সপ্তচ্ছদ, অনেকে বলে সপ্তপর্ণী। কে লাগাল? মনে হয় বীজ উড়ে পড়েছিল। তার পরে কেউ নষ্টও করে নি, কেউ জলও দেয় নি। আছে তো থেকেই গেল। কিন্তু রাখী দেরী করছে কেন? ক্লাস থেকে তো একই সঙ্গে বেরিয়েছে তারা। তাকে এখানে ধরতে হবে। গেট দিয়ে বেরিয়ে না যায় সঙ্গিনীদের সঙ্গে। আজ তো আর ক্লাস হবে না। পার্ট ওয়ান পরীক্ষা হচ্ছে।···

রাখীর সঙ্গে সুহাসের দেখা হয়ে গেল গাছটার নীচেই। সুহাস বলে, 'আসুন ক্যাণ্টিনে যাই।' রাখী আপত্তি তুললে, 'আমরা এখন চা খাই না।' কিন্তু তার লোভও হয়, এই ক্যাণ্টিনের ভিতরটা সে দেখে নি এতদিনেও। এমন কিছু নয় নিশ্চয়। তা হলেও, খুব হিসাব করে চলে বলে তার দিদিও কোনোদিন ক্যাণ্টিনে গেছে কিনা সন্দেহ। আজ অবশ্য সে তার একটা বই-এর ভাঁজে তিনটে টাকা লুকিয়ে এনেছে। কবেকার টাকা তা তার এখন মনে নেই। দিদি পরীক্ষা দিচ্ছে। আজ সে এই বৈপ্লবিক চিন্তা করেছে যে সে দিদিকে পরীক্ষার শেষে চা খাওয়াবে। সবাই খায়।

সুহাস বললে, 'আসুন। দয়া করে আসুন।' রাখী বললে, 'আমার সঙ্গে পার্স নেই।' সে ভাবলে, তাই বলে কারো সামনে বই-এর ভাঁজ থেকে তিন টাকা বার করা যায় না। স্বাতীরা হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে পার্সই বার করে। সুহাস বললে, 'এই দেখুন, আমি এত ছোটলোক নাকি ? না হয়, পুজোটুজো করি।'

সুতরাং রাখী সুহাসের সঙ্গে ক্যান্টিনে ঢুকে একপাশ ঘেঁষে বসে।

ক্যান্টিনের দেয়ালের গায়ে দাগদাগালি, ছবি, বাণী, নানা শ্লোগান, সব অতীত থেকে উঠে আসা যেন।

খানিকক্ষণ বিনা কথায় বসে থেকে, চায়ের কাপ নাড়াচাড়া করতে করতে সুহাস বলে, 'একটা কথা বলি। আজ ক্লাসে অমন প্রশ্ন তোলা আপনার ভালো হয় নি।'

'কেন ?'

'প্রফেসর সরকার চটে যাবেন। সেমিস্টারে কম নম্বর পাবেন ?'

'কিন্তু হঠাৎ ইলতুৎমিস অত ভালো হয়ে গেলেন কি করে ? আমি তো সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম আলাউদ্দিন, ইলতুৎমিস এদের তাম্রশাসন, মুদ্রা, মহাফেজখানা ইত্যাদি ইদানীং হঠাৎ আবিষ্কার হয়েছে কি না, যার ফলে তারা কেউ কার্ল মার্কস সদৃশ, কেউ বা অশোক সদৃশ হয়ে যাচ্ছেন এখন। ওটা কি ইতিহাস যা উনি পড়াচ্ছিলেন ?'

সুহাস হো হো করে হাসল, 'ইতিহাস না হোক, জাতীয় ইনট্রিগেশন হচ্ছে। কি বলিস, সদু ?'

সদু যে কখন এসেছে তা বোঝা যায় নি। পরে দেখা যাবে এটা তার এক গুণ, এই নিজেকে ভিড়ে মিশিয়ে রাখা। সদু বললে, 'বাপস্! এজন্যই সায়েন্স নিয়েছি। তা হলে মুকুলের গল্প শোন। মুকুলের যতিদা হায়ার সেকেণ্ডারি খাতা দেখেন। ইতিহাস। মুকুলকে নিয়ে অনেক সময়ে নম্বর যোগ দেয়ান। তা এবারের হেড এগজামিনার, কোন এক ডক্টর বায়তুল্লা বাতিল, নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যেক উত্তরের পঁচিশ পার্সেণ্ট থাকবে উত্তরের সাহিত্যগুণের জন্য। রাখী অবাক হয়ে বলে, 'উপন্যাসের মতো করে লিখতে হবে নাকি ইতিহাস ?'

সুহাস ঠাঠা করে হেসে ওঠে। চোখের জল মুছে বলে, 'বাতিল সাহেবের নিজেরই ইচ্ছা ছিল বোধ হয় নভেলিস্ট হওয়ার।'

সদু ভাবলে, 'এখনও কিন্তু নম্বর পাওয়ার র‍্যাটরেস ভুলতে পারছি না সকলে।' এটা কিন্তু সুহাসের এক আশ্চর্য শক্তি এই হাসতে পারা। আর এইজন্যই সুহাসকে তার ভালো লাগে। এটা কিন্তু কোনো ইডিওলজির প্রশ্ন নয়। বরং ইডিওলজির নীচে, ঠাণ্ডা একটা মধুর স্তরে নামা কোনো স্রোতের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বাজল। রাখী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। বললে, 'দিদির পরীক্ষা শেষ হল, দেখি গে।' খুঁজে দিদিকে বার করে রাখী বললে,

'ক্যাণ্টিনে কিছু খাবি চল ; দেখ এখানে সকলেই খাচ্ছে।'

'দূর পাগলি ! আমরা বেলা একটায় কখনও খাই ?'

ললিতা নির্জনতর বারান্দার একটা কোণ খুঁজে নিয়ে বই খাতা নিয়ে বসে যায়।

'পড়বি এখনও ?'

দিদি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছে। রাখীর জানতে ইচ্ছা করে, ললিতার এই পরীক্ষা ভালো হয়েছে কি না। কিন্তু ভয়ে তার বুক কাঁপে। যেন একটা ক্লান্ত উদাস প্রজাপতির পাখা ছিঁড়ে যাবে। সে বলে, 'তুই পড়। পরীক্ষার আগে এসে বই নিয়ে যাব।' উদাস ক্লান্তিতে ললিতা হাসে। আর তখন মনে হয় রাখীর, এই দিদিকে যদি আজ মা বকে, তা হলে দারুণ ঝগড়া হয়ে যাবে। মার সঙ্গে।

দিদির জন্য অপেক্ষা করতে রাখী কমন রুমে যায়। আজ সোমা এক জোড়া মিনা-করা বালা পরে এসেছে। সোমা তা সকলকে দেখানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পুলিসের বড় অফিসারের বোন স্বাতী আজ নীরব উপেক্ষা দিয়ে সোমার আনন্দকে মুছে দিতে চাচ্ছে। রাখীকে পেয়ে স্বাতী আলাপটাকে সোমার মুখ থেকে কেড়ে নেয়ার সুযোগ পেলে। স্বাতী বললে, 'ক্যাণ্টিনে দেখলাম রোল ষোলর সঙ্গে বসে খুব চা খাচ্ছিস।'

'খাচ্ছিলাম।'

'ওকে চিনিস ? ওর নাম জেনেছিস ?'

রাখী মিথ্যা করে বললে, 'শক্তিকুমার।'

স্বাতী বললে, 'যাই বলিস রাখী। ভালো নয়। কেমন লোভ-লোভ করে তাকায়।'

রাখী কিছু না ভেবে বললে, 'কারো কারো জীবনের উপরে খুব লোভ থাকে।'

'বুঝতে পারছিস। চরিত্র ভালো থাকলে পুরুষের চোখের নীচে অমন কালি জমে না। শরীরও ভেঙ্গে যাচ্ছে।'

'ও মা, তাই !'

রাখী দিদির কাছে থেকে বই নিতে উঠে পড়ল। বই নিয়ে সে এদিক ওদিক ঘুরল। সে স্থির করে ফেলেছে, দিদির পরীক্ষা শেষ হলে তাকে নিয়ে বাড়ি যাবে। কিন্তু এখন কোথায় যাবে সে ? একবার তার মনে পড়ল, তাদের সেই টবে খুব বড় না হলেও ডালিয়া দুটো ফুটেছে। একবার তার মনে হল, দিদির একটা ভালো কাপড় দরকার। তা যদি বলো, মারও একটা ভালো শাড়ি পাওয়ার যোগ্যতা আছে। এখন থেকে সে মায়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। সাধে কি আর সে খারাপ ব্যবহার করে ? মা কেন বোঝে না, আমরা সকলেই দায়ী ? সে স্বাতীর কথাটা আবার শুনতে পেল যেন, কিন্তু সে কি করে বলবে, রোল ষোল, যার নাম সুহাস তার মুখটা শীর্ণ দেখায় কি না। আগে আর কবে দেখেছে। তার বই-এর মধ্যে

তিনটে টাকা আছে। এ তো বোঝাই যাচ্ছে, রাখী ভেবে লজ্জিত, যে সে সুহাসের সেই চায়ের কাপের রিটার্ণ দেওয়ার কথা ভাবছে। সেটা কিন্তু অকৃতজ্ঞতা। স্বাতীকে জিজ্ঞাসা করলে হয় তুমি কি করে জানলে পুরুষের চরিত্রহীনতা কি ব্যাপার, আর কেনই বা তাতে চোখের কোণে কালি পড়বে। সে লাইব্রেরির দিকে হাঁটতে শুরু করল। পানের দোকানে নিজের ফ্রক পরা শরীরের ছায়া সে একদিন দেখেছিল। শোভা একদিন ম্যাক্সি পরে এসেছিল কলেজে। কাছে গেলে সোনালী রঙের সিল্কের তলায় ব্রা-র শাদা আউট লাইন ভেসে ওঠে। কোথায় দাঁড়ালে আবার সুহাসের সঙ্গে দেখা হবে? যদিও প্রায়ই তাকে দেখা যায়, কলেজের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ঘুরতে। আর তা ছাড়া সে লক্ষ করেছে, সদু, যদিও সে সায়েন্সের, রবীন্দ্রনাথের বিনয় গোরা যেন, লেগে আছে সঙ্গে। রাগ হয়ে যায় না? একদিন হিস্ট্রি ক্লাস থেকে বেরোতে কিংবা ঢুকতে স্বাতীর সামনেই সে ডাকবে—সুহাস শোন।

লাইব্রেরি থেকে রাখী রবীন্দ্রনাথের সেই দুই বোনের উপন্যাসটা নিলে। বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব কিন্তু। অধ্যাপক সরকারের মতে, ইলতুৎমিস নামক ব্যক্তিটি প্রায় অশোক সদৃশ মহৎ। রাখী হাসল। ন্যাশনাল ইনট্রিগেশন, আর বোধ হয় ভোট পাওয়াও। এ রকম ইতিহাসের চাইতে ক্যাণ্টিনের নোংরা টেবিলের ধুলো ফু' দিয়ে উড়িয়ে—।

রাখী যেন অবাক! রোল যোল! সুহাস বললে, 'কি আর করি? নো ক্লাস।'

এই কল্পনা করে লাইব্রেরির সিঁড়ি দিয়ে নেমে ক্যাণ্টিনের দিকে চলতে গিয়েই রাখী দেখলে সদু চলেছে সেদিকে। রাখীর মুখ শুকালো!

সুহাস বললে, 'কি সৌভাগ্য, দুজনেই একসঙ্গে! চলো হে কফি হাউস। আজ রোল এগার খাওয়াবেন।'

রাখীর যেন জ্বর এসে গেল, যেন বুকের ভিতরে ফোড়ার মতো ব্যথা থেকেই, কিন্তু হঠাৎ সেটা ফাটল। রাখী বললে, 'বাহ, আমার তো মাত্র তিনটে টাকা আছে।'

সদু বললে, 'তা বেশ, আমি দুটো টাকা দিতে পারি।'

সুহাস বললে, 'এ কি কথা শুনি আজি—'

সদু বললে, 'এ দুটো বড়দা জামার ভিতর দিকে সেপটিপিন দিয়ে আটকে রেখে দেয়। সঙ্গে না রেখে উপায়?'

সুহাস এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে নোটে খুচরোয় বার করে টেবিলে রেখে গুণে বললে, 'দু-টাকা পঁয়ত্রিশ হল দেখ। অনেকদিন আরতি করি না।'

সদু বললে, 'আরতি করলে ভগবান টাকা দিচ্ছে আজকাল?'

সুহাস বললে, 'তা সেবার চার্জ আছে না। সদু, তোমার কি মনে হয় এক আরতিতে পাঁচ টাকা রেটটায় ঠকছি? অবিশ্যি, উপরি অর্থাৎ দক্ষিণার থালা থেকেই টাকাটা সিকিটা নিজেই সরাই।'

সদু বললে, 'সাবাস, সুহাস তুমিই আমাদের মধ্যে এমপ্লয়েড। আর দেরি নয়, হাতে হাতে ধর গো।'

রাখীর মনে হল ফোড়াটা ফেটে যাওয়ার পরে কি স্নিগ্ধ আরাম। একটু অস্পষ্ট জ্বালা-জ্বালা আছে, কিন্তু এদের কাছে আর কোনোদিন দারিদ্র্য গোপন করতে হবে না।

কফি হাউসে গেলে একটা ব্যাপার হল। হঠাৎ সাহিত্য-চর্চা করতে শুরু করলে সুহাস, আর তা জোরে জোরে। শরৎচন্দ্রের মাথা খায়, রবীন্দ্রনাথের মাথা চিবোয়। আর কফির কাপে চুমুক দেবার ফাঁকে সদু ঘ্যান ঘ্যান করে বলতে লাগল, তার একটা প্রাইভেট টিউশানি দরকার, সপ্তাহে চারদিন হলে চল্লিশ টাকা ছ' দিন হলে যাট।

রাখী সাহিত্যের কথায় বললে, 'শরৎচন্দ্র আর টলস্টয়ে এই তফাত—অ্যানা চরিত্রহীনা হলেও ভদ্রলোক, আর সাবিত্রীরা ভদ্রলোক হওয়ার চেষ্টা করলেও ভ্রষ্টার গন্ধ যায় না। শরৎচন্দ্র ভদ্রপরিবারের মেয়ে দেখেছে কি না সন্দেহ।' সুহাস হেসে বললে, 'রোল এগার, এ যে দেখছি সাহিত্যে বিপ্লব।'

পাঁচটা বেজে গেল কফি হাউসে সাহিত্যচর্চায়। অবশেষে রাখীর সন্দেহ হয়েছিল, সেই চৌকোমুখ ঘাড়ের চুল-কামানো মাঝবয়সী খাকিপ্যাণ্ট শাদা শার্ট-পরা লোক দুটিকেই সাহিত্য শোনাচ্ছিল সুহাস। যারা চা নিয়ে বসে তাদের টেবলের দিকে ঘন ঘন চাইছিল। তারা চলে গেলে সদু বললে, 'বাপস্, সাহিত্যের কামড়, কচ্ছপের কামড়।'

রাখী লজ্জিত হল, ততক্ষণ সে রবীন্দ্রনাথকে শভিনিস্ট মেল পর্যন্ত বলে ফেলেছে; দুই বোনের বড়টি অসুস্থ বলে ছোটবোন ভগ্নীপতির প্রিয়া হয়ে উঠছে— এ কেবল স্বার্থপর পুরুষেরাই লিখে থাকে। এমন কি, সুহাস তার মধ্যে পুরাতনের ঝরাপাতা থেকে নতুন বসন্তের উদ্ভব আছে কিনা এই প্রশ্ন করলেও রাখী বলেছিল, 'ভগ্নীপতিরূপ গাছটায় তো পাতা ঝরার সঙ্গে সঙ্গে উইও ধরতে পারতো, নিজের বসন্তের সঙ্গে বিদায় নিতে পারতো।'

রাখীর বাড়ি ফিরতে সাড়ে পাঁচটা পার হয়ে গেল। বাড়ির কাছে পৌঁছে নিজের সাহিত্যচর্চায় লজ্জিত হয়ে সে স্থির করলে, পরে দেখা হলেই—সে রোল ষোলকে জিজ্ঞাসা করবে, সেদিনের কফি হাউসে তার অভিনয় কী রকম হয়েছিল। যদি সুহাস বলে, ওমা, অভিনয় নাকি? তা হলে রাখী বলবে, কফি হাউসের ওটা রিচুয়াল, আর রিচুয়াল মানে অভিনয়।

রাখী বাড়িতে দেখলে, ললিতা ফিরেছে, বরং মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে। মুখ ফ্যাকাসে, চোখের কোলে কালি। তার কি ব্যথার সময় এখন? কিন্তু তার চোখের কোলে জল চিক্‌চিক্ করছে। তা হলে পরীক্ষা ভালো হয়নি?

কিন্তু রাখী দিদির সঙ্গে কথা বলার আগে কমলা এলেন। বললেন, 'তোর

নাকি একটা মাত্র ক্লাস ? কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?'

রাখী বললে, 'আচ্ছা, মা, সব সময় চেষ্টা করো মেয়ে দুটো যেন নিষ্পাপ ফুল থাকে। কোন দেবতার জন্য রাখছ ? পাবে সেই দেবতা, অন্তত দশ হাজার করে দক্ষিণা না দিয়ে ?'

কমলার মুখ ফ্যাকাসে হল। তা দেখে রাখী দৌড়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে, এই দেখ, মা ; আমাদের জন্ম-নক্ষত্রে কাটাকাটি। আসলে আমি তো প্রাইভেট টিউশানির খোঁজ করছিলাম। আর এই দেখ তোমার জন্য একটা বই এনেছি, রবীন্দ্রনাথ। মনে নেই সেই বড়বোন ধীরে ধীরে মরছে, আর ছোটবোনকে ভগ্নীপতি বিয়ের জোগাড় করে নিচ্ছে।'

কমলা চলে গেলেন। রাখীর মনটা ছাঁৎ করে ওঠে। কেমন যেন অর্থহীন, কেমন যেন গল্পের মতো মিথ্যা মনে হতে থাকে; যেন একটা রিচ্যুয়াল এই জীবন, দিদির পরীক্ষা, যেন কফি হাউস, বিনা কারণে একটা আলাপ জমে যায়। বিনা কারণে তা ভাঙেও। বিনা কারণে রাখীর চোখে জল এসে যায়। সে কি আগে থেকে শুনেছিল কফি হাউসে সাহিত্য-টাহিত্য আলোচনা হয়ে থাকে ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। স্বর্ণসীতার নেপথ্যে

সুহাস ঘরে ঢুকে দেখে, ম্লান আলোয় মেঝেতে বসে শোভনা সলতে পাকাচ্ছেন। 'এখন অবেলায় এখানে ? রাতে রান্না নেই ?'

শোভনা বললেন, 'অনেক খাবার আছে। আজ লুচি মিষ্টি খেয়ে থাকলেই হবে।'

সলতে পাকানো হয়ে গেল যেন। শোভনা কিছুক্ষণ সুহাসের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'এত লুচি-মিষ্টির ছড়াছড়ি কেন জানিস ? সেই পুলিশ ইন্সপেক্টর আজ মানৎ দিলেন।'

'মা তোমরা আমাকে না জানিয়ে এত কিছু কর।'

'বাঃ, তোকে জানানোর কি আছে ? ভাবছিস পুলিশ অফিসারের এত ভক্তি কেন ? আমার তো মনে হয়, মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে যে কিছু একটা রক্ষা করতে চায়, সেই স্বর্ণসীতাকে ভক্তি করে বসে।'

'যেমন বাবা করছেন, তুমি করছ ? তবু যদি স্বর্ণ হত ?'

'কি বললি ?'

'ও কি আর সকলের মনেই স্বর্ণ ?'

শোভনা কিছু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আজকাল নাকি তোর মতো বয়সের ছেলেরা কী সব করে বেড়াচ্ছে। নাকি বিদ্যাসাগরের গলা কেটেছে, রামমোহনকে বোমা মেরেছে।'

'খবরের পুরনো খবর। নতুন হলে তোমাকে বলত না পুলিশ ইনস্পেক্টর। বোধ

হয় ওদের স্বর্গসীতায় বিশ্বাস নেই।'

সুহাস হাসল।

শোভনা বললেন, 'তোর লেখাপড়ার কি হচ্ছে, সুসি ?'

'হচ্ছে, হচ্ছেও না।'

'পরেরটাই ঠিক।'

'তাতেই বা কি ক্ষতি ? উপার্জন হচ্ছে তো।'

'তুই নাকি ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পড়িস ? তুই কি একখানাও ইতিহাসের বই কিনেছিস ?'

'সে কিনে নিলেই হবে ? সব পড়া মুখস্ত। তুমি ধর, আমি বলে যাচ্ছি। আলাউদ্দিন খিলজি খুব ভালো রাজা ছিলেন। অমন ভালো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মধ্যযুগে আর কেউ ছিল না। গরিবদের প্রতি দারুণ সমবেদনা। জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিয়েছিলেন। প্রায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী। কোনোদিন হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করেন নি। কি ধনী, কি দরিদ্র কারো রাস্তার উপরে শোওয়ার অধিকার ছিল না তাঁর রাজ্যে। হিন্দু মেয়েদের উপরে অত্যাচার হতো না। তারা পাঠানদের বে করতো।

শোভনা হেসে বললেন, 'এই নাকি পড়ায় ? তা হলে বরং এক কাজ কর। সায়েন্স নিয়ে পড়।'

হঠাৎ সুহাসের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। সে টেবলের দিকে তাকাল। ব্যাকুল হয়ে বললে, 'মা তুমি আমার বই-খাতা গুছিয়েছো ?'

'হ্যাঁ। ছেলের টেবল মা ছাড়া কে গোছাবে ?'

সুহাস যেন তখনই টেবলের দিকে ছুটে যাবে।

শোভনা নিজের শাড়ির বুকেরও নীচে এমন কি প্রায় পেটের কাপড়ের আড়াল থেকে রিভলবারটা বার করে বললেন, 'এটাকে খুঁজছিস ?'

সুহাস আর্তস্বরে বললে, 'মেঝেতে রাখ, মেঝেতে রাখ, যেখানে সেখানে আঙুল না লাগে।'

শোভনা ভয় পেয়ে রিভলবারটাকে মেঝেতে রেখে দিলে সুহাস ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'আচ্ছা মা, নিজের বাড়িতেও কি মানুষ নিশ্চিন্ত হবে না, কাউকে বিশ্বাস করবে না সেখানেও।'

'এটা কি বল তো ?'

'ওটা, মানে ওটা, তোমার সেই থিয়েটার মনে আছে মা। তাতে রড্‌রিগো সেজে-ছিলাম আমি। মনে নেই সেই যে যেখানে প্রতাপাদিত্যকে বলছে রড্‌রিগো, টোমি জানে না, রাজা, হামরা ডমিনৃগো কারভালো আছি। এটা সে নাটকের স্মৃতিচিহ্ন।'

'রড্‌রিগো বুঝি বলেছিল সে কারভালো ?'

'হ্যাঁ। প্রতাপাদিত্য নাটকের শেষে এক টিনের তরোয়াল নিয়েছে, খুব ঘোরাচ্ছে

আর আমি এই খেলার বন্দুক।'

'তা, অমন তাড়াতাড়ি মেঝেতে রেখে দিতে বললি কেন?'

সুহাস মায়ের পাশে বসে রিভলবারটা নিজের হাতে দূরে নিয়ে বললে, 'সে কিছু নয়, শোন মা, আমি আজই ব্যবস্থা করব। সেই শাদা গুঁড়োটা আমি এনে দেব। ওটার নাম ব্র্যাসো।'

'সে কি? তুই বলেছিলি বটে। ব্র্যাসো দিয়ে কি হবে? আর আমি যা বলছি তার সঙ্গে—'

'তুমি তো আমলকি দিয়ে রোজ স্নান করাও স্বর্ণসীতাকে।'

'শাস্ত্রে বিধান আছে।'

'তা থাক। আমলকির চাইতেও ব্র্যাসোর গুঁড়োতে বেশি চক্চকে হয়।'

'সুসি! তুই জেনেছিস?'

সুহাস হাসল, 'মা ওটা যেমন তোমার সিক্রেট, যে স্বর্ণসীতাকে স্বর্ণের বলে চালাতে হবে, এটাকেও মা রড্রিগোর খেলনা বলে চালাও। দেখ আমরা দুজনেই—'

শোভনার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এখন? এ ছেলেকে ফেরানো যায়? মা ও ছেলের একটা সম্বন্ধ আছে, যা পৃথিবীর সব চাইতে পবিত্র, সব চাইতে বড় সত্য, সব চাইতে ঘনিষ্ঠ, সেই সম্বন্ধে যেন ফিরে গেলেন শোভনা। উলঙ্গ দেহ থেকে উলঙ্গ শিশু জন্মাচ্ছে, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাঁচাতে হবে। তিনি ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলতে গেলেন, চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে। বললেন, 'খুব সাবধান সুসি, খুব সাবধান, তোর দাদা, বাবা যেন কেউ না জানে।'

শোভনা, অনুভব করলেন, মিথ্যা ফুঁড়ে বার হচ্ছে খোকন। এই স্বর্ণসীতা। যা স্বর্ণের নয়, তাকে বিদীর্ণ করে এক দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে সুসি। তার চোখ দিয়ে তো জলই পড়ছিল, এবার হু হু করে কেঁদে ফেললেন। ভাবলেন, যদি তাঁর বড় ছেলেও জানত, এই স্বর্ণসীতা পিতলের, তা হলে সে হয়তো বল্লমে বিঁধে মরত না এ বিগ্রহটাকে রক্ষা করতে গিয়ে। হয়তো, হয়তো বা।

সুহাসের মনটা উদাস হয়ে গেল। সে ভাবলে, মা কি দাদার জন্য কাঁদছে? বাবা কি এই আমলকি দিয়ে স্নান করার সিক্রেট জানতেন? এই সিক্রেটটাকে ভেঙে দিতে কিন্তু কষ্ট হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ। যে সরস্বুনা দমদমের ওপারে।

এর আগের পরিচ্ছেদে এবং এ পরিচ্ছেদে রাখী যা লিখেছে তা যে সে মুকুলের মৃত্যুর পরে জেনে থাকবে ঐ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ভাবে যতটা সে লিখেছে ততটা জানল কি করে? ডায়েরিতে কোন ইশারা নেই। আমার তো মনে হয়, এটা তার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য, যে সে একটা সামান্য সংবাদকে নিজের মনের

মধ্যে এমন ঘটনায় রূপান্তরিত করতে পারত। যেন স্ফুটনোন্মুখ এক লেখক, রৌদ্রদগ্ধ পাথরের মতো কালের উপরে পড়ে যার কাব্যরস শুকিয়ে গেল, 'আর্টিস্ট অ্যাজ স্টুডেন্ট' নামে একটা উপন্যাস লেখা হল না।

সদুর পুলিশ মেজদা সস্ত্রীক ঢাকুরিয়ায়। এ তো বোঝাই যাচ্ছে মেজদা বাবাকে অর্থ সাহায্য করতে চাকরি নিয়েছে এবং মাকে সাহায্য করতে বিয়ে করেছে। কিন্তু তাকে অনিবার্য কারণে পৃথক হয়ে যেতে হয়েছে। তার পর থেকে কথা আছে সদু মাসের প্রথম দিকে গিয়ে টাকা নিয়ে আসবে। আর সদুর এ সবই, অনেক কথাই, রাখীর ডায়েরিতে পাওয়া গিয়েছে। আর তাতেই সদুর মৃত্যু। রোল কুড়ি-র সঙ্গে তার যোগ প্রমাণিত।

আজও টাকা আনতে ঢাকুরিয়ার দিকে যেতে যেতে সে ভাবলে, মেজদাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না, কিন্তু বউদিকে জিজ্ঞাসা করবে, তাদের কেন চলে আসতে হল সরসুনা থেকে। হঠাৎ তার মনে হল, মেজদা কি সন্দেহ করছে তার—গোপন কার্যকলাপের কথা? সরসুনায় থাকলে আরও বেশি চোখে পড়তো, আরও বেশি জেনে ফেলতো? জেনে ফেলে পুলিশের উপযুক্ত কাজ না করা বিশ্বাসঘাতকতা হতো? সেই বিশ্বাসঘাতকতা করার আতঙ্কে পালিয়েছে? কতকটা যেন সদুর বাবার মতো নীতিপরায়ণ।

সদু বউদির সঙ্গে আলাপ করে দেখলে, সে জানে না।

কিন্তু মেজদার বাসার গলির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে যে আটফুট বাই আটফুট চায়ের খুপড়ি, তার সামনে মুকুলকে দেখে সদু অবাক হল। 'এখানে কি রে?' মুকুল যেন শুনতেও পেল না, এমন কি দেখতেও পেল না সদুকে। সদু কি ভুল দেখল? সেটাই সম্ভব।

মেজদা বাড়ি ছিল না। তার ফিরতে রাত হবে। রাত আটটা পর্যন্ত ডিউটি। বউদির কাছ থেকে টাকা নিয়ে সদু সরসুনার উদ্দেশ্যে রওনা হল। কিন্তু গলির মুখে এবারও সে মুকুলকে দেখতে পেল। তার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি আবার মেজদার বাসায় ফিরে গেল।

বউদি অবাক হল। সদু বললে, 'মেজদার সঙ্গে দেখা করেই যাই।' একটু ইতস্তত করে বললে, 'বউদি, একটা কথা বলি। মেজদাকে একটু সাবধানে চলা-ফেরা করতে বলবে। আজকাল, কাগজে পড়ছ তো, পুলিশ কর্মচারীদের খুবই বিপদ চলেছে।' বউদি প্রথমে তাকে মেজদা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে, পরে আবার বললে 'রাত নটা হয়ে যাচ্ছে। তুমি বরং অতগুলো টাকা নিয়ে আর রাত কোরো না।'

সদু স্টেশনের দিকে যায়। মুকুলকে দেখা গেল না। হঠাৎ সদুর মনে হল, সে কি দারুণ একটা ভুল করে বসল? সে কি দ্বিতীয়বার মেজদার বাসায় ঢুকে মুকুলকে জানিয়ে দিল মেজদার বাসা কোনটা।

ঢাকুরিয়া স্টেশনে গাড়ি আসতে মাঝে মাঝেই অনেক দেরি করে। রাত সাড়ে এগারতে এল নটার গাড়ি। :আর চলছেও দেখ। শেয়ালদায় পৌছাতে রাত বারোটা হল। নর্থ স্টেশনে এত রাতে ভিড় কম। গাড়িগুলো রাতের মতো ঘুমাতে শুরু করেছে এ লাইনে ও লাইনে। হঠাৎ সে চমকে ওঠে। যেন ভূত দেখার মতো। বড়দা ? না তার মতো চেহারার অন্য কেউ ? আজ আবার নাইট ডিউটি নাকি ? কাল ভোর থেকে যে গাড়িগুলো চলতে শুরু করবে ? তার ইলেক্‌ট্রিক ফিটিংস মেরামত করছে ? তবে মেজবউদি যে বললে, ছ'মাস হবে বড়দার চাকরি নেই ?

বড়দা ওদিকের তের নম্বর প্ল্যাটফর্মে রাখা একটা গাড়ি থেকে একটা ব্যাগ হাতে নেমে এল। ব্যাগটা বেশ ভারই। ভারের জন্য সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে না।

শেয়ালদায় গাড়ি ছিল না রাতের মধ্যে। দুই ভাই বসেছিল তারা প্ল্যাটফর্মের কোণ ঘেঁসে। রাতটা কাটাতে হবে।

হঠাৎ সদু, যেন ঘুমের ঘোরে বোকা হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার মেজ চাকরি করছে বাবাকে সাহায্য করতে, বিয়ে করেছে বউমাকে সাহায্য করবে বলে। তবে--? বড়দা বললে. সেও যেন ঘুমের ঘোরে, 'বোধ হয় আমাদের বাড়ির বিশ্বাসঘাতকতার আবহাওয়ায় থাকা ভালো নয় বলে ? থাকলে বিশ্বাসঘাতকতা—'

'আমরা বিশ্বাসঘাতক ?'

দুই ভাই-এর মুখই কালো হয়ে যায়।

বড়দা বললে. 'বাবার সেই গল্প মনে কর।'

সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবে সে কি সমাজের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করছে ?

সদু ভাবলে. সে কি ক্রমশ রোগা হয়ে যাওয়া ক্রমশ কালো হয়ে যাওয়া, স্নেহপ্রবণ এই লোকটার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে ? বড়দা কি এখনও ভাবছে না, সে প্রথম চান্সে আই. এ. এস. হওয়ার জন্য ছুটছে ?

সে বড়দার ঝোলাটার দিকে তাকায়। এখন তো দেখাই যাচ্ছে তাতে ফ্যানের আর্মেচার আর ব্লেড। সে জিজ্ঞাসা করতে ভয় পায়, বড়দা, এগুলো কি ওয়ার্কশপে ফিরে যাচ্ছে ?

সদু বলে, 'বড়দা, আজ তুমি বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছ ?'

বড়দা বললে, 'যা, যা ওসব কথা বাদ দে। চল চা খেয়ে আসি।'

সদুর ঘুম এসে গিয়েছিল। আলো তেড়ে আসছে অন্ধকারের মধ্যে। সদুর দু-মাস আগেকার সেই মিটিং-এর কথা মনে পড়ল। পি কে অধ্যাপকের বাড়িতে। অধ্যাপক বললেন, আত্মীয়তা ? বেশ কথা। এক কামার্ত পুরুষ কোনো কামার্তাতে, অথবা তাও নয় সে, বীজ নিক্ষেপ করলে। বলো তখন সন্তানের কথা ভাবে ? প্রায় অটোমেটিক। বলো কি দায়িত্ব পিতামাতার প্রতি সন্তানের ? অথবা ভাই-এর প্রতি ভাই-এর ? ফ্যামিলি রিলেশন একটা অত্যন্ত প্রাচীন প্যাট্রিআর্ক্যাল সমাজের ধারণা। বিপ্লবের প্রতিবন্ধক হলে, বাপ, ভাই, বন্ধু এদের সরিয়ে দিতে হবে। শুধু নিজের

গুরুজন নয়, সামাজিক গুরুজনকেও। যেমন রামমোহন। তা হলে তাকেই আঘাত কর।

কি দারুণ আলো! কি ঝম্ ঝম্ শব্দ। কি গরম! গাড়ির নীচে চাপা পড়লে এরকম লাগে।

বড়দার ধাক্কায় সদুর ঘুম ভাঙল।...তোর ব্যাগটা কি হল, বড়দা? · চল, চল, চল, গাড়ি ধরতে হবে।...ব্যাগটা?...চল গাড়ি ছাড়বে এখনি।...ব্যাগটা?...হঠাৎ সদুর মনে পড়ে টাকার কথা। পকেটে হাত দিল সে। না, টাকাটা ঠিক আছে।

সে রুমাল বার করে ঘাম মুছলে। কি স্বপ্ন। মনে হচ্ছিল, ট্রেনটা গরম নির্লজ্জ কিছু যা শরীরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। আশ্চর্য! স্বপ্ন ভাবছে কেন? এই আলাপই তো হয়েছে। অধ্যাপক পি কে বলেছিল, সেদিন গাড়িতে কে তর্ক করেছিল? তোমার দাদা? কোথায় কাজ করে? পুলিশে? সেই সময়ে অধ্যাপকের সেই পাঁচ বছরের মেয়েটা সদু যাকে একটু আদর না করে পারে না, যার জন্য একটা টফি বা লজেঞ্জ না কিনলে চলে না, সে এসেছিল। তার দিকে আর তার বাবার দিকে চেয়ে চেয়ে সদু অবাক হয়েছিল। সম্বন্ধটা কি মিথ্যা? এক রাত্রির স্ত্রী-আরোহণের ফল। সদু অনুভব করলে, তার আঠার বছরের পুরুষ শরীরটাকে কেউ রেপ্ করেছে। রাখী সদুর কাছে শুনে ডায়েরিতে না লিখলে পিকের সঙ্গে যোগটা ধরা যেত না। জানা যেতো না সদুর বড়দা, সেই ছাঁটাই ইঞ্জিনীয়ার ট্র্যাকশানের তার সরাতে গিয়ে কোচের ছাদে ইলেকট্রোকিউটেড্ হয়েছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ। রাখীদের কথা।

রাখী একদিন প্রস্তাব করলে, ললিতা বাবার চা করে দেবে, আর সে মাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে।

'কোথায়?'

'সেই যে মন্দিরে। খুব দূরেও নয়, খুব কাছেও নয়।'

'কোনটা? সেই স্বর্ণমৃগ?'

'অবাক করলে। স্বর্ণসীতা তো। বাবা ঘুমের ঘোরে বলেছেন, না হয় তুমি ঘুমের ঘোরে শুনেছ।'

কমলা দ্বিধা করেন। কি পরে যাব? গত পাঁচ-ছ বছরে একদিনও বার হননি। কোথায় শাদা উজ্জ্বল শাড়ি। হাত গলা খালি। কমলা বিছানার প্রান্তে বসে পড়েন। কিন্তু রাখী ছাড়ে না। নিজে চুল বাঁধতে বসে। 'না, না, ও রকম নয়, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।' দু বোন যেন।

কমলা বললেন, 'রাখী, সেদিন ওরা অনেক প্রসাদ দিয়েছিল, যদি ভাবে—'

'আমরা লোভে পড়েছি?'

'সে তো রোল ষোল। আমি না হয় বরং স্পষ্ট ক'রেই বলব—। তা নয়, মা।

জানো, আমি গরীব, এ কথা যদি ঢাকতে না হয়, তবে সে যে কি আনন্দ, তা তোমাকে কি বোঝাব। আমি একদিন বুঝেছি।' কমলার চুল বাঁধতে বাঁধতে রাখী বলে, 'আমি পরে ভেবেছি স্বর্ণসীতাকেই তোমার পূজা করা উচিত।'

'কেন ?'

'একেবারে ঠিক তোমার উপযুক্ত। কার এত দুঃখ, কার এত গৌরব ? কার স্বামী—'

'থাম্। পাজী মেয়ে। তোরা তাই করিস, বাপ মেয়েতে, আমি মরে গেলে।'

পথে রাখী একবার বললে, 'আমার মনে হয়, মা, যে লোকটি প্রথম এই পূজা করেছিল, সে বুঝেছিল তার কবিপ্রাণে, ব্যথা, বিরহ, ব্যর্থতা মানুষকে পবিত্র করে।'

কমলা অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, 'এখনও কি তা হয় ?'

তখন আলো জ্বলতে শুরু করেছে দোকানে। আর নোংরা ঘিঞ্জি হয়ে যাওয়া কলকাতাতেও সেই আলো এখনও মানুষকে ধাঁধায় ফেলতে পারে। অনেকদিন পরে পথে এসে কমলার মুখে আলো পড়তে লাগল। দোকানে দোকানে কত ঝক্‌ঝকে রঙের কত শাড়ি, কত কাপড়। কত বা দাম। জিজ্ঞাসা করব ? না, না—

রাখী ভাবলে ঝক্‌ঝকে শাদা জমিতে ছোট্ট ছোট্ট নীল আর কমলা ফুল ছাপা নীল আর কমলায় মিশানো পাড়ের শাড়িটা কী সুন্দর মানাতো কমলাকে।

ইণ্ডিয়া রেড্ রঙের জামা পরে একটি অ্যাংলো যাচ্ছিল। দেখতে সুন্দর লাগছে। কমলা ভাবলেন, মেয়েকে বলা উচিত, দেখ কি নির্লাজ। বললেন, 'দেখ, দেখ—।'

'সুন্দর লাগছে না ?'

'তা হলেও বেশ কিন্তু, তাই নয়। এতটুকু গহনা নেই, এমন-কি কাচের চুড়িও নয়।···দোকানটায় অত ভিড় কেন রে ?'

রাখী দেখে এসে বললে, 'রিডাকশনে আর্টিফিসিয়াল সিল্কের কাপড়। কি সুন্দর, আর কত সস্তা।'

'কোনোটায় একটা ফুটো, কোনোটায় একটু রঙ জ্বলা।'

'তার মানে সেই সব আড়াল করে পরতে হয়, কিংবা কেটে জামা বানাতে হয় ওই অ্যাংলোটার মতো।'

এর কিছুদিন পরে থেকেই রাখীর একটা ঝোঁক দেখা দিল বিকেলের দিকে পুরনো ফ্রক স্কার্ট পরে একা একা পথে পথে ঘুরে বেড়ানো। এ রকম বেড়াতে-বেড়াতে একদিন সে একটা কাজ করে বসলো। লখীবাবুর আস্‌লি সোনা চাঁদির দোকানে ঢুকে তার এক হাতের বালা বিক্রি করে ফেললে।

তারও মাস দু-এক পরে এক বিকেলে রাখী বললে, 'একটা কথা বলব। আমার কাছে শ'-পাঁচেক টাকা আছে। চল খান-তিনেক শাড়ি কিনি ?'

'টাকা কোথায় পাবি ?'

'প্রাইভেট টিউশানি। সত্যি বলছি মা।'

ললিতা হেসে বললে, 'রাখী, ঠাট্টা করিস না, গল্প ফাঁদিস না।'

'বিশ্বাস কর দিদি। টাকা থাকলে ভালো হয় না ? তোর অমন চোখ দুটো চশমার অভাবে নষ্ট হচ্ছে। চল আজ তোর চোখ দুটিও দেখিয়ে আনি।'

'তুই সত্যি বলছিস ?'

সকলেই মনে করল রাখী এখনই হেসে উঠে বলবে, শূন্যে সৌধ নির্মাণ। পাছে ঠকতে হয় তাই কমলা আগে থেকেই হাসি-হাসি মুখ করলেন।

রাখী আঁচলের আড়াল থেকে টাকা বার করে বললে, 'এই দেখ।'

কমলা আর্তনাদ করে উঠলেন। ললিতা বিবর্ণ হয়ে গেল।

ললিতা বললে, 'রাখী প্রাইভেট পড়ালে এত টাকা হয় না, অত বড় নোট হয় না।'

কমলা বললেন, 'বল্ বল্, কোথায় সর্বনাশ করলি ?'

'রোল ষোল দিয়েছে টাকা ?'

কমলা কেঁদে ফেললেন।

এর পরে রাখীও কেঁদে ফেলল। সে বললে, 'আমি তোমাদের ঠকিয়েছি, কিন্তু কি করে ভাবতে পারলে, কি করে ভাবতে পারলে ?'

ললিতা বললে, 'রাখী, আমরা কি হয়েছি দেখ। পরস্পরকে বিশ্বাস করি না। আমি জানি এটা প্রাইভেট টিউশানি নয়, আমি জানি রোল ষোল বা আর কেউ দেয়নি ; মাও মনে মনে বিশ্বাস করেন না। অথচ—'

রাখী কাঁদতে কাঁদতে এই দারুণ মানসিক অনুদারতায় যুক্ত মধ্যবিত্ত সম্ভ্রমের শেষ চিহ্ন তার গলার সরু হারটা, আর হাতের অবশিষ্ট বালাটা খুলে নিরাভরণ হতে গেল।

আর তা দেখে ললিতার মাথায় বুদ্ধি এল। সে বললে, 'বিক্রি করেছিস, কিছু বিক্রি করেছিস।'

তখন তো সব বোঝাই গেল। কমলা পালিয়ে গেলেন। লজ্জায়, বেদনায় তার মনটা স্তম্ভিত হয়ে বোকার মতো ফোঁপাতে লাগল। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, তাঁর কোলের মেয়েটা কি বড় হয়ে গেল ?

কিন্তু অত সহজে নিষ্কৃতি হয় না।

সেদিনই আরও সব ঘটতে লাগল।

কিছু পরে ললিতা কমলাকে গিয়ে বললে, 'মা, আমি রাখীকে নিয়ে একটু বাইরে যাচ্ছি, চোখটা দেখিয়ে আসি।' কমলা বললেন, 'রাখীকে আমি ভয় করি, বাপু, তাই যাও। ওকে ঠাণ্ডা করো।'

চোখ দেখিয়ে ফেরার পথে রিডাক্‌শন্ সেলের দোকান থেকে তিনখানা শাড়ি

কিনলে তারা। একটা শাড়ি, হালকা কমলায় সাদা আর আকাশী নীলে মাধবীফুল ছাপা, কিন্তু অত সুন্দর শাড়িটা আঁচলার দিকে ছ-সাত ইঞ্চি ছেঁড়া। ললিতা বলল, 'এটা কি করে পরবি, আঁচলাকে কোল আঁচল করা যায় না?'

শুকনো ফোঁপানির একটা তরঙ্গ উঠল মনে, সেটা চেপে রাখী বললে, 'টাকা দিয়ে চল, বলছি।'

পথে তাদের পুরনো দর্জির কাছে গেল। বুড়ো জানালে, সে ম্যাক্‌সি বানাতে পারে না। তবে অন্যকে দিয়ে বানিয়ে দেবে বলে মাপটা নিয়ে রাখলে।

কমলা শুনলেন। নির্জীবের মতো শাড়ি হাতে করে নিয়ে বললেন, 'রেখে এস আলনায়।'

ললিতা বললে, 'মা, তোমার শরীর খারাপ করেছে?'

রাখী গিয়ে কমলাকে জড়িয়ে ধরলে। ছ-সাত বছর আগেও যা করত তেমন করে চুমু খেলে। বললে, 'ম্যাক্‌সি করতে দিয়েছি। দেখো তোমার রাখীকে সেই অ্যাংলোর চাইতে সুন্দর দেখাবে। ক্লান্ত লাগছে। একটু চা করবে, মা?'

নবম পরিচ্ছেদ। খড়দহের মুকুল।

রাখীর অসমাপ্ত উপন্যাসের এটাই শেষ পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধান্ত করলেও সেটা এমন-কি নিজের কাছেও সব সময়ে কথায় স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব নয়। দর্জির দোকান থেকে সেই ম্যাক্‌সিটাকে নিয়ে আসতে আসতে রাখী স্থির করলে, এ তো শুধু ম্যাক্সি পরা নয়, এক দারুণ আধুনিকতায় পৌঁছে সব অলঙ্কার থেকে, সব সোনার অভাব থেকে মুক্তি।

কলেজের প্রথম দিকেই ক্লাস। নটাতে স্নানের ঘরে ঢুকবার আগে সব অলঙ্কার খুলে ফেললে রাখী। কোথা থেকে সে আজ খানিকটা সাহস সংগ্রহ করেছে যা নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। এ বাড়ির যা প্রথা নয়, ঝপ্ করে নিরাবরণ হল। তার সদ্য আঠার পার হওয়া বয়সে পৌঁছাতে গত দু-তিন বছরে শরীরে যে-সব পরিবর্তন হয়েছে তা একসঙ্গে অভূতপূর্বভাবে জন্ম নিল। সে দুম করে ভেবে বসলে, একটা আস্ত মানুষ কিন্তু......আর পরে পাহাড়ের মতো হলেও, কচিকচি মুখে এখান থেকেই খেতে হয়।...সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু এই চুলগুলোও নয়। দিদির চুল কোমর ছাড়িয়ে পাছা ঢেকে পড়ে। আসলে ভগবান দিদিকে সুন্দর করেছে...

স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে, ললিতাকে স্নানে পাঠিয়ে কমলার সেলাই ঝুড়ি থেকে কাঁচি নিয়ে সে পড়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলে। আগা থেকে তিন চার ইঞ্চি কাটা সহজ। পরের তিন ইঞ্চি যেন কাটতে চায় না, যেন কাঁচিতে ধার কম, হাতেই ব্যথা লাগছে। পরের ছ ইঞ্চি কাটতে সে হাঁপাতে লাগল, চোখে জল এসে গেল। কাগজের উপরে রাখা কালো রেশমের মতো সেই চুলগুলো যেন এক গোপন পাপের প্রমাণ।

ললিতাই রোজ চুল আঁচড়ে দেয়। অন্যমনস্কের মতো, সে তো সব সময়েই পড়ার জগতে, চিরুনি নিয়ে এগিয়ে ভয়ে বিস্ময়ে সে ওমা বলে চিৎকার করে উঠল। কমলা ছুটে এলেন। তখন তিনটি স্ত্রীলোক নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তিনজনের বুক ওঠানামা করতে লাগল। অবশেষে কমলা বললেন, 'দোহাই, বাপের সামনে গিয়ে পিতৃহত্যা করিস নে।'

বই খাতা নিয়ে রাখী যখন বেরিয়ে যাচ্ছে নিজের পেটের মেয়েকে সেভাবে যেতে দেখে কমলার মনে হল কিছু যেন ছিঁড়ে গেল। সেই দুঃসহতাকে কাটিয়ে উঠতে ললিতা জোর করে হেসে বললে, 'দেখ, মা, মিস ১৯৭৫।' রাখী যখন রাস্তায়, তখন তাকে জানলা দিয়ে দেখে বললে, 'ও কিন্তু হাসছে, মা।'

কলেজে স্বাতীর সঙ্গেই প্রথম দেখা। সোজা চোখ তুলে চাইল রাখী। তার পাশের চেয়ারটায় বসে টেবলের উপরে প্রকাশ্যে সোনা-ছাড়ানো হাত দুখানাকে লম্বা করে রাখলে চোখের সামনে। কপালের ঘাম মুছবার অছিলায় আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে অলঙ্কারমুক্ত লম্বা গলাকে দেখলে আয়নায়. এ পাশে ও পাশে দাঁড়িয়ে চুল সরিয়ে অলঙ্কারমুক্ত কান দুটোকেই আয়নায় প্রতিফলিত করলে। সে চেয়ারে ফিরলে স্বাতী বললে, 'এ মা, সব খুলেছিস ?' রাখী বললে, 'কেমন দেখাচ্ছে ? খুব খারাপ ?' সে উঠে দাঁড়াল, যেন নিজেকে মেলে ধরতে। জামার ঘেরকে এদিকে ওদিকে টানলে, ফলে জামাটার বুকে ঝকঝকে ঢেউ দুলে উঠল। নন্দা খপ্ করে বললে, 'ব্রেস পরিস নি ?' রাখী বললে, 'না তো, তাই পরতে হয় ?' স্বাতী খানিক পরে বললে, 'যাই বলিস, তোর ওই রোল ঘোলকে কিন্তু......।' রাখী বললে, 'আমার ? বা, আজ আবার তোদের তার কথা মনে হল কেন ? খুব দেখাচ্ছে না কি আমাকে ?'

ক্লাসে সুহাসকে দেখা গেল না, দ্বিতীয় ক্লাসেও না। তখন রাখীর মনে পড়ল ক্যান্টিনে সেই একদিন সদু আর সুহাসের সামনে তার গরিব হওয়ার লজ্জা ভেঙেছিল। তৃতীয় ক্লাস না করে, রাখী সুহাসকে খুঁজতে বার হল। এক জায়গায় শুনলে পার্ট ওয়ানের রেজাল্ট বার হয়েছে। তার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, দিদির রেজাল্ট। দিদিকে খুঁজল সে। কলেজেই আসে নি নাকি ? অফিসের দিকে এগিয়ে সে দেখলে ভিড়ে ভিড়ে ছয়লাপ। সেই ব্যূহ ভেদ করা তার কর্ম নয়। সে কমন-রুমে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, বিকেলের দিকে যদি ভিড় কমে। চারটের সময়ে তার মনে হল, এই খবরটা পেতেই সুহাসকে দরকার। তৃতীয়বার খুঁজতে বেরিয়ে ক্যান্টিনে গিয়ে রাখী দেখতে পেলে, সুহাস নোংরা একটা টেবলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে।

রাখী বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে লম্বা করে হাত বাড়িয়ে সুহাসের কাঁধে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিলে।

সুহাস ধড়মড় ক'রে উঠে বসল, রুমালে চোখ মুখ মুছলে, রাখীর দিকে প্রায়

আধমিনিট চেয়ে থেকে বললে, 'সাবাস্ কি ফর্ম ?'

রাখীর বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল। 'কোথায় লুকাবে ?' স্বাতীর কথা মনে পড়ল : সত্যি, দেখ, সুহাসের চোখের কোণে গভীর কালো, গাল দুটো শুকনো।

রাখী খপ্ করে বললে, 'জান, স্বাতী বলে...চরিত্র খারাপ।'

সুহাসের উনিশ বছরের মুখে কালো ছায়া পড়ল। একটু পরে সে বললে, 'মিথ্যা বলে না। স্বাতীর ঝক্‌ঝকে গহনা, শাড়ি, কসমেটিকের সুবাস, লোভ হয়ই তো। আবার এখন তোমাকে লোভ হচ্ছে।'

'এ রকম কথা হলে আমি চলে যাব।'

'সাবাস এর পরে এক গ্ল্যাডিওলি বলবে আমি ফুটব না।'

কিছু একটা তাড়াতাড়ি বলা দরকার মনে করে রাখী বললে, 'তার আগে একজনের অন্তত পঁচিশ হওয়া দরকার।'

সুহাস খিলখিল করে মেয়েলি গলায় হেসে উঠল, গালে হাত বুলিয়ে বললে, 'তোমার এই সুন্দর স্ন্যাপ্ আর পোশাক, দুই-ই সেলিব্রেট করা দরকার। কত আছে সঙ্গে ?'

রাখী বই-এর ভাঁজ থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে বললে, 'দিদির রেজাল্টও সেলিব্রেট করা চাই। পার্ট ওয়ানের বেরিয়েছে। অফিসের ব্যূহ ভেদ করতে সাহায্য কর, ভাই।'

প্রকৃতি প্রাণীকে আত্মগোপনের কৌশল শেখায়, মানুষও যে সে শিক্ষা নিতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। সুহাস মৃদুস্বরে সদু বলে ডাকল। কোথায় সদু ? রাখী অবাক হয়ে এদিক ওদিক চাইল। অবশেষে দেখলে ক্যাণ্টিনের যে দিকটা প্রায় অন্ধকার, যে দিকের দেয়াল বাসি শ্লোগানে শ্লোগানে সব চাইতে ময়লা, সেদিকে মুখ ফিরিয়ে যে ছাত্রটি বসেছিল সেই উঠে দাঁড়িয়ে সদু হল।

একটু অবাক কাণ্ডই ! কেন বসেছিল সে তেমন করে ? সুহাসের ঘুমকে পাহারা দিতে ? কিংবা সদুর মনটাই ছিল অন্ধকার বাসি শ্লোগানে কুৎসিত দেয়ালটার মতো ? কিংবা দুই-ই ?

সুহাস বললে, 'মুকুলদা কলেজে এসেছে কি না, জান ?'

সদু জানালে, 'এসেছে, না এলে ভালো ছিল। পি কের সঙ্গে তর্ক করে এখন পশ্চিমের করিডরে বসে আছে।' 'কেন ?'

'একে নিয়ে যাই তা হলে।' সুহাস একটু ভেবে বললে, 'তার চাইতে বরং দরকার বলে ডেকে আনি !'

সুহাস রাখীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল মুকুলের খোঁজে।

এই সুযোগে আমরা একটা আলোচনা করতে পারি। রাখীই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এটা জানার পর, একজন এটাকে তার চৈতন্যস্রোত রূপে দেখাতে বলেছে। সব ঘটনা তার চোখের সামনে ঘটেছে এ রকম দেখাতে পারলেও ভালো

হত। তা হয় না। আমাদের মেনে নিতে হবে সদু, সুহাস, মুকুল নিজেদের কথা কিছু কিছু রাখীকে বলে ফেলেছিল, বেশ খানিকটা অন্তত বলার আগ্রহ দেখা দিচ্ছিল, আর এই আগ্রহটা তাদের চরিত্রের প্রবৃত্তি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আগ্রহ থাকলেও সব কথা বলা হয়ে ওঠে না। একটা গোপন সংগঠনের দিকে রাখী তখন অজ্ঞাতসারে অগ্রসর হচ্ছিল। তখনকার পরিস্থিতিতে কিছু ঘটনা তার চারিদিকে ঘটছে, সে জানছে না, অথচ আমরা জানছি এমন করেও দেখানো দরকার। যেমন বাইতোড় সরসুনা পরিচ্ছেদগুলো দেখানো হয়েছে।

যেতে যেতে সুহাস বললে, 'মুকুলদা আমাদের ইরেজি ডিপার্টমেন্টের অথরিটি। হায়ার সেকেণ্ডারিতে বিরাশি পার্সেন্ট। ভয়ের চোটে পার্ট-ওয়ান দেয়নি। এখন শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা করে। ছ-ফুট, দেড় মণ। আমরা ভেক্টর জনসনও বলি। কথা বলাই নেশা।'

মুকুলকে নিয়ে তারা সঙ্গে সঙ্গেই ফিরল। মুকুল ক্যাণ্টিনের কাছে নিজেই এসে পড়েছিল। মুকুল বেশ নাটকীয়ভাবে এল, মাথায় অনেকটা ব্যাণ্ডেজ, বাঁ হাত স্লিং-এ ডান গালে স্টিকিং প্ল্যাস্টারের চ্যাড়া। তাকে ছ-ফুট দেখাচ্ছে না।

সুহাস কয়েক সেকেণ্ড অবাক হয়ে থেকে বললে, 'বাঃ, এ যে বাতিল বন্ধু।'

মুকুল বললে, 'ভাল্লাগছে না। কি দরকার বল ? একটু জল খাওয়া।'

রাখী মুকুলের জন্য কাউণ্টারে জল আনতে গেল।

সুহাস বললে, 'ট্রাম থেকে পড়েছ, না, বাসের ধাক্কা খেয়েছ ? কলেজে এলে কেন ?'

'দুই-ই। মনে হল আসি।'

সুহাস বললে, 'খুবই শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে তোমার গল্প। কিন্তু পার্ট ওয়ানের ইংরেজির রেজাল্ট সম্বন্ধে এই মহিলা কিন্তু শুনতে চান।'

মকুল জল নিয়ে রাখীকে নজর করে বললে, 'ও আপনি ?' তারপর আর এক-বার দেখে নিয়ে বললে, 'ও, নো, সরি। সিমিলারিটি থাকলেও সে আপনি নন। আপনিও কি ইংরেজি পার্ট ওয়ান দিয়েছেন ?'

মুকুল তৃষ্ণার্তের মতো জল খেলে। রাখী বললে, 'আমার দিদির খবর—'

'দিদি ? মানে, ও, কনগ্র্যাচুলেশনস্। তাই বলুন, আপনি ললির বোন ?

রাখী জানালে তার দিদির নাম ললিতা। কনগ্র্যাচুলেশনস্ পেয়ে দিদির রেজাল্ট ভালো হয়েছে ভেবে, সে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মুকুল বললে, 'না, ললিতার রেজাল্ট ভালো হওয়ার কথা নয়, হয়ও নি। 'বি ক্লাস।'

রাখীর মুখ ছাই হয়ে গেল। কপাল যেন ঘেমে উঠবে।

সুহাস রেগে উঠল। কি রসিকতা করছিস, মুকুলদা, তা হলে অভিনন্দন জানাচ্ছিলি কেন ?'

মুকুল বললে, 'সরি, আজ আমার মাথাটা একটু ডেজড্।' আপনি কিছু মনে করবেন না, মিলি ; মানে ললির বোন হওয়াই অভিনন্দনযোগ্য।

রাখী গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমার দিদির নাম ললি নয়, আমার নামও মলি নয়।'

মুকুল বললে, 'কিন্তু আমি আপনার দিদিকে ললি বলে ডাকলে উত্তর দিয়েছিল। যাকগে দুঃখিত হবেন না। আপনাদের কি আড়াইশো টাকার টিউটর আছে ? আপনাদের বাবা, কাকা, মামা, কেউ কি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল ? না না, আমি বলছি না র‍্যাকেট···'

সুহাস বললে, 'ভালো গবেষণা তো !'

মুকুল বললে, 'ভালো হল কোথায় ? ইচ্ছা আছে কোন বছর ফার্স্টক্লাস কত পার্সেণ্ট চান্স, কত পার্সেণ্ট বংশগত, কত পার্সেণ্ট টাকায় তার একটি গ্রাফ বানাব।'

সুহাস বললে, 'সে তোমার ব্যর্থতার হিংসা।'

'বটেই তো। যে পায় না সেই তো বিদ্রোহ করে, হিংসাও থাকে ; তাই বলে সত্যটা মিথ্যা হয় না। আমার থিসিস হেরিডিটি কতটা কাজ করে দেখানো। রবীন্দ্রনাথের ছেলে রবীন্দ্রনাথ হয় না, কিন্তু ফার্স্টক্লাসের ছেলে প্রায়ই ফার্স্টক্লাস হয়। কিন্তু সুহাস মাথাটা ডেজড্ লাগছে। মেলা ইনজেক্‌শন দিয়েছে। দুর্বল লাগছে। বুঝলেন, কি যেন আপনার নাম, কাউকে না কাউকে একদিন বলতে হবে রাজা ন্যাংটা। সুহাস কিছু খাওয়া। শালারা হ্যাণ্ডেল দিয়ে মারবে বুঝি নি।'

কথাটা রাখীর সামনে বলে ফেলে মুকুল অপ্রতিভ হল। বললে, 'ওই হল বাসের হ্যাণ্ডেলটা লাগল মাথায়।'

ক্যাণ্টিনে ভালো খাবার কিছু ছিল না। সেজন্য তারা কফি হাউসে গিয়েছিল। মুকুল, সুহাস আর রাখী। সদু যায় নি। সম্ভবও নয়। মানুষ কত সয় ? মেজদার বাড়ির সামনে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে এই মুকুলকেই দেখেছিল সদু, আর পরে তার পুলিস মেজদাও। সদু হয়তো বলে নি। রাখীর ডায়েরী প্রমাণ, সদুর মেজদার অজ্ঞাতনামা কারো ছোরায় মৃত্যু হয়েছে। খবরের কাগজে মেজদার বাড়ির পরিচয় ছিল। রাখী ইতস্তত করছিল। এদের সামনে চোখে জল এসে যাবে, এই দারুণ লজ্জায় চোখে জল এসে গেল। তখন দুম্ করে তার মনে হল, এতদিন তারা সে, দিদি, আর মা পরস্পরের দুঃখ মনে নিয়ে মুখ কালো করে বেরিয়েছে। কেন তা করবে ? প্রত্যেকের জীবনেই যথেষ্ট দুঃখ আছে, যার যার দুঃখ নিজে নিজে ভোগ করাই ভালো। তাছাড়া সুহাস বললে, 'রাখী যদি না যায় তা হলে তো টাকাটা ধার দেয়ার সামিল হবে।'

কফি হাউসে ততটা ভিড় ছিল না। চপ্ আছে জেনে সুহাস অনেকগুলো চপের অর্ডার দিয়ে বললে, 'তুমি জানো না রাখী, মুকুলদা এ বিষয়ে প্রাইমো কার্নেরা। বলে চপে যে পরিমাণ আলু থাকে ঠিক ততটা মাংস লাগে গায়ে।'

মুকুল তৃষ্ণার্তের মতো জল খেলে।

কিন্তু চপ আসবার আগেই তাদের টেবিল বদলাতে হল। হঠাৎ যদি মুখে রো এসে লাগে গ্রীষ্মের, কিংবা সস্তা চায়ের দোকানে যদি বাসি আঁসটে গন্ধ আসতে থাকে, তা হলে এ রকম টেবিল বদলানো দরকার হয়। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম ছিল। তারা যে টেবিলে বসেছিল তার পাশেরটিতে দু-তিনজন ত্রিশোত্তীর্ণ কফিপায়ী। তারা বেশ অকুণ্ঠিতভাবে আলাপ করছে। আলাপের বিষয়টা…

[এখানে রাখী অনেকবার লিখেছে এবং কেটেছে পাণ্ডুলিপি। বোঝা যায় সে সাহস করেও রিয়্যালিস্টিক লেখার খ্যাতিরেও কলমের মাথায় শব্দগুলো আনতে পারেনি।] অবশেষে লিখেছে—কি লজ্জা! কি লজ্জা!

…বোঝা যায় তারা অত্যন্ত লোভাতুরভাবে মাংস সম্বন্ধে আলাপ করছে, প্রকাশ্যে এই কফি হাউসে; সে মাংস মেয়েমানুষ; আর সে মেয়েমানুষ নিজেদের স্ত্রী নয়, অন্যের স্ত্রী কিংবা কন্যা। সুহাসের কানও লাল হয়ে উঠেছিল। রাখী টেবিলের দিকে মুখ নামাতে বাধ্য হয়েছিল। কথা বলতে না পেরে খুব খারাপ এবং নিজে-দেরও অশ্লীল বোধ করে, সুহাস বললে, 'জুভেনাইল—।' রাখী চিবুক শক্ত করে, চোয়াল শক্ত করে বললে, 'পিউরাইল—' কিন্তু মুকুল উঠে দাঁড়িয়ে কথা ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'বিলিতি কুত্তার ঘেমো গন্ধ। চ সুহাস, ওই কোণের টেবিলে।'

অন্য টেবিলে বসে সুহাস বললে, 'অত জোরে বললি, মুকুলদা। যাক গে। তা তোর তো কোনো হস্‌পিটালে থাকা উচিত ছিল।'

মুকুল বললে, 'ছিলাম তো। কিন্তু ওরা বললে আনজুডিশাস্ হবে।'

'অ্যাকসিডেন্টেও?'

'বললে তো। অথচ হসপিটালে, দেখ গে, লেখা আছে বাঁশদ্রোণীর হেরম্ব হুই হয়েছি আমি। আর লিখিয়েছি অ্যাকসিডেন্টটাও হয়েছে বি-বা-দী বাগে, গেঁয়ো লোক হাইকোর্ট দেখতে থাকলে যেমন হয়। তা ওরা বলছে পুলিস নাকি ঠিক খুঁজে বার করবে, আজ বি-বা-দী বাগে ন'টা দশটায় এমন অ্যাকসিডেন্ট হয় নি। আর বাঁশদ্রোণীতে হেরম্ব হুই যদি থাকেও, তার বয়স বাহাত্তর হতে পারে। তা ওরা থাকতে দিলে না হসপিটালে। তা একদিক দিয়ে ভালো করছে। বিপক্ষের দুজন বেলা এগারটার মধ্যে পাশের বেডে এসে গেল। অন্তত একজন মিটমিট করে তাকাচ্ছিল, যেন চেনার চেষ্টা করছে।'

রাখী চোখ বড় বড় করে শুনছিল, সে বললে, 'কিন্তু আপনাকে হসপিটালে যেতে হবে কেন? কারা থাকতে দিল না?'

তা লক্ষ করে সুহাস বললে, 'মুকুলদা, তোর কথায় এই ভদ্রমহিলার মনে হচ্ছে, অ্যাকসিডেন্ট একটা ছল। সুতরাং তুই যে ছিনতাই করতে গিয়ে মার খাস নি, কোনো বোকামি করেছিস, তা এঁকে বলা দরকার।'

'বোকামি ব'লে!'

চপ এসে পড়ায় একটু স্বস্তি পেল রাখী, বললে, 'নিন, খান।'

মুকুল বললে, 'মিস্ ভট্ট, ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন, এমন করতে যাবেন না। কি কষ্ট হচ্ছে, কত রকমের ব্যথা, ইণ্টারন্যাল হেমারেজ হচ্ছে কিনা কে বলবে।' এই বলে হাসার চেষ্টা করলে।

রাখী বললে, 'খাচ্ছেন না কেন ?'

মুকুল বললে, 'আর, প্লিজ কিপ্ এ সিক্রেট। ললিতাকে বলবে না, কেমন ? অন্তত দু-একজন থাক যারা আমাকে বেকুব মনে করবে না।'

এই সময়ে মুকুল তার গল্পটা বলেছিল। শেয়ালদার কাছেই একজন বছর-ষাটের বয়সের লোকের উপরে অন্য একজন তর্জন গর্জন করছে। একটি স্ত্রীলোক ভদ্রলোকটির পাশে দাঁড়ান। নানা পোশাকে, মানে টেরিলিন, টেরিকট, নামই জানি না ছাই, সেই-সব শার্ট প্যাণ্ট, সিল্কের শাড়ি পরে ক্যালকাটানরা ব্যা ব্যা করতে করতে চলেছে। মুকুলও কেটে পড়ছিল। এমন সময়ে সেই লোকটি ওই বুড়োটির কলার চেপে ধরলে। তা তো ধরতেই পারে, কারণ সেই লোকটি ট্যাক্সিওয়ালা, আর শহরটা কলকাতা। দৌড়তে শুরু করে মুকুল, দেখলে হঠাৎ, বুড়োর সঙ্গের স্ত্রীলোকটি আসন্ন প্রসবা। তার মুখে যন্ত্রণা।

(এই জায়গায় উত্তেজিত হয়ে রাখী বলেছিল, তার পর ?)

তোমরা শুনলে হাসবে সেই অজাত মানুষটিকে 'কিছু মনে কোরো না ভাই', বলে মুকুল সরে পড়েছিল। তখনই সে বেকুব হল। হঠাৎ অনুভব করল, অজাত মানুষটি সে নিজে, তার দমবন্ধ হয়ে আসছে, লজ্জায় হাত পা ছুঁড়তে ইচ্ছা করছে, কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করছে। তা মুকুল তখন ট্যাক্সিওয়ালাকে বললে, ওহে, টাকা নেবে দিচ্ছি, সওয়ারির কলার ধরার রাইট লাইসেন্সে নেই। তা সেই ট্যাক্সিওয়ালা বললে, ওহে, বলছ কেন, হে, ভদ্রলোক বলে মনে হয় না ? মুকুল বলেছিল, ট্যাক্সিওয়ালাকে, বড় জোর ইংরেজি ক'রে ক্যাবি বলে, কোনো ডিক্শনারিতে ভদ্রলোক বলে না।

(সুহাস এই জায়গায় বলেছিল : বেশি কথা বলা তোমার দোষ হয়েছে।)

তা মুকুলও বোঝে। সেই ক্যাবিও তা বলেছিল। তাতেই মুকুলের রাগ চড়ে যায়। ওদিকে কথাবার্তা না বলেই বা কাউকে দুম্ করে মেরে বসা যায় ? মুকুল বুড়োকে বলেছিল, মেয়েকে নিয়ে কেটে পড়ুন। ব্যথা উঠেছে বোধ হয়। তো ক্যাবি বললে, রূপিয়া তেরা বাপ দে গা ? ব্যাপারটা বোঝ।

(সুহাস এই জায়গায় বলেছিল, কারো গ্রিভাস হার্ট হয় নি তো ?)

মুকুল বলেছিল, সুহাস বিশ্বাস করতে পারে ঘুষোঘাঁষার বেশি হত না। ওদের একটা একতা আছে। ইউনিয়ান তো! চার পাঁচজনে ঘিরে ধরেছিল, হাত চালাচ্ছিল। কিন্তু তারা হ্যাণ্ডেল দিয়ে না মারলে মুকুল তাদের চপ্ করত না ?

(রাখী ভয়ে ভয়ে বলেছিল চপার ?)

মুকুল বলেছিল। 'দূর, হাতের তেলো। বিশ্বাস করতে পারেন, মিস্ ভট্ট, হ্যাণ্ডেল দিয়ে বাঁ হাতটা ভেঙে না দিলে সেই গরিব ছোকরার নাকটা বাঁচত। আর মাথায় স্প্যানার না মারলে—'

রাখীর চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠল। সে বললে, 'তুমি কিন্তু খাচ্ছ না, মুকুলদা।' মুকুল বললে, '(তার মুখটা ভয়ে ফ্যাকাসে দেখাল), আচ্ছা, সুহাস, নাকের ব্রিজ চেপ্টে গেলে কিংবা ঘাড়ে চপ্ পড়লে মানুষ কি সত্যি মরে? নাকের ব্রিজ ভাঙাটাকে মুখে অক্সিজেনের নল দিয়ে পাশের বেডে শুতে দেখলাম। কিন্তু যার ঘাড়ে চপ্ পড়েছিল তার কি হল?'

সুহাস বললে, 'তুমি খাও তো এখন।'

মুকুল এতক্ষণে সামান্যই খেয়েছে, সে বললে, 'নরম কিছু খাওয়াতে পারিস?'

'তুমি তো চপ ভালোবাস। এর এগুলো মাংসের চপ কিন্তু।'

মুকুল বললে, 'ভাল্লাগছে না রে। মুখের ভিতরে গলার ভিতরে শুকিয়ে উঠছে। মিস ভট্ট, কফি দিতে বলুন বরং।' রাখী বললে, 'তোমার জন্য ওমলেট দিতে বলি। নরম হবে।'

মুকুল বললে, 'কেমন যেন শির্ শির্ করছে শরীরের ভেতরে, মনে হচ্ছে গা দোলাচ্ছে। বেশ খানিকটা দুধ খেলে কি ভালো হত রে, সুহাস? দুধে গায়ে জোর হয় না?'

সুহাস বললে, 'রাখী, তুমি উঠে গিয়ে দেখ তো ওমলেট আর দুধ দেয় কিনা।'

সুহাস মুকুলকে ভালো চেনে। তাকে চিন্তিত দেখাল।

ওমলেটের অর্ডার তো বসেই দেয়া যায়। দুধের চেষ্টায় রাখী উঠে গেল কাউণ্টারের দিকে।

সেই সুযোগে মুকুল বললে, 'তুই বলার আগেই আমি স্বীকার করছি কাজটা ভালো হয় নি। পুলিসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। সেদিক থেকে পি কে হস্পিটাল থেকে বার করে আনিয়ে ভালো করেছে। স্বীকার করছি ট্যাক্সিওয়ালারা খেটে-খাওয়া মানুষ। কিন্তু তখন কেমন গুলিয়ে গেল। মনে হ'ল এই যে কলকাতার পথে নিরপরাধের লাঞ্ছনা, কিংবা ধর অপরাধীকেই দল বেঁধে পিটিয়ে মারা, যা দেখে আর্বন ক্যালক্যাটানরা তেমন কিছু নয় বলে চলে যায়, তার একটা প্রতিবাদ দরকার। পি কে ঠিকই বলেছে, উচিত হয় নি পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কাজ করা। কিন্তু এখন কোথায় যাই বল তো?'

'খড়দহে ফিরবে?'

'তা কি উচিত হবে? পি কে বলছিল তাও উচিত হয় না।'

রাখী ওমলেট নিয়েই ফিরল। বললে, 'দুধ দিতে পারবে না বললে।'

কিন্তু সেটা বাড়ি নয়। আর এ কথাটা রাখী ভুলেই গিয়েছিল। বোধ হয় মনে মনে মুকুলের সেবা করছিল সে। তখন ঘটনাটা ঘটল।

আর তা মুকুলের চোখে পড়ল আবার।

সে বললে, 'দেখেছিস। শালা!'

যাদের জন্য টেবিল বদলাতে হয়েছিল, তারাই। তাদের মধ্যে যে গোলগাল আর যে নাকি ইতিমধ্যে স্ত্রী ছাড়া বাষট্টিজন মেয়ের সঙ্গে শুয়েছে বলছিল, সে একটা কাগজকে কিংবা পত্রিকাকে গোল ক'রে পাকিয়ে তার মধ্যে দিয়ে, দূরবীনে যেমন, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুহাস রাখীদের টেবিলটাকে, বিশেষ করে রাখীকে, দেখছে।

মুকুল উত্তেজিত হল। বললে, 'শালা ভেবেছে কি?' সে উঠে দাঁড়াল।

সুহাস বললে, অনেকক্ষণ দেখছি, থেমে যাও। বসো।'

মুকুল বসল, বললে, 'ঠিক বলেছিস। এখানেও পুলিস আসতে পারে। নতুবা এই চপগুলো ওদের খাইয়ে আসতাম।'

রাখী বললে, 'তুমি খাও তো মুকুলদা। তোমার খিদে পেয়েছে বলেই এখানে আসা।'

মুকুল বললে, 'ঠিক বলেছ। একটা অশান্তি লাগছে কেন, বুঝছি না। কেমন যেন লাগছে। কেমন যেন লাগছে।' রাখী ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা এই কুড়ি বছরের মানুষটির দিকে তাকাল। কুড়ি কি হবে, না তারও কম?

কিন্তু ওদিকের সেই দূরবীনও যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। পত্রিকার রোলটা একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে গেল, আর সেটা সে রাখীর দিকেই চাগানো, তা বুঝতে ফ্লোরের কারোই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ওয়েটার কফি দিয়ে গেল। আর তখন রাখী হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। প্রায় এক মিনিট দাঁড়িয়ে ভাবলে। তার পর সোজা সেই টেবিলটার কাছে চলে গেল। এক টান দিয়ে পত্রিকার রোলটাকে কেড়ে নিয়ে নিজেদের টেবিলে ফিরে এল।

সুহাস বললে, 'দেখ কাণ্ড।'

রাখী বললে, 'আমার তো পুলিসের ভয় নেই।'

কিন্তু মুকুল ওমলেটও খেতে পারলে না। বললে, 'ভাল্লাগছে না রে। কেমন যেন শীত শীতও করছে। কফিটায় যদি জোর পাই। ওরা সিডেটিব আর গ্লুকোজ নাকি স্যালাইন দেবে বলেছিল, তার আগেই চলে এলাম। কোথায় যাই বল তো। কোথায় যাই?'

সুহাস বললে, 'কফিটা আস্তে আস্তে খা মুকুলদা। দেখ্ হয়তো ভালো লাগবে।'

দু এক চুমুক কফি খেল মুকুল।

সুহাস বললে, 'কি? কষ্ট হচ্ছে?'

'না। তেমন আর কি? দুর্বল লাগছে। তোরা খা। তোদের কাছে বসি। এর আগে এমন কোনোদিন লাগে নি। তোর কাছে আর সদুর কাছে বসব বলে এসেছিলাম।' হঠাৎ যেন রাখী বুঝতে পারল। ভয় করে উঠল তার। রাখী বললে, 'মুকুলদা, মুকুলদা তুমি হস্‌পিটালে কেন যাবে না? চলো হস্‌পিটালে নিয়ে যাই

তোমাকে, কিংবা নার্সিং হোমে।'

মুকুল উঠে দাঁড়াল। সে একটু টলে গেল। তাই দেখে সুহাস আর রাখীও উঠল।

মুকুল বললে, 'এখান থেকে পথে বেরিয়ে পড়া ভালো। এখানে কিছু হওয়া ভালো নয়। আচ্ছা সুহাস, হস্‌পিটালে যাওয়া কি খুব অন্যায় ?'

মুকুল কফি হাউস থেকে বেরিয়ে পড়ল। প্লেটভরা খাবারগুলো ফেলে রেখে কোনোরকমে দাম মিটিয়ে সুহাস এবং রাখীও।

মুকুল মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁটছে যেন। সুহাস আর রাখীও তার পিছনে হাঁটতে লাগল। রাখী বললে, 'মুকুলদা, হস্‌পিটালে যাওয়া দরকার। পুলিস কি করবে ? পুলিস কি করবে ?' মুকুল বললে, 'কি হয় হস্‌পিটালে গেলে ? কি হয় ? মরার পক্ষে আমার বয়স কি খুব কম নয় ?'

রাখীর এই জায়গাটায় কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে। সে দেখলে মুকুল টলতে টলতে রাস্তা পার হচ্ছে। একটা গাড়ি এসে পড়ায় রাখী ফুটপাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে চিৎকার করে বললে, মুকুলদা পায়ে পড়ি তোমার হস্‌পিট্যালের বেডে ফিরে যাও। দোহাই তোমার। গাড়িটা চলে গেলে সে রাস্তায় নামতে গিয়ে লক্ষ করেছিল, সুহাস একটা হাত দিয়ে শক্ত ক'রে তার হাত ধরে রেখেছে।

সুহাস আস্তে আস্তে বললে, 'হয় না, এগারো, হয় না।'

রাখী বললে, 'কেন ? কেন ?'

মুকুল রাস্তা পার হয়ে ওপারের ভিড়ে হারিয়ে গেল।

তখন সুহাস আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে, কোথায় যাই বলতো। তারপর বললে, 'এস, এস। এস।'

যেন পালাচ্ছে এমন করে রাখীর হাত ধরে সুহাস হাঁটতে লাগল। তার মুখ তো শুকনোই। যেন করোটির মতো হয়ে উঠল। রাখী বললে, 'হাত ছাড়, সুহাস। এমন করে কি ভিড়ে হাঁটা যায়।'

'না, না। না, না।'

রাখীর মনে হল সুহাস সুস্থ নেই। কিংবা একা হতেই ভয়।

দুদিন পরে সকালে ব'সে রাখী ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। সেও যেন এক স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। অকারণে ভয় পেয়ে, যেন পালানোর জন্য সুহাস হাঁটছিল এ-গলি ও গলি দিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। লোকজনের ভিড় বাড়ছে। কোথাও কি খেলা ছিল, তার আলোচনায় উদ্বেল হয়ে লোক চলেছে ? কোথায় একটা কি উৎসব আছে, তার আলোচনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে লোক আসছে ? রাখী বললে 'একবার আমি বাড়ি যাই।' সুহাস চাপা গলায় বললে, 'না, না।' সে বরং আরও জোরে রাখীর হাত চেপে ধরে হাঁটতে ল্যাগল।

অবশেষে একটা বাড়ির সামনে ভিড় দেখে সুহাস বললে, 'চলো, চলো। তুমি বুঝছ না কেন, এস।' যেন ভিড়ে মিশে যাওয়াই উদ্দেশ্য তার।

ভিড়ে মিশে. একটা হলে ঢুকে পড়ে, সুহাস বলে বসল. 'জানো এটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট। এসো. এসো বসি।' রুমাল বার করে সে তার মুখ মুছে ফেলল।

ফিসফিস করে রাখী বললে. 'মুকুলদা কোথায় গেল ?'

তেমন করেই সুহাস বললে, 'দেখ. দেখ, এখানে উৎসব। বোধহয় কারো সম্বর্ধনা। দেখ, দেখ।'

রাখী বললে. 'আচ্ছা সুহাস. তোমার মনে হয় না. মুকুলদার হসপিটাল বেড থেকে চলে আসা খুব রিস্কি হয়েছে। খুবই রিস্কি।'

সুহাস বললে. 'আরে দেখ. দেখ. রাখী. মণ্ডটায় কত আলো. কত ফুল। ওই দেখ কারা একজনের সম্বর্ধনা পড়ছে। আরে সাহিত্যিক যে! তুমি কি জীবিত সাহিত্যিক দেখেছ. রাখী। বা. বেশ তো!'

রাখী হঠাৎ তখন অবাক হয়ে দেখেছিল. হসপিটালের রাজ্য থেকে সাহিত্যের রাজ্যে এসে পড়েছে তারা। কি অবাক, কি অবাক।

কিন্তু সেখানেও রাখী চমকে উঠল। যেন ততক্ষণে সে সত্যি সত্যি মঞ্চের দিকে তাকিয়েছিল প্রথম।

সে ভয়ে ভয়ে বললে ফিস্‌ফিস্ করে. 'সুহাস. সেই লোকটা দেখ। সেই দূরবীণদার।'

সুহাসও তখন মঞ্চের দিকে যেন সেই প্রথম মন দিল।

সুহাসের মুখেও যেন আতঙ্কের ছাপ দেখা দিল।

রাখী ভয়ে পাংশুমুখে বললে. 'ঠিক চিনে ফেলবে. চল পালাই। দেখ, সেই লোকটাই যার হাত থেকে পত্রিকা কেড়ে নিয়েছিলাম।'

সুহাস কৈফিয়ৎ দেয়ার মতো, বললে. 'কিন্তু আমরা তো জানতাম না সে-ই সম্বর্ধনা পাওয়ার মতো সাহিত্যিক। চল পালাই, চল পালাই।'

সেদিন রাখীর বাড়িতে ফিরতে রাত নটা হয়েছিল। কারণ সুহাস ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়েও রাখীকে ছেড়ে দেয়নি। যন্ত্রচালিত বলে একটা কথা আছে, কলের পুতুল বলেও একটা কথা আছে। দারুণ আরথ্রাইটিসে মেরুদণ্ড শক্ত হতেও দেখা গিয়েছে। সুহাসের চালচলন বোঝাতে সে রকম কিছু বলতে হবে। তার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যাওয়া সেখান থেকে বেরিয়ে মেডিক্যাল কলেজের চারিপাশে একবার কলেজ স্ট্রীটের দরজায়, একবার ঘুরে গিয়ে চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর দরজায়. কখনও পা টিপে টিপে কলেজ স্ট্রীটের দরজা দিয়ে ঢুকে, মরা-রাখা ঘরের পাশ দিয়ে চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা। পথ, পথের আলো, অন্ধকার, ময়লা, ডাবের খোলা, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, লোকজন সবই অন্যান্য দিনের

মতো, শুধু তার মধ্যে নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, যেন কিছু একটাকে পাহারা দিতে, কিছু একটাকে রক্ষা করতে, সুহাস সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত ন'টা পাক খেয়ে খেয়ে বেড়িয়েছিল। রাখীর অবাক লাগছে, সেও কেন সঙ্গে ছিল। তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিল, নতুবা সেও কেন সঙ্গে থাকবে, কিন্তু এখন ভাবতে গিয়ে অবাক লাগছে। বুঝতে পারছে না। সুহাস কি এক দারুণ ভয় পেয়েছিল ? সেজন্যই, যেন অন্য কোনো গ্রহ থেকে এই গ্রহে এসে পড়ে, সে রাখীর হাত চেপে ধরে, নিঃসঙ্গ নয়—এ রকম অনুভব করার চেষ্টা করছিল। যেন সাহিত্যের মধ্যে ডুবলে শান্তি হতে পারে এই ভেবে সাহিত্যসভায় গিয়েছিল। সে কি বুঝেছিল সেটা সাহিত্যসভা ?

কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের চারদিকে ঘোরা কেন ? তা কি এই দেখতে যে মুকুল, সেখানে গেল কিনা, সেখানে থাকতে পেরেছে কিনা, কিংবা পি কে'র লোকেরা তাকে সেখান থেকেও আবার সরিয়ে এনেছে, কিংবা মুকুলকে খুঁজে বার করে তার 'কোথায় যাই বল তো' এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে ? কিংবা মুকুলকে পাহারা দিতে যাতে কেউ তাকে না সরায় ?

সপ্তাহকাল পরে রাখী পুরনো খবরের কাগজ গুছিয়ে তুলছিল তারিখ মিলিয়ে মিলিয়ে। এগুলো সুমিত ভট্ট বার লাইব্রেরী থেকে বাসী হলে আনেন, পড়া হলে ফেরত দেন। রাখীরাও খবরের কাগজ বলতে এই সব কাগজই পড়ে বাড়িতে। কি হয় বলো নতুন টাটকা খবর দিয়ে ? কোনো কোনো তারিখ অন্তত কিছুদিনের জন্য ব্যক্তি বিশেষের কাছে মূল্যবান হয়। যেমন পার্ট ওয়ানের রেজাল্ট বার হওয়ার সেই দিনটা রাখীর কাছে। ললিতা গ্রাহ্য করছে না। যেন সে জানত বি ক্লাসই হবে।... কথা হচ্ছে, দিদি কি জানে, যে একজনের তাকে ললি বলে উল্লেখ করতে ভালো লাগছিল।

অনামনস্ক হয়ে সেই দিনটার খবর সংগ্রহের জন্য ইতিমধ্যে হলুদ হয়ে আসা তার পরের তারিখের কাগজটা দেখতে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে তার মাথাটা ঠুকে গেল যেন।

মুকুল ? অন্তত সেই রকম ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ! খবরের কাগজের ভাষায় : উল্টো-ডাঙার নালার পারে অজ্ঞাত পরিচয় তরুণের মৃতদেহ। ব্যাণ্ডেজ, ভাঙা বাঁ হাত গলায় তুলে বাঁধা, গালে ক্ষতসমূহে স্টিকিং টেপ, কিন্তু কি আশ্চর্য তার দু'পা এবং কার্য-ক্ষম ডান হাত পিছমোড় করে শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা। অনুমান আহত অবস্থায় তাকে চলচ্ছক্তিহীন ক'রে এই ময়লা নালার ধারে কে বা কাহারা ফেলে রেখে গিয়েছে।

মুকুলদা কি স্বেচ্ছায় মরতে চাইছিল না ? কিংবা তা চাইলেও, বুঝেছিল, সেরকম করে তাকে অচল অক্ষম করে না দিলে মরতে পারবে না, বাঁচার চেষ্টায় কোনো হসপিটালে যেতে পারে আবার ?

রাখীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। এখন কি দিদিকে বলে লাভ আছে ?

দিদি তোমার মনে যে তোমাকে 'ললি' বলে দু-একবার ডেকে থাকবে তাকে আশ্রয় দাও।...

রাখীর পাণ্ডুলিপি এখানে হঠাৎ শেষ। সে সদু বা সুহাসের মৃত্যুর কথা লিখে রেখে যায় নি।

কিন্তু পুলিস ব'লেই কি শেষ করতে পারবো? ললিতাকে গোপনে নার্সিং-হোমে নিয়ে গিয়েছিল রাখী। কেন তা ডায়েরীতে লিখতে পারে নি। পরীক্ষায় ব্যর্থ ললি কত ডেসপারেট হয়েছিল, কিংবা বুদ্ধিমতী মেয়েকেও কোন কোন পুরুষ ভোলাতে পারে? সেই যে ডালিয়ার চাষী, বড় বাড়ির, আর গাড়িও, লোকটার হার্টে যে বুলেট, আর পিকে অধ্যাপকের অকর্মণ্য ক'রে দেয়া হাঁটুতে যেটা, রোল ষোল নম্বর সুহাসের রিভলবারেরই, যা রাখীদের পড়ার ঘরের মেঝের আলগা ইঁট সরিয়ে পেয়েছিলাম। পি কে তখন তো পুলিস এনকাউণ্টার থেকে পালাতে চেষ্টায় ছিল। তাছাড়া মানুষের কত রকমের ধারণা। ললিতা বলেছিল, 'ও আমার ছোট্ট বোন। অন্ধ-কারের ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমায়। সেই কুঁয়োটা কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার। ভয় পাবে। ললিতা কাট গড়ার কাঠ ধরেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি।

তুলাইপাঞ্জার রোয়া

'না-আ, এটেকার না হয়। এটে তো পাকড়ি, ফুলপাকড়ি, ভোগ ; আর এলা তো আইঅর রত্না, অধিক ফলনশীল, শিগ্রফলনশীল, আর পোকাও নাই লাগে। তুলাইপাঞ্জা ওই না ওটেকার ; না-হয়, না-হয়, দিনাজপুরর। কিন্তুক কাটারীভোগ না হয়। কাটারীভোগ, গোবিন্দভোগ সমান সুগন্ধ, কিন্তুক দানা ছোট। সুগন্ধ চড়া হইবে তো, নেউল গাঁধারিয়া ডাকি যায়। তুলাইপাঞ্জা সোরু, লম্বাকিছিম, বাসনা খানিকটা মিঠা। হাতত রাখি আলতো ফু দিস, উড়ি যায়।' 'সেই না দুপগুরি, এলাও না তাই। সেই না জোদ্দার, এলা না সবহাপতি। সেই না শাতালু মিঞা, আর এলা উমরার বেটা মোহম্মদ পওরুদ্দিন শেক।' প্রবাদ ঃ শাতালু মিঞা একশ' সওয়া শ' বছর বেঁচে ছিলো। আপন ভৈষীর খাঁটি দুধের দই, মাগুর মাছ, আর আপন জমির ভোগধানের 'চাউল'। আর মাগুর মাছে 'মরুচ' দেয় না, চৈ দিয়ে রাঁধে। আর সেই দই-এ যে 'চুড়া', সেও ভোগধানেরই। আসলে ঃ দু' পুরুষ ধ'রে একই নাম ছিলো, শাতালু মিঞা। আর শাতালুদের অল্প বয়সেই একমাথা বকসাদা চুল, সাঁওতালদের মতো রং শরীরে। বাপ বেটায় তফাৎ মনে থাকে না। সাঁওতাল থেকেই নাম হতে পারে, যেমন সানতাল বস্তী। যদিও উচ্চতা কেন সাঁওতালদের তুলনায় বেশি, আর নাক কেন বরং বেশি ছড়ানো তা বলা যাচ্ছে না। মাগুর মাছ, ভৈষাদৈ আর ভোগ 'চাউলে' এরকম হয়। মনে মনে হাসলো সামাথ। তো, রাজবংশী ভাষার উক্তিগুলো সেভাবেই মনে আসছে তার, কারণ কিছুক্ষণ আগেই সার্মাতিনি বলেছিলো। প্রায় বাংলাভাষায় সামাথ তার নিজের জানা বিষয়গুলো ভাবছে। এখন শ্রাবণ। ঝরি, বৃষ্টি, বর্ষণ। পিচের চওড়া পথটা ভিজে চকচকে। পথের ধারের মোটা বড় গাছ-গুলোর গা গড়িয়ে জল নামছে, ঝরি থামলেও। নিচে দাঁড়ালে পাতার জল বড় বড় ফোটায় আর শব্দ করে গায়ে পড়ে। এদিক ওদিক যেদিক তাকাও, সবুজ, হলদিয়া, মাটিয়া, গেরুয়া রং এখনও ভিজে! রাস্তাটা বাঁক নিয়ে চললে, যেখানে তা পূর্ব-পশ্চিম, দুপাশের গাছের সারির মধ্যে দিয়ে সকালের বৃষ্টিতে ধোয়া চকচকে হলুদ আভা ঢুকছে ; আর আবার তা যখন উত্তর-দক্ষিণে, সড়ক ধ'রে নীল কুয়াশা যেন। সেই চকচকে হলুদে চলতে চলতে, গাছের মাথায় বুড়ির চুলের মতো সাদা মেঘ-

গুলোকে উড়ে যেতে দেখে পিছনে তাকালে, দেখবে হাত দশ-পনেরো পিছনে রোদকে ভিজিয়ে ঝমাঝম বৃষ্টি হয়ে গেল। সেই নীল নীল কুয়াশার মতো পথে চলতে, হঠাৎ দেখবে সেই নীল নীল আলোর মধ্যে যত টুকরো টাকরো রং, সব ঢেকে, প্রায় সাদা এমন, হাল্কা নীলে সাদা ডুরি ভিজে শাড়ি কেউ মেলে দিলো যেন—এমন বৃষ্টির ছাঁট। রোয়ার বোঝা মাথায় ক'রে চললেও চুল বাঁচে না, শাড়ি বাঁচে না, তা সে রোয়া বড় আঁটিতে বোঝায় বাঁধাই থাক, কিংবা ধামায় সাজানো। গোছা ক'রে বেঁধে বাঁকের দু মাথায় ঝুলিয়ে নিলে তো, খালি মাথা ভিজতে আরও সহজ। শার্ট প্যাণ্ট 'কেমন' বাঁচে ? এক কথায় চোখে, নাকে, ত্বকে বর্ষা-ঝরি অনুভব করো। ত্বক 'খাকি' সেই জল ভিতরেও নেমে যায়। না হ'লে, বীজ পড়লে কেন আর কথা নেই ? না হ'লে, রোয়া কাদায় এক আঙুল বসলেই কেন 'গভ্‌ভ ধানগাছ' হেলে দোলে। ঝরি-বৃষ্টি এখন কোথায় হচ্ছে, আর কোথায় হচ্ছে না, তা বলা যায় না। কেউই বলতে পারে না, কে কতক্ষণ শুকনো থেকে যাবে, কখন কে ভিজে যাবে।

এখন এই মুহূর্তে গায়ে জল পড়ছে না এখানে, ভিজে ভিজে ভাবটা যদিও আছেই, আবার সকাল এখন, আলো আলো ভাবে তাও মনে হচ্ছে। যেমন সেই ভোর ভোর মেঘলা অন্ধকারে, তখন তো আকাশ মেঘের ভারে ঘরের ছাদের মতো ঝু'কে, সড়কটা স্যাঁতাস্যাঁতা থাকলেও এত ভিজা ছিলো না। ভোরের আলোতে এক দুই ট্রাক চলতে শুরু করেছিলো। কিন্তু হেডলাইট জ্বালিয়ে। সময় বাঁচাতে তারা এক ট্রাকে উঠে পড়ছিলো। পাঁচ মাইলটাক পথ পার হয়ে, ট্রাক ছেড়ে, সড়ক থেকে বাঁ-হাতি জংলা জংলা গ্রামটায় ঢুকেছিল। বৃষ্টি হয় হয়, হয় হয়, কিন্তু হয়নি। এদিক ওদিক গাছ, তার মধ্যে বীজতলা জমিটা। রোয়ার চারাগুলো বেশ তেজীয়ান। তো, তখন তো কিছুই তেমন সবুজ না, কেমন নীলা নীলা ভাব। এমনকি হোলুদ-সাদা সিমতোনি, কি তার হোলুদ-সবুজ শাড়ি, কচি দুর্বা দুর্বা সবুজ। সামাথ, সিমতোনি পরামর্শেই, গল্পটাকে সেই রোয়া-ওয়ালা বাস-কনডাকটরের মুখে, যাচাই করার জন্যই আবার শুনে নিয়েছিল। রোয়া দেখে কি বোঝার উপায় থাকে, তা আইঅর, না পাকড়ি, না তুলাইপাঞ্জা ? তুলাইপাঞ্জার ধান তো বাস-কনডাকটর সখের খাওয়ার জন্যই ছোট এক বস্তা যে বাসের মাথায় চাপিয়ে এনেছিলো ইসলামপুর থেকে। বীজতলার জমি তৈরি করার পর, জমিটা 'খানিক শুকনাই,' সে স্ত্রীকে বলেছিলো বেছনের ধান ঝেড়ে ভিজিয়ে রাখতে। বিকেলের কিছু আগে বাস থেকে বাড়ি ফিরে, তখন বীজতলার একপোয়া জমিতে ধান রোয়া হয়েছে, হঠাৎ খেয়াল হয়েছিলো, এ ধান তো রোয়ার ধান নয়, বরং সেই সখের তুলাইপাঞ্জা। এঃ হেঃ ! তখন আর কিছু করার নেই। বীজতলার সবটা জমিতে বাকি ভিজা ধানটুকু লাগিয়েছে সেই গয়নাথ কনডাকটর 'স্টেট ট্যানপোর্ট'-র। গল্পটা, না হয়, কনডাকটরকে বাসে অন্য যাত্রীদের কাছে বলতে শুনেছিলো সিমতোনি। কেউই গল্প শুনতে শুনতে হুঁ হাঁ-র বেশি কিছু বলছিলো না। কিন্তু সিমতোনি হঠাৎ আগ্রহ দেখিয়েছিলো কনডাকটরের

বাড়িটা, জমিটা কোথায় গল্পে গল্পে জেনে নিয়েছিলো। ভারি মজা তো! যে ধান কোন কালে হয় না, তাই, দেখো, কেমন 'বীজতলাৎ পড়ি যায়'। সেই থেকেই এখানে আসা। গল্পটাকে যাচাই করতেই হয়। চারা দেখে কে তফাৎ বোঝে ? আর তখন তো সেই মেঘলা আলোয় সব চারা নীলা-নীলা। সামাথ, সিমতোনি, কনডাকটর, তার চাকর সকলে মিলে চারা তোলা যখন প্রায় শেষ ক'রে এনেছে, হঠাৎ চওড়া একফালি নরম নরম হলুদ রং পড়েছিলো পূর্ব থেকে রোয়াগুলোর মাথায়। কিন্তু ধামায় আর বাঁকে রোয়া চারা নিয়ে, এক রশি যেতে না যেতে, হলুদ আলোর মধ্যেই চার-পাঁচ মিনিট ধরে ঝাঁ ঝাঁ ঝরি। একটা ঘর নেই, দাঁড়াও। সড়কে উঠলে তো মেঘই, আর গাছের পাতা থেকে টুপুস্ টুপুস্ জল পড়ে। কিন্তু কি সামাথ, কি সিমতোনি তখন না হেসে পারে ? আর এই আকাশ রোয়া-গাড়া মেঘের বুকের ভারে ক্ষেতের উপরে নুয়ে নুয়ে পড়ছে।

তো, এখন এই যে ঝরি, তা পওর শেকের বাড়ির উপরে নেমেছে কিংবা নামে নি তা বলা যায়! সেথা হয়তো মেঘে মেঘে মাঝরাতি। শাতালু মিঞাদের বাড়িটা, কিংবা বাড়িগুলো, কিংবা তাদের পাড়াটা—যাই কেন না বলো, দূর থেকে, পাহাড়ে উঠে যেন। টিলাও নয়, সমতলই, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উচ্চতায়, বিভিন্ন কোণাকুণি তোলা ঘরগুলো মিলে মিলে দূর থেকে পাহাড়ী কোন গ্রামের মতো লাগে। আর সামাথ সে রকম পাহাড়ী গ্রামও দেখেছে। আর এরকম হওয়ার কারণও আছে। ঠাকুরদা—শাতালুর দুই নিকা, দুই পাছুয়া বউ। নিকাব বউদের সব মিলে এক ছেলে, কিন্তু তিন মেয়ে। দুই পাছুয়ার একজনের এক ছেলে, এক মেয়ে, এখানে এসেও তার সন্তান হওয়ার বয়স ছিলো বটে, একটি মেয়েই হয়েছে। অন্যজন ছেলে-মেয়ে অন্য ঘরে রেখে এসেও ঠাকুরদা শাতালুকে এক ছেলে এক মেয়ে দিয়েছিল। দুই নিকার বউ, দুই পাছুয়া—চারখানা ঘর করতেই হয়, আর তাদের ছেলেমেয়েরা, যারা অন্তত ন'জন, তারা বড় হলে তাদের জন্যও ঘর করতে হয়। বলতে পারো, সব পাছুয়ার এমন কিছু জমি-জিরাৎ 'নাই-থাকে', কেনে আনা ? ধান রোয়া, ধান সিজান, ধান-ঝাড়া—এসব কাজে পয়সা দিয়ে চাকর রাখবে ? পাছুয়া আর তার বেটা বিটি থাকলে লোক রাখতে হয় না। ভাত আর কাপড়া দিলেই হলো। আর—হ্যাঁ, সেটা তো—নিকার বউদুটো মিলে যে একমাত্র ছেলে, সেই ফির বাপ শাতালু। তার প্রথম নিকার বউ তারই বড় পাছুয়া মাওয়ের বড় বিটি। তা হলেও ঠাকুর্দা শাতালুর নিকার তিন মেয়ে, বড় পাছুয়ার এক ছেলে, এক মেয়ে, ফির এটে আমি এক কন্যা ; ছোট পাছুয়ার এক ছেলে এক মেয়ে থেকে যায়। বড় পাছুয়ার বড় ছেলের সঙ্গে সে নিকার বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলো। নিকার আর দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে সে ময়নাগুড়িতে। কিন্তু বড় পাছুয়ার ছোট মেয়ে আর ছোট পাছুয়ার এক ছেলে এক মেয়ে, যা ঠাকুর্দা-শাতালুর নিজের, তারা তার কাছে থেকে গিয়েছিলো। কাজেই ঠাকুর্দা-শাতালু থাকতেই তার চার বিবির চারখানা ছাড়াও ক্রমে ক্রমে সেই চারখানা

ঘরকে ঘিরে আরও খান চারেক ঘর উঠেছিলো। কারণ বড় পাছুয়ার ছোট মেয়ে আর ছোট পাছুয়ার একমাত্র মেয়ের সঙ্গে পছন্দসই চাকরদের বিয়ে দিয়ে তাদেরও ঘর ক'রে দিতে হয়েছিলো। এতে সুবিধাই হয়, 'আপ্তজন' সবই কাছে কাছে থাকে, জমি টমির হিস্যা সত্ত্ব নিয়ে কেউ কথা তোলে না। পাছুয়ারা যে সম্পত্তি নিয়ে এসেছিলো, কিংবা পাছুয়াদের হয়ে মামলা লড়ে যে সব জমি ঠাকুর্দা শাতালু তাদের স্বামীর কুল থেকে দখল করেছিলো, যদি এমন হয়ে থাকে, তা শাতালুদেরই থেকে গিয়েছে।

বাপ-শাতালুর সময়েও এই সব রকমের ব্যবস্থাই হয়েছিলো। তার নিকার বউ ছাড়া দুই পাছুয়া বউ ছিলো। তাদের সন্তান-সন্ততি আছে। শাতালুর মেয়েদের, ছেলে-দের, যদি বাপ মা এক না হয়ে থাকে আপসে নিকা হয়েছে। সে রকম ছাড়া মেয়ে থাকলে চাকরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। সে রকম সম্ভব না হলে, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দূরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বাপ শাতালু জানতো, রাভা সম্প্রদায়ে সম্পত্তির মালিক হয় মেয়েরা। সুতরাং সে পাছুয়া ধরার সময়ে একে একে দুই রাভা বিধবাকে যোগাড় করেছিলো। ফলে পাছুয়াদের জমি এসে বাপ শাতালুর জমিতে সংযুক্ত হয়েছিলো। কিন্তু তাদের সন্তানরা সম্পত্তির হক্ চাইবে? ছেলেরা তো নয়ই। মেয়েরা পারে অবশ্য হক্ চাইতে। বাপ-শাতালুর পাছুয়া দুজন দুই বয়সের হলেও, গায়ের 'হলুদিয়া' রঙে প্রমাণ তারা ঠিকই রাভা থেকে গিয়েছিলো। তাদের প্রথম জন আটবিঘা সম্পত্তি আর এক ছেলে নিয়ে এসেছিলো। দ্বিতীয়জন সত্রবিঘা আর এক মেয়ে নিয়ে। বাপ-শাতালু জানতো রাভা মেয়েদের যদি আরও ছেলে মেয়ে হতে থাকে তার বাড়িতে, তারা কিন্তু রাভা থাকে না, সুতরাং যে সম্পত্তি তার পাছুয়ারা নিয়ে এসেছে তা কোনভাবেই তার হাতছাড়া হবে না। হবেই বা কি করে? মামলা? 'তো তাঁয় কি জোদ্দার না হয়?'

পওর শেক অবশ্যই জোদ্দার না হয়। কিন্তুক সে 'সবহাপতি' হয়েছে। তাছাড়া তার প্রথম 'নিকা যদি বাপ শাতালুর নিকাজাত কিংবা পাছুয়াজাত বহিনের কন্যার সঙ্গে' হয়েই থাকে, তবে দ্বিতীয় নিকাহ হয়েছে বাপ শাতালুর সেই 'সত্রবিঘা ধরি-আসা' রাভা পাছুয়ার কন্যা সামতিনির সঙ্গে।

এ অবস্থায় বাড়ি ঘরগুলোও দূরে কাছে, এদিকে মুখ ক'রে, সেদিকে মুখ ক'রে উঠতে থাকে। কার সঙ্গে কার কি সম্বন্ধ, জমিতে কার কি হক্ ধরা যায়? কিন্তু ঘরগুলো শুধু বাইরের বৃত্তের দিকে ছড়ায় না; হঠাৎ কেন্দ্রের কাছাকাছি কেউ সরে গেলে, সে মাটি দখল করেও নোতুন ঘর উঠে যায়। যেমন পওর কেন্দ্রের কাছে এসে, ঠাকুর্দা শাতালুর ছোট পাছুয়ার নড়বড়ে খড়ের চালের, ছোট, নিচু, ঘরটা ভেঙে ফেলে, বাড়িটার সব চাইতে উঁচু টিনের চৌরিটা তুলেছে, 'কমর সমান কালো সিনমেণ্ট ডোয়া, লাল টক্‌টক্ মাঝিয়া।' আর বাড়ির ঘরগুলোর মধ্যে মধ্যে দুহাত চওড়া 'হাজার-খান ফালটি ফালটি রাস্তা।' হাঁটা চলা লাগে তো।

হয়তো সেই বাড়ি পাড়াটার ছাদে ছাদে এখন অল্প রোদ, আর চারদিকে মেঘ, কিংবা উল্টোটাও, চারিদিকেই ছাদ থেকে রোদ মাটিতে নামছে, আর রোদটাই বৃষ্টির গুঁড়ো হচ্ছে। কিংবা 'মেঘক্ খাঁতা করি' ঘুমায়।

এরকম মত এখন শোনা যাচ্ছে ঃ পওর শেক সবহাপতি হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেহার থেকে যে তৃতীয় বউ নিকা ক'রে এনেছে, সে হলুদিয়ায় সাদা নয়, লালে সাদা, চোখে সবসময়ে সুরমা, রবারের চপ্পল ছাড়া মাটিতে পা না-দেয়, বাড়িতেও ব্লউস্ শ্যায়া পিনধে। তারা, পওরের সেই বেহারী 'সাকাই'-রা এখন বলছে, সাঁওতাল থেকে সাঁওতালবস্তী হতে পারে, কিন্তুক শাতালু হয় না। রাজা ছিলো তো সেই আগে। তখন তার শতেক সৈন্য 'চালাছে' যে মানুষ, পাঠান, সে-ই শাতালু।

এরকম ব'লে খুব হাসছিলো সামর্তিন ট্রাকে যেতে।

তো, শাতালুদের পাড়া-বাড়িটা চারদিকের সমতল থেকে পৃথক, পাহাড়ের উপরে টিলা নাও হয় যদি, যেরকম পাহাড়ী গ্রাম আর শহরের কথা তুলাইপাঞ্জার বীজতলার গ্রামে যেতে সামাথ বলছিলো। সাতালুদের বন্দোবস্তে এই এক সুবিধা হয়েছে, আধিয়ার রাখতে হয়নি কোন সময়ে। বরং রাখাল থেকে চাকর, চাকর থেকে এই এক বাড়িরই কোন মেয়ের দরুন জামাই হয়ে গেলে, এই বাড়ি-পাড়ার বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা বা সাহস থাকে না। দরকারই বা কি ? 'রাখাল থাকি চাকর, চাকর হইতে না হইতে ঘর আর বউ পায়া যাও।' জমিতে কাজ করো, কাজ করতে কাজ 'শিখো' জমির, একদিন এই বাড়িটার কোন স্ত্রীলোকের জন্য তোমাকে দরকার হবে। ভাত-কাপড়া তো ছিলোই, তখন তো—তার বেশি আর কে চায় এই পৃথিবীতে, কোন পুরুষ ? হয়তো এই 'পাঁচ বিঘা তোমার জমি' এরকম কেউ বলে দেয় না, কিন্তু শাতালু মিঞা অথবা পওর শেকের নির্দেশ মতো ঠিকই কোন না কোন জমিতে চাষ দিতে থাকো, রোয়া গাড়ো, ধান কাটো, নদীর পার থাকি। কাশ, ধানের মাঠ 'থাকি' খড় নিয়ে এসে, আর শাতালু মিঞাদের বাঁশঝাড় থোক বাঁশ, ঘর তুলে ফেলো ; আর সেই ঘরে শাতালু মিঞাদেরই কোন কন্যা। হয়তো সে ঠাকুর্দা-শাতালু কিংবা বাপ-শাতালুর কোন পাছুয়া-জাত, হয়তো নিকাহর কন্যা নয়, তা তুমিই বা কোন ওদেরই পাছুয়া জাত নও ? বলতে পারো ? তোমার বাপ-মা আর কন্যার বাপ-মা পৃথক থাকলেই হোল। হয় না কি এরকম ? চার পাঁচ বিঘা জমির লিখিত-পড়িত বর্গাদার হলে, তেই সে জমি চাষ করো, পাও কন্যা ? বরাত ভালো হলে এই বাড়ির কন্যাদের মধ্যে যে কালো, হলদিয়া-কালো, হলদিয়া-হলদিয়া-কালো, হলদিয়াও নানারকম আছে, তার মধ্যে হলদিয়া কিছিম কন্যাও পেয়ে যেতে পারো। আর ধরো তোমার ছেলেমেয়ে হলো—চাকর জাত হিসাবে হয়তো শাতালু মিঞা বা পওরের খোদ সন্তানদের মতো তাদের জামা পিরহান হয় না। কিন্তু একটু বড় হলেই মোষ চরানোর কাজ পাবে। ভাত কাপড়া হতে থাকবে। আর তারা বড় হলেই আবার ঘর তাদের। না, এটে আধিয়ার, বর্গা ধরি যে

গোলমাল, তাই নাই। সামতিনি ভাবলো। ভাবতে তার চোখ দুটো হাসলো। রাখো তোমার বর্গাদারি আইন।

কিন্তু বেলাটা সামনে না-চলে পিছিয়ে গেলো। 'বাপুরে' বলে প্রথম সামতিনি পরে সামাথ মুখ তুলে দেখলো। এটা যদি নামে পুরো স্নান হয়ে যাবে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে নেবে? অন্যদিকে, না দাঁড়ানো ভাল, বেলাটা এরকম থাকি যাওয়া ভাল্।

সত্র বিঘা দূর থাক, আট বিঘাই যদি এই নতুনরকম ধানের রোয়া লাগাতে চায় সামতিনি, সন্ধ্যা হওয়ার আগে তা শেষ করতে হবে। কাজেই রোদ না-চড়া ভাল্। বাঁকটা এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে নিয়ে, সামাথ সেই মেঘলা, নীলা আলোয় জলে-ভেজা মোষ-কালো পিচ সড়ক, সড়কের ধারে মোষ-কালো গায়ে জল গড়ানো কড়ি গাছের সারিটাকে দেখলো। সবুজ কিন্তু আরও গাঢ় হয় এই আলোতে, আর হলুদিয়া সাদা সামতিনিকে হলুদিয়া-হোলুদ দেখায়।

পূর্বসীমা যদি বলো, তাহলে তো বিলাইতি জলপাই গাছটা আর তার পাশে সেই ভূটানী লেবু সন্তরার গাছ। দুই-এর পাতাই বেশ গাঢ়-সবুজ। জলপাই-এর ফলও তাই। লেবু-সন্তরার ফল বছরে দু চারিটা হয়। প্রথমে সবুজ পরে ধীরে হলুদিয়া-লাল। কিন্তু জলপাই-এর চাইতে টক। আর পশ্চিম সীমা। ওহো ওদিক 'থাকি' কুড়াটা টিলাতে মনে হয় বটে, যদি কুড়া'টা 'থাকি' দেখো। আর সেখানে যদি এরকম মেঘের নীলা আলোও থাকে, তবে স্বভাবেই গাঢ় সবুজ বড় বড় ঘাস, কাশ, গাছ, কলার 'থুপি' এখন কালো-সবুজ হবে। আর কুড়ায় জল হবে কালো-নীল, আর পওরের সে কাশবনে চরা মোষগুলো এই পিচ সড়ক আর কড়িগাছের গুঁড়িগুলোর মতো। সেই কুড়ার সেই কালিয়া নীলজলে ভাদ্রর পর 'থাকি' সাদা সাদা আর লাল শালুক ফুটে।

কিন্তু যদি জোর বর্ষা হয়ে যায়, তখন ধরা পড়ে কুড়াটা কোন সময়ে বহতা নদীর শাখা ছিলো। দূরে বনের মধ্যে নদীটা পথ হারানোর ফলে, তার পুরনো খাতে অনেক ছোট ছোট যে কুড়া, তা সব এক ক'রে, সে রকম বর্ষা হলে, কয়েক মাসের জন্য নদীই হয়ে যায় আবার। প্রত্যেকবার সেরকম হয় না। যেবার হয়, মনের মধ্যে ছায়ায় ঢাকা যত কুড়ায় যত মাগুর আর শিঙ্গি, কালবাউস, সেই স্রোতে এই কুড়ায় নেমে আসতে থাকে। তখন জলের রঙে মাটিগোলা। যেমন এইবার।

এই কুড়াটাও পওরের। শাতালুর সময় থেকেই। কি করে নদীর খাত কারো হয়? বাহ্, হাট-ঘাটের ডাক হয় না পত্তি বৎসর? এক সময়ে এটাও ঘাট ছিলো। এখন, পাকা সড়কের উপরে পাকা উঁচু পোল হওয়ার পরে, কেউ যদি পার হয়ই, তবে সে বোকা মানুষ এক-হাঁটু জল ভাঙতে দ্বিধা করে না। জল বেশি যদি হয়ই শাতালুরা তার জন্য দু'খানা বাঁশের এক সাঁকো কোন বছর বানায়, কোন বছর বানায় না। কে ডাকবে এই ঘাট, যেখানে এক পয়সা 'ভড়া' ওঠে না? কিন্তু আগে শাতালু, এখন পওর, গত ত্রিশ বছর থেকে একশ টাকা দিয়ে ডেকে নিচ্ছেই। কারণ

এখানে পাট ভিজানো যায় ; এখানে মোষরা গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে গরমে ভালো থাকে ; কারণ এখানে প্রতি বছরই কিছু কিছু মাছ আসে, মাগুর, শোল, ভ্যাদাই ; ছিপে, জালে, জানে ধরা পড়ে। আর যদি তেমন বর্ষা হয়, যেমন এবার, প্রতি রাতে মণ মণ। তখন খেয়ে শেষ হয় না। শহরের বাজারে যায় লোহার বড় বড় ড্রামে, বড় বড় হাঁড়ায়। এক বছরে ত্রিশ বছর ঘাট ডাকার টাকা উঠে যায়। তেমন মাগুরের মণ এখন শহরে পাইকারিতেই হাজার।

জান প্রতি বর্ষাতেই তৈরি হয়ে থাকে, এবারও তা পাতার তোড়জোড়ও চলছিলো। খানিকটা খানিকটা পাতাও হয়েছিলো। কিন্তু রাত বারোটায়, তার কম নয়, প্রথমে বাথানের রাখাল, তার পরে তার চাইতে বয়সে বড় একজন চাকর, যে কুড়ার ধারেই জান মজবুত করার পাট-সুতাল পাকাচ্ছিলো তখনও, দৌড়াদৌড়ি এসে খবর দিলো। বন্যার মতো কচুরি, শালুক, কলমি ভাসিয়ে নিয়ে জল নামছে কুড়ায়। ছোট যে জান তার কাছেই মাগুর, কালিবাউস লাফাচ্ছে। মনে হয় রাতে রাতে মণ মণ মাছ 'আসি যাইবে'। যেন ছাউনিটা আক্রমণ করেছে চীনা সৈন্য, যেন বন্যাটা কুড়ার পথ ছেড়ে শাতালু পাড়ায় ঢুকে পড়েছে, তেমন কলকল কলকল, ঘুমভাঙা চোখ, ব্যস্ততা, মশাল আলো, কুপির আলো। দ্বারিঘরে সামাথের ঘুমও ভেঙে গিয়েছিলো। মশারি টাঙাতে পারলে, কম্বলের উপরে খাকি রঙের চাদর পাততে পারলেই, পাম্পবালিশ ফুলাতে পারলে তো কথাই নেই, সে গাঢ় ঘুমে ঢুকতে পারে গাছতলাতেও। অন্যদিকে তার একটা কান যেন আল্যার্মের শব্দের জন্য সে ঘুমের মধ্যেও খাড়া থাকে। সোরগোলে দ্বারিঘর থেকে বাড়ির ভিতর দিকে ঢুকতে তার প্রথম মনে হলো, আগুন নাকি ? প্রত্যেকটা প্রাণীর ঘুম ভেঙেছে, নানা কোণে বসানো সেই সব ঘরগুলোর সব দরজা খুলেছে। ঘরগুলোর মধ্যকার সেই সোরু সোরু পাক খেয়ে চলা গলিগুলোতে, সেই সব ঘরের দরজার সামনে সামনে, কুপির, শিন্নার মশালের, বাঁশের চোঙের মশালের, হারিকেনের আলো। নানা লোকের নানা রকমের গলার মধ্যে পওরের গম্ভীর গলা। খবরটা বোঝা গিয়েছিলো অবশ্যই। কুড়ায় জলের স্রোত আর মাছের স্রোত একাকার। ঘণ্টা দুয়েক সোরগোলের পর পওর নিজে, বাড়ির সব কজন পুরুষ, কোন কোন শক্তসমর্থ স্ত্রীলোও, পওরের সেই বেহার 'থাকি' আসা সুন্দরী তিসরা বিবি, বাঁশের চাচারি, সুতলি, মশাল, হারিকেন নিয়ে চলে গেলে, রাত দুটো আড়াইটায় বাড়ি-পাড়াটা শান্ত হলো। বুড়িরা যে যার ঘরে দরজা বন্ধ করলো। বাচ্চা-কাচ্চা আছে যাদের তেমন স্ত্রীলোকেরা ঘরের দরজায় দরজায় দাঁড়িয়ে খানিকটা গল্প ক'রে, হাই তুলে শেষে নিজের নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলো। এঘরের ওঘরের মধ্যে গলিগুলোতে তখন আবার নরম হাল্কা অন্ধকার নেমেছে। সামাথ হাই তুলে ঘুমটাকে মিটিয়ে নিতে দ্বারিঘরের বিছানার দিকে যাচ্ছিলো। এখন তার বাড়ির মধ্যে আর ঘর কোথায় ? আর তা ছাড়া মাছেও সে উৎসাহ পেলো না। যখন সে সামতিনির ঘরের খোলা জানালাটার নিচে—

ঝম্ ঝম্ ক'রে এক পশলা বৃষ্টি নেমে গেলো। সামর্তিনি একটা গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। সামাথ দুপা এগিয়েছিলো, সেও ফিরে এলো। এ রকম চারদিক আড়াল ক'রে ঝমঝম ঝরি হলে কিছু আর দেখা যায় না, কিছু আর শোনা যায় না, কোন কথা মনে আসে না ; মনে হবে, যদিবা মনে হয়, তুইও ঝরি, জল, বৃষ্টিই বা। তো সেই খোলা জানলায় সামর্তিনির একটা আঙুল। আর জানলার নিচে বাইরে বেড়ায় হৌলদিয়া একটা হাত। আর দুনিয়া ঝাপি ঝম্ঝম্ ঝরি আবার।

ঠাকুর্দা শাতালু থেকে পওর পর্যন্ত বেশি কথা, বাপ-শাতালু থেকে পওর পর্যন্ত দিনকাল এক থাকে না। যদিও পওর যে আর এক শাতালু মিঞাই ভিতরে ভিতরে, তার প্রমাণ, তার এখন চল্লিশ হতে না হতে কানের দুপাশে চুল সাদা। দিনকাল যে বদলায়, তার প্রমাণ, প্রথমেই পাকা পিচ-সড়ক থেকে শাতালুদের বাড়িগুলো পর্যন্ত কাঁচা সড়কটার কথা তোলা যায়। বাপ-শাতালুর সময়েও পথটা ছিলো, গোরুর গাড়ি চলার মতোই ছিলো সেই আধমাইল কাঁচা সড়ক ; কিন্তু জোর বর্ষা হলে, তার অনেক অংশ জলের তলায় 'গেইতো'। পওর সবহাপতি হওয়ার দুবছরের মধ্যেই, সে পথে জল দাঁড়ানোর কোন সম্ভাবনা নেই আর। পথটার ধারে আগে দু একটা গাছ ছিলো, এখন, চওড়া করা, উঁচু করা সেই পথটার দু ধারেই গাছ, দু ধারেই ঘাসের চাপড়া দিয়ে মাটি ঢাকা। না হলে পওর তার স্কুটার নিয়ে চলে বা কেমন ?

দুপগুরিতে তো অনেকদিন 'থাকি' বাস চলে। কিছুদিন ধ'রে কোন বিষয় ঘটতে থাকলে, তা পাপ হলেও, সহজ হয়ে যায়। বাপ-শাতালুও, সঙ্গে লোকজন থাকলে, জীবনের শেষদিকে এসে বাসে উঠতো। আর এখন তো ! ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও একা একা, একে দুয়ে, বাস দেখলেই চড়ে, বাসে চ'ড়ে ইস্কুলে যায়। সে ক্ষেত্রে শাতালুদের বাড়ি-পাড়া থেকে অতগুলো বাচ্চা-কাচ্চার মধ্যে দু-চারজন কি ইস্কুলে না গিয়ে থাকে ! তা বলতে গেলে বলতে হয়, পওর নিজে ফোর-ফাইভ পর্যন্ত পড়েছিলো, বাপ-শাতালুর আমলেই। সামর্তিনি ক্লাস সিক্স সেভেন পর্যন্ত পড়েছিলো এক কালে, আর সামাথ তো 'মেট্রিক' পাসই। বাস এখন এ অঞ্চলে সড়গড়। বাসের জন্যই হাটটা দৈনিক বাজার হয়ে যাচ্ছে। সামর্তিনি তো একাই, নয়তো বাড়ির কোন কোন মেয়ে-সঙ্গিনীকে নিয়ে, পুরুষসঙ্গী ছাড়াই, হুস্ ক'রে বাসে চ'ড়ে ফালাকাটা গিয়ে নিজেদের পছন্দমতো কেনাকাটা করে টুকটাক।

এখন আর তেমন নয়, ঠাকুর্দা-শাতালু থেকে বাপ-শাতালুর প্রথম আমল পর্যন্ত যেমন বহাল ছিলো, যে বাড়ির মধ্যে এক কাপড়, আর কোন কারণে বাড়ির বাইরে পা রাখতে হলে দুটো কাপড় পরবে মেয়েরা, দ্বিতীয় কাপড়টাকে বুক-কাপড়ই বলো আর চাদ্দরই বলো। এখন, বাপ-শাতালুর শেষ আমল থেকেই প্রায়, পওরের সময়ে বাড়ির বাইরে সে পরিবারের মেয়েরা 'ব্লউস, শ্যায়া' পরে ; যেমন সামর্তিনি

এখন ব্লউস গায়ে। অবশ্য, বলা যায় না. নিজেই যদি ধানক্ষেতে নেমে যায়, তখন ব্লউস গায়ে রাখবে কি না। ধানক্ষেতে বেশি বয়সের পুরুষরা এখনও নেংটি পরি নেয়, অল্প বয়সী পুরুষরা লুঙ্গি পিনধে তো হাঁটুর দুই আঙুল উপর, আর মেয়েরা, সে বারো থেকে বাহান্ন যাই হ'ক বয়স, উঁচু ক'রে শাড়ি পরে ব্লাউস নিশ্চয়ই গায়ে দেয় না। হলপ্ 'করি' বলা যায় না—এসব এমনই থাকবে কি না চিরকাল। যেমন, পওরের বেহার থ্যাকি আনা নয়া-বউ, যে রবারের চটি ছাড়া উঠানেই নামে না, চটির উপরে রূপার মল থাকে, ঘরের ভিতরেও 'ব্লউস-শ্যায়া পিনধে', সে কখনও একহাঁটু জল দূরে থাক, পায়ের পাতা ডোবা জলেও রোয়া বুনতে নামবে কি ?

দিন বদলায় কি না, তার প্রমাণ তো মেয়েদের মধ্যে। পুরুষ তো বাইরে বাইরে ঘোরে, সহজে দশজন যেমন চলে, যেমন পরে, তেমন নকল ক'রে নেয়। আগে কখনও তেমন খুবই কঠিন অবস্থা না হলে, কেউ চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডেকেছে ? এখন, দুপগ্রিরর হেলত্ সেণ্টার হওয়া 'থ্যাকি', মেয়েদের অসুখেও হেলত্ সেণ্টারের ডাক্তার ডাকা হয়েছে দু একবার। আর মেয়েদের ব্যাপারেও অনেক সময়েই সেই হেলত্ সেণ্টারের নার্সরা এসে যায়। আর, সেই ব্যাপারটা। কাণ্ড! বাপ-শাতালু হেলত্ সেণ্টারের গায়ে সেই লাল বড় আকারের ত্রিভুজটা আর বড় বড় হলুদ অক্ষরে লেখা কি-সবের সামনে, একমাথা পাকা-চুল 'থক্' খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কি ব্যাপার ? 'লোকে কেন্ মুখ টিপি হাসে ?' আর এখন তো 'ফেমিলি পেনিং'-এর সেই মেয়ে ভিজিটার, যেন মাঝে মাঝেই, বেড়াতে আসে শাতালুদের বাড়িতে, নাকি পুরুষ জানতে পারবে না এমন বুদ্ধিও দিয়ে যায়, আর টাকা পয়সা জোগালে বড়িও।

এগুলো দিন বদলানোর এমন লক্ষণ, যে যার তুলনায় পওরের ঘরের 'ট্যানজিস্তার' আর তার বেহার-ওয়ালীর ঘরের আরও জোরদার আর নতুন 'ট্যানজিস্তার'-ও কিছু নয়। পওরের সেই পুরনো 'ট্যানজিস্তার' এখন সামতিনির ঘরে। বেটারি টেটারি ঠিক করি নিলে বাজে।

ঝরির ঝম্‌ঝম্ কমে গেলে, মন তখন অলসভাবে এদিক ওদিক ছড়াতে থাকে। কমে-আসা ঝরির দিকে চেয়ে চেয়ে, ঝরির বাইরের অন্য কথা ভাবা যায়। গল্পটা মনে পড়লো সামতিনির। পওর একদিন শুনে অবাক হয়েছিলো ; 'বাপুরে, তোমরাই, আমরা না হয়, খোদা-ভগোমান না হয়, তোমরাই মালিক হয়্যা গেইছো। আমরা জানির পারি না। সেই সব বড়ি।'

কিন্তু সামতিনির মেয়েটা জলে ডুবে যাওয়ার পর থেকে সামতিনির মন শক্ত হয়ে গিয়েছিলো। প্রথম ছ'মাস তো পওরের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে নি। থাক না তুই বড় বিবির ঘরে। বেশি আপ্তজন তো। কেমন, পিসির কন্যাই ; বয়সও সমানই প্রায়, হয়তো রং শাতালুদের মতো কালো নয়, হয়তো বাদামী, কিন্তু শাতালুদের মতো এখনই মাথার চুলে পাক। তারপর হাবভাবে বোঝা গিয়েছিলো, পওর আবার ঘুমাতে আসবেই, বাধা মানবে না, তখন নিঃসন্তান হয়েও, উদাস থেকে গেলেও,

সামর্তিনি সতর্ক হয়ে গিয়েছিলো। যেদিন বেহারে নিকা করতে যাবে, তার আগের রাতের কথা মনে করো। তিন চার মাস থেকে তখন পওর দ্বারি ঘরে ঘুমায়, বড় বিবির ঘরেও ঘুমায় না। ধান পাকা, ধান কাটা, ধান তোলা, ধান ভাগ ভাগ ক'রে দেয়া—এসব সময়ে দ্বারিঘরই ভালো। তার মধ্যে আবার বেহারের সেই নিকার কথা চলছে। পওরের কথাতেই প্রমাণ সে সেই রাতে সামর্তিনিকে 'জবদ্' করতে এসে ছিলো। হয়তো ভেবেছিলো, কয়েকমাস আসা যাওয়া নেই, সামর্তিনি অসতর্ক হয়ে আছে; 'ট্যানজিস্তার'-টা হাতে করে এসেছিলো। বলেছিলো, তোর ঘরে, সামর্তিনি আর 'ছাওয়া-ছাওয়ী' নাই। হওয়া লাগে। সেদিনের দরুন যদি ছেলে হয়, তবে তার জন্য তার স্কুটারটা তোলা থাকবে; যদি মেয়ে হয়, তবে তাকে হয় বেহার না হয় জলপাইগুড়ি 'শহরৎ' ইস্কুল মাস্টার, না-হয় কেরানিবাবু কারো সঙ্গে বিয়ে দেবে। এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলো পওর। পওর আদর করতে জানে, খুশি করতে জানে। বলেছিলো: তোর মান হতে পারে, সামর্তিনি, কিন্তু তোর গা ছুঁয়ে বলি, নতুন বউ একটু পুরানা হোক, দাঁড়ে বসিয়া যাউক', তো বড় বিবি, তুই আর ছোট বিবি সমান পাবি। আচ্ছা তো, সপ্তাহে দু দিন তুই-ই বাছি নে। নয় তো, সোম আর বিষুৎ তোর থাকবে। দেনমোহরের কথা বলিস যদি। পওর একটু সহানুভূতিও চাইছিলো। কি সাংঘাতিক কথা, সেই সতর আঠারোর বেহার কন্যার জন্য দশ হাজার দেনমোহর দিতে হবে। সামর্তিনি বলেছিলো, বোধ হয়, আমাদের দুজনের বেলায় তো দেন-মোহরের কথা ওঠে নি। আমরাও তো 'পাছুয়া না হং'। পওর বলেছিলো, ছাড়্ এটেকার মোল্লা নাই-জানে, ফির শাতালু মিঞাক ভয় পাইছে? ও, আচ্ছা, তো শোন, তোর মার সত্র বিঘা যা শাতালু নিছে, আজ থাকি তোকে তা দিলং। দেনমোহর ধরি নে।' হয়তো ঠাট্টা নয়। মানুষের মনটা বেশ ছড়ানো থালার মতো; নানা দিকে নানা চিন্তা, ভাব, থাকতে পারে একই সঙ্গে। সত্র-আঠারোর চালচিরা দুধ বেহার কন্যার দিকে চুলে পাক ধরা পওরের নিশ্চয় লোভ, অন্যদিকে দশ হাজারের দেন-মোহরের কাগজ করতেও ভয় ভয় ছিলো, বিরক্তি ছিলো। হয়তো ভেবেছিলো সত্র বিঘা ফিরিয়ে দেয়ার কথাটা দেনমোহর দেয়ার মতোই ব্যাপার। রাভা আইন অনুসারে ওই সত্র বিঘা তার মায়ের থেকে সামর্তিনিরই পাওয়ার কথা। কিন্তু তার মা পাছুয়া হয়ে কি মোসদী হয় নাই? আর সে নিজেও তো পওরের নিকা করার দরুন অবশ্যই মোসদী হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সেই সত্র বিঘা পওরেরই হয় পওরের হিসাবে।

কিন্তু সোম বিষ্যুৎ দূরের কথা, সামর্তিনি হাসলোই যেন মনে মনে, এখন আবার ছোট বিবি তিনমাস হয় ফিরেছে, আর যদি ফির বেহারৎ যায় তো 'অগ্ঘানত' রাস যখন হইবে, আরও চারমাস এখানেই থাকবে, সুতরাং পওরের সাধ্য কি অন্য ঘরে ঘুমায়? তো কতদিন থেকেই তো সামর্তিনির আর সতর্ক থাকতে হচ্ছে না। যেমন এখন থাকে নি।

এটাও কিন্তু বেশ বড় পরিবর্তন শাতালুর আমল থেকে ; পওরের তিন বিবি বটে, কিন্তু মোল্লার সামনে নিকা, পাছুয়া নয় কেউ-ই, পিসি কন্যা, সার্মতিনি, আর বেহারিয়া।

অন্য যে সব পরিবর্তন সে তো চারদিকেই দেখো। কত বাস 'দিনেরাতি' ভোক্ ভোক্ করি থাকে, হাট-টা বাজার হয়্যা যায়। দেখবেন দুপগুরি শহর হয়্যা যায় বা। 'ইলেকট্রি' আসি গেইছে। হয়তো সবহাপতি তার বাড়ির অন্তত একটা ঘরে 'ইলেকৃট্রি' নেয়ার কথা ভাবেও। আর এদিকে ইতস্তত গ্রামগুলোতে যে রাভারা আর কোচরা ছিলো, তারা যেন কেউ কোথাও নেই।

ছিলো যে তার প্রমাণ, সার্মতিনি। এ বিষয়ে দুপগুরির বই-এর দোকানের সেই আধবুড়ো পাকা-কোঁকড়া চুলের মানুষটার কথা শোনা যেতে পারে। তার মতে বিহারের রাজ্যই প্রথম সর্বনাশ করে, হিন্দু হয়ে। ছিলো কোচ, হোল্ হিন্দু। তো রাভা আর কোচ তো একই। রাভারা এখনও বলে, 'নাং কোচা', আমরাই আসল কোচ, যারা হিন্দু হয় নাই। দেখো পরে, রাভারাও হিন্দু হতে গিয়ে দাস পদবী নিয়েছে। কিন্তু গোত্র বদলাতে পারে? এখনও হিন্দু হয়ে যাওয়া রাভাদের কোচদের গোত্র তার মায়ের গোত্র। কিন্তু হিন্দু হয়্যা এই হয়েছেঃ ধানজমি বাবার হয়্যা গেইছে, মার থাকে নাই, যেমন কোচের, রাজবংশীর, মোম্মদীর। এখন ধানজমি, যদি কেউ রাভাও থেকে থাকে গোপনে, মার পরে মেয়ে পাবে না, ছেলেই পাবে বাপের থেকে। কোথায় গেলো? কোথায় হারিয়ে গেলো এই জাতিটা? তাদের ভাষা নিয়ে, তাদের রীতরকম নিয়ে? কোথায় আবার যাবে? কেউ বলে কামরূপ জেলায় উঠে গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার ছাড়িয়ে গেলে পাহাড়ী বনের মধ্যে কেউ কেউ লুকিয়ে নাকি আছে; কিন্তুক, সেই কোচ বা হিন্দু রাভাই, কারণ গোত্রটা তখনও মায়ের গোত্র ; একদিন সেই বুড়ো বলেছিলো, 'কোচা মিয়াঁ চিয়ো, কোচা আমার নাম্প্রাভো।'

'গাত হাত দিবু না,' বলে পঞ্চদশী সার্মতিনি পিছিয়ে বসেছিলো।

তো সেই হিন্দু হয়ে যাওয়া বইওয়ালা কোচ-রাভা বলেছিলো, 'কোচ পুরুষরা যুদ্ধে নিহত হলো, কোচ মেয়েরা দিশেহারা হলো।' সেইটাই তোক কং, হলুদিয়া রাভাকোচর বেটাবিটি কেনে কালা হয়্যা যায়। যেমন মুই কালা-হলুদিয়া, যেমন তোর 'আমায়', মা, শাতালু মিঞা থাকি কালা বেটা বা পায়।

'রাভা নাই থাকে কি উমরা?'

'কেমন করি বা থাকে! তুই ও না মোম্মদী হয়্যা গেইছিস!'

হয়তো সেই বই-এর দোকানের জাতি হারিয়ে যাওয়া লোকটি সার্মতিনির গায়ের হলুদিয়া সাদা রংটাকেই ছুঁয়ে দেখাতে চাইছিলো, কিংবা তাতেই প্রলুব্ধ হচ্ছিলো।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা, উঠে অন্য জেলায় বা বনে চলে যাওয়ার চাইতে, দিশে-হারা হয়ে জমি বাঁচানোর জন্য কারো পাছুয়া হয়ে যাওয়ার চাইতে, হলুদিয়া রাভাকোচ কালিয়া হয়ে যাওয়ার চাইতেও জটিল, এমন কথা বলেছিলো সেই বই-এর দোকানের

বুড়ো কর্মচারী : 'আচ্ছা, সিমর্তিনি, এই নাম কোটে পালু তুই, কায় দেয় ?'

'আমায় দিছে তো।'

'আচ্ছা কোটে পায় এই হিন্দু নাম তোর আমায় ?'

'পাইছে। মোক না এলায় সামর্তিনি বোলে। সিমর্তিনি বোলে বা কাঁটা।'

'বলবেই তো। মোম্মদী শাতালু কেমন করি তোর হিন্দু নামটা জানে ? এইটা না বিপদ। দেখ তুই ইস্কুলত পড়িস। রাজবংশীত কথা কইস, ইস্কুলত বাংলা পড়িস, ইংরাজী পড়িস। তোর মনত রাজবংশী, তার উপর বাংলা, তার উপর ইংরাজি শবদ্ বসি যাইছে। কোচ-রাভা শবদ্ কয়েটা বা জানিস ? আর রাভা থাকির পাস ? আচ্ছা, আসিস ফের। 'না হয় সিমন্তিনী হস।'

'আসিম তো। খাতা, পেনসিল, বই কিনির আসিম। কিন্তু গাত হাত দিবু না।'

এ সবই দশ এগারো বছরে কেউ ভুলে যায় না। বিশেষ, স্ত্রীলোকেরা যেমন স্পষ্ট সাহসে শরীরের কথা ভাবতে পারে সামর্তিনি ভাবলো, যে প্রথম বুকের উঁচায় আঙুল ছোঁয়ায়, তার কথা অনেকদিন পরেও মনে পড়ে যেতে পারে, আর তা মনে পড়লে, সে কি বলেছিলো তাও কিছু মনে আসে। যেমন সে বলেছিলো, 'কোচানি কানাইঙি গাবঅ হাইলদি', কোচদের গায়ের রং হলুদ। আর এটা তেমনই সত্য, যেমন 'রাক্লাংনি গাবঅ হিঞ্জিলিং', আকাশের রং নীল। যেমন সেই বুড়া, তার কয়েকটা দাঁত না-থাকলেও, হেসে বলেছিল, 'নাইং পেনেম মিচিক।'

'কি কন ?'

'তুমি সুন্দরী নারী।'

মনে থাকার কথাও। যেমন সে হোলদিয়া-সাদা, যেমন তার আমায়, মা, মোষকালো শাতালুর বিছানায় শুতে আরম্ভ করলেও হোলদিয়া-সাদা ছিলো। সে যখন শাতালুর বাড়িতে এসেছিলো, তখন সেই নতুন জায়গায়, তার যে অবাক লাগতো, তার মনের মধ্যে যে স্বপ্নে দেখার মতো আর একটা বাড়ি অন্য এক জায়গায় থেকে গিয়েছিলো, তা তার এখনও অনুভব হয়। এক রাতে তার খুব অবাক লেগেছিলো, বিরক্ত লেগেছিলো। এ রকম অনুভূতির স্মৃতিই হাল্কা হয়ে গেলেও কখনও কি মনে আসতে পারে, কেউ কথাটা তুললে ? না স্বপ্নের মতো মিথ্যা নয়। সেদিনই সে প্রথম লক্ষ্য করেছিলো, ঘুম ভেঙে গেলে, তার 'আমায়'-এর পাশে শাতালু মিঞা শুয়ে আছে একমাথা সাদা চুল আর মোষকালো গায়ের রং নিয়ে। তার এ রকমের স্মৃতিগুলো সেই বই-এর দোকান থেকে ফেরার পরই বোধহয় উথলে উথলে উঠেছিলো। তার মনে হয়েছিলো, আগে সে মায়ের বিছানায় অন্য একজনকে শুতে দেখেছি কি ? যেন মার মতোই হলুদিয়া, এখনকার এই সামাথের মতোই, কিন্তু সে বোধ হয় অনেক বেশি সামাথের তুলনায় মোটা ছিলো। আর এটা যদি স্বপ্ন দেখা না হয়, তা হলে সে তো বোঝেই এখন, মায়ের বিছানায়

সে-রকম কাউকে যদি শুতে দেখে থাকবে, তবে সেই ছিলো, সামতিনি যার নাম, তার আওআ, বাবা। আসল কথা, সেই প্রথম কারো বুক ছোঁয়া, শাতালু মিঞাকে মার বিছানায় শুতে দেখার প্রথম প্রথম বিরক্তি, যা এখন খুবই ফিকে, আর তা ছাড়া তার বছর পাঁচেক হতেই সে তো অন্য ঘরে ঘুমাতো, মার ঘরে নয়, তারও একটা ফিকে হওয়া বিরক্তি, হয়তো এই সব নানা কারণে সেই দশ এগারো বছর আগেকার অনেক কথা সে ভোলে নি।

আর সেই গল্পটার কথা ভাবো, যা শাতালু মিঞাদের বুড়িরা করতো, সেই এক উঁচা লাম্বা ভারি শরীরের, নাকের নিচে অল্প অল্প গোফ,—উমরায় তিস্তার চর শাতালু মিঞাক ধরি শুয়োর মারতে গিয়েছিলো, শাতালু একলা ফিরেছিলো, সে আর কোনদিন ফেরে নি। উঁচা লাম্বা, ভারি শরীর, নাকের নিচে অল্প অল্প গোফ, সেই কি তার আওআ, পিত্যা, ছিলো? দেখো, মোম্মদী শাতালু শুয়ার না খায়, কিন্তুক তাও গিয়েছে শিকার করতে। দেখো, বই-এর দোকানের সেই বুড়াই বা এখন কোথায়? মরেও যেতে পারে, কোথাও চলেও গেছে হয়তো। দেখো, তার বছর খানেকের মধ্যেই সামতিনিরও স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছিলো। ষোল হয়্যা যায় তো। দেখো, সে তারপরে আমায় এর কাছে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কটা রাভা শব্দ, কটা রাভা বাক্যই বা জেনেছে? সামতিনি হাসলো মনে মনে, তো রাভার উপরে রাজবংশী, তার উপরে বাংলা, তারও উপরে দুই চারিটা করি ইংরাজি শব্দ। চাপি বসছে।

যতই ঝমঝম্ শব্দ করে আসুক, পনরো বিশ মিনিট বড় জোর। তা হ'লেও এখনও বৃষ্টিটা হচ্ছে। মনে হয়, দূরে তাকালে, ভিজা সাদা শাড়ি ঝোলানো, তবে এখন ত্যারচা ডুবির-দাগ দেখা যাচ্ছে না। বরং মাথার উপরের পাতাগুলো থেকে যে জল পড়ছে তার শব্দই বেশি। ফোঁটাগুলো ওজনদার। একটা সামাথের মাথায় পড়লো। সে হাতের তেলোয় মাথা মুছলো। একটা সামতিনির খোঁপার উপরে পড়ায় সে টের পেলো না। তৃতীয় একটা তেমন বড় ফোঁটা সামতিনির গায়ে পড়তে সে যেন দিনের আলো ফুটতে দেখে চমকে উঠলো।

সে তখন লক্ষ্য করলো, হলদে-বাদামী প্যান্টটার ভিজে পা দুটো গুটিয়ে তুলছে সামাথ, আর সামাথের একটা পায়ে বড় একটা অপারেশনের লালচিয়া দাগ। সামাথ 'নে' বলে, রোয়ার ধামাটা উঁচু ক'রে ধরলো সামতিনির মাথায় তুলে দিতে। তারপর বাঁকুয়ার বাঁশটাকে একটু নিচু হয়ে কাঁধে তুললো সে।

সামতিনির একবার মনে হলো, সামাথ যে এইভাবে ভারি বাঁক কাঁধে চলেছে, তার কষ্ট হচ্ছে কি না কে বলবে? আগে তো কোনদিন এমন বয় নাই বোঝা। তো, কাল সন্ধ্যা-সন্ধ্যা বিকালে জলপাইতলায় একবার, আর ভোর ভোর সময়ে, আর আজ ট্রাকে বীজতলায় যেতেও আর একবার, খানিকটা সামাথ বলেছে—তাকে কাঁধ থেকে ঝুলিয়ে ভারি বোঝা নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে যেতে হয়। আর ট্রাকে সেই

ভোর-রাতের জলো হাওয়ায় শীত শীত ক'রে উঠল, সামর্তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলো।— 'শীত জার লাগে কি ?' আর সামাথ বলেছিলো তখন, 'বাপুরে, কইস কি ? বরফ পড়ির থাকে। গুঁড়া, গুঁড়া গুঁড়া। সাদা হয়্যা যায়। তোক ঢাকি ফেলে বরফ, সেই বডারের পাহাড়ের উপর।' সামর্তিনি আবার অবাক হয়ে গেলো, উমরায় সিপাহী, কি থাকি কি হয়্যা গেইছে! অবাক হওয়ার কথা নয় ? চারদিকে এত অসংখ্য মানুষের মধ্যে ঠেলি খাড়া হয়্যা উঠছে এমন একজনা। সৈনিক!

সামর্তিনি আড়চোখে সামাথকে দেখে নিলো। না, এখনও নির্জন পথ। বর্ষার এত সকালে বাসে যাত্রী হবে না বলেই বাস চোখে পড়ছে না। আর এখন যদি কেউ ঘরের বাইরে বেরিয়েও থাকে তবে রোয়ার ক্ষেতে চলে গিয়েছে। রাস্তায় আসবে কেন ? তুলাইপাঞ্জার কথা মনে না হলে, সেও এখন পথে থাকতো না। শাড়ি এত ভিজে যাওয়ায় অসুবিধা হচ্ছে হয়তো চলতে। তা কিন্তু রোয়ার ক্ষেতেও তোমার গায়ের উপরে বৃষ্টি নামতে পারে। তাতে ক্ষেত ছেড়ে উঠে পালায় না কেউ।

সৈনিক। ভাবা যায় ? এক সময়ে সে আর সামাথ মাথায় মাথায় ছিলো। বরং সামর্তিনিই তখন, সেই সাত-আট নয় বছর আগে, যেন গায়ে বেশি ফুলছিলো। আর এখন তার মাথার উপরে এক হাত উঁচা, খাড়া এই হলুদিয়া সৈনিক।

কিন্তু এমন হতে পারে, বাঁকটা নামালে, জামা খুললে দেখা যাবে বাঁকের জন্য কাঁধ লাল-লাল হয়ে আছে। আহা। সামর্তিনি চোখ তুলে স্পষ্ট ক'রে সামাথের মুখ দেখে নিলো। সামনে চেয়ে পথ চলছে সে। কিন্তু ঘুম ঘুম ভাবও আছে চোখে। সেই মাঝ রাতি থাকি ঘুন কোথায় ? সামর্তিনির হোলদিয়া-সাদা মুখ কিছু লালপারা হলো। তো, এখন তো সে বলতেই পারে, বিবাহিতা নারী তো, যার সন্তানও হয়েছে, যে পুরুষ কোন কোন সময়ে ক্লান্ত হয়ে ধরা পড়লেও, স্বীকার করে না। এখন সেটা তার গাল লালচিয়া হওয়ার কথা নয় আর।

আসল কথা, তখন তারা দুজনেই, সেই সাত-আট-নয় বছর আগে ছোট ছিলো। তখনও তারা মাথায় প্রায় সমান। সে স্ত্রীলোক বলে ইস্কুলের পড়ায় সামাথের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছিলো। 'সিক্স থাকি সেভেনে' উঠে সে ইস্কুলে গেলো না। তার তখন ষোল হয়ে গিয়েছে তো। আর সামাথ তখন হয়তো পন্দ্রো, কিন্তু নাইনত্ উঠি গেইছে। তখন সে নিজে বাড়িতে বসি থাকছে। শোনা গেইছে পওরর সাথে তার নিকা হতে পারে। কারণ নিকায় কোন দোষ নাই। তার আমায়-মা, পওরর বাপ শাতালুর পাছুয়া-বিবি হতে পারে, কিন্তুক পওরের বাবা মা আর তার বাবা মা আলাদা।

এসব ব্যাপারে বলা খুব কঠিন। বিশেষ ছোটবেলায় এসব বুঝতে পারা যায় না। আলোচনা হয়। বাড়ির বুড়িগুলো, আজিগুলো আলাপ করে। বয়স বাড়তে থাকলে ক্রমশ সম্বন্ধগুলোকে ধরা যায়। বিশেষ, রোয়ার ক্ষেতে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে যখন একহাঁটু জলে রোয়া গাড়া, তখন সেই বুড়িগুলো বয়সের তফাৎ নাই মানে।

যেন সেই সব আলাপ, সামর্তিনির শোনা গল্প, রোয়ার ফলন বাড়াতেই, সেই হুদুমদেউ এর নাচগানের মতো ব্যাপার যেন, যা নাকি ভীষণ খরাতে কোন কোন সময়ে, মেয়েরাই জলের জন্য, বৃষ্টির জন্য নাচে। 'হুদুম' হয়ে নাচে। ভাবতে গাল লাল হয়ে যায়। না, এদিকে সে রকম খরা কোন কালে হয় না। সেইসব রোয়ার ক্ষেতে যখন হাঁটু পর্যন্ত জলে, আর গা গড়িয়ে বৃষ্টির জল নামছে, তখন বুড়িরা শুরু করলে, অল্পবয়সী বউ ঝিরাও ফিস্‌ফিস্ করে যোগ দেয়, সে-সব গল্পে জানা যায়, কে কত জমি নিয়ে এসেছিলো, কে কার বাপ মা, কার সঙ্গে কার 'রিয়ার' কথা চলছে।

সে রকম সব সময়েই জানা গিয়েছিলো, সামাথ শাতালু মিঞার সেই পাছুয়ার বেটা যে আট বিঘা জমি 'ধরি' এসেছিলো। তবে একটা কথা ঠিক বলা যায় না, সে শাতালুরই, কিম্বা তার মায়ের আগেকার স্বামীর ; যদিও সে এ বাড়িতেই জন্মেছে। মায়ের মতোই তো 'থানেক হোলদিয়া'। সামাথের এক বড় ভাই ছিল। তার লেখা-পড়ার ইচ্ছে ছিলো না। তা, শাতালু তাকে ময়নাগুড়ির বাজারে দর্জির দোকান করে দিলে সে সেখানে চলে গিয়েছে। এই বাড়ি থেকে বিবি নিয়ে গিয়েছে।

তো, সামর্তিনির সঙ্গে পওরের নিকা তো ঠিকই, কিন্তু তখন দেরি হয়ে যাচ্ছে তা হতে। কোথাও কিছু একটা গোলমালের সূত্রপাত হচ্ছিলো, হয়তো ধান আর জমি নিয়েই, শাতালু তার পাছুয়া-জাত কিংবা নিকাজাত বহিনের কন্যার সঙ্গে পওরের নিকা দিয়েছিলো তাড়াতাড়ি। সে সামর্তিনির চাইতে বয়সে বেশ বড়ই, ছয়-সাত বছরের বড়ই হবে, পওরের তখন পঁচিশ হলে, তারও বাইশ-তেইশ হবে। সামর্তিনির তখন ষোল-সত্র। তেই পিসির কন্যা এখন পওরের বড়-বিবি।

তো, কি যে হয়ে গেলো। সামর্তিনির নিকা হয়, কি না-হয়। ইস্কুলের পড়া ছেড়ে চারবার রোয়া গাড়া হয়ে গেছে। আঠারো-উনিশ হয় বয়স। সামাথ 'মেট্রিক' পাস করেছে। কি যে হয়ে গেলো। মেট্রিক পরীক্ষা দেয়া আর তার ফল বেরোনোর মধ্যে—সেই অল্প সময়ে। 'ষোল সত্র' হয় বয়স। গোম্ফ নাই উঠে। কিন্তু সময় মতো বাড়ি ফেরে না। বাড়ির কাজকর্ম করা দূরে থাক। সিনেমা দেখে। বাস চ'ড়ে কোথায় কোথায় চ'লে যায়। দু'দিন বাড়িতেই ফিরলো না রাতে হয়তো। লম্বা লম্বা চুল রেখেছে। একদিন তো মদ খেয়ে বাড়ি ফিরলো। অথচ দেখো ষোল-সত্রর সেই ছোকরার 'গোম্ফ নাই উঠা' মুখটা কেমন কোমল। চোখ দুটোর কেমন কষ্ট। দুখানা ঘর তাদের, সামর্তিনদের দুখানা ঘর থেকে দক্ষিণ-পুব কোণে তার একখানা ঘরে সামাথ তার পড়ার জন্য একলাই থাকে। অন্য ঘরখানায় তার মা আর তার ছোট এক বোন এক ভাই, ঘুমাতো, বড় ভাই তো তখন থেকেই ময়না-গুড়িতে দর্জির কাজ শেখে, অবশ্য যেদিন তার মা শাতালুর বড় ঘরখানায় ঘুমোতে না যেত। আর ঠিক সে সময়ে সামাথের মা মরেও গিয়েছে। অনেক-বয়সে সন্তান হতে চলেছিল তার। কি যে হয়ে যায়! বোধ হয়, সব মানুষের জীবনে একটা

বিরক্তি-রাগ-লজ্জার সময় এসে যায়, যার ওপারে কিসে কি আসে যায় ব'লে না বুঝ হাসিখুশি, যার এপারে, এরকমই হয় ব'লে, সহনশীলতা। মাঝখানে খেপে যায় যেন মানুষ। লক্ষীছাড়া হয়ে যায়। যেমন তখন সামাথ।

তো, সেদিন কিবা কি হয়েছে, কিবা কি করেছে সামাথ। দুপুর থেকে বকাবকি চিল্লাচিল্লি। শাতালু গাল দিয়েছে, পওর গাল দিয়েছে। সকাল থেকে দুপুর খায় নাই সামাথ। নিজের ঘরে থেকেছে। বিকেলে সে সব শুনে শাতালুর আর বেড়েছিল রাগ। সে চিৎকার করে বলেছিলো—পাছুয়ার বেটা, তারই আবার মেজাজ দেখং! তখন বিকেল, সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়েছে, রাত হয়ে গিয়েছে। বাড়ির সবগুলো ঘরে সকলের খাওয়া শেষ হয়েছে! সামর্তিনির মা রান্না খাওয়া শেষ করে শাতালুর বড় নিকার বিবির ঘরে গিয়েছে, সেখানেই রাতে থাকবে, তার হাঁপানির টানের জন্য সাহায্য দরকার। সামর্তিনি দেখলো রাত নিশুতি হয়ে যাচ্ছে। সে নিজের ভাত থালায় বেড়ে নিয়ে খেতে ব'সে, না খেয়ে, থালাটা আর জলের ঘটি নিয়ে সামাথের ঘরে গিয়েছিলো।

এখন সেজন্য মুখ লাল করার কিইবা আছে? শান্ত হয়ে যাওয়া যায়। কারো রাগ ভাঙিয়ে খাওয়াতে হলে কথা বলতে হয়, সান্ত্বনা দিতে হয়, গায়ে হাত দিতে হয় পাশে বসে। কি থেকে কি হয়, তা কেউ বলতে পারে না। সামর্তিনি তার আঠারো উনিশে কিবা জানতো নিজেকে? যোল-সতর সামাথের তো আরও কম জানার কথা। মাঝরাত পার হওয়ার পরে, সামর্তিনি ঘরে ফিরে এসে প্রদীপের আলোর পাশে 'মাঝিয়া'-তে বসে ভোর হওয়া পর্যন্ত অবাক হয়ে কাটিয়ে, আলো ফুটতে না-ফুটতে কুড়ায় গিয়েছিলো সামাথের ঘর থেকে আনা চাদরটাকে তাড়াতাড়ি ধুইতে।

এখন তো শান্তই, সে অতীদিনের কথা। সে লক্ষীছাড়া সামাথ এখন দেখো সব চাইতে, কি বলবে? 'লক্ষীমান', সামর্তিনি শান্তভাবে সামাথকে দেখে নিলে। একেবারে ভিজে গেছে সামাথ। তারপরে একের উপরে আর এক শব্দ পড়তে থাকে, জমতে থাকে, সামর্তিনির নিকা হয়েছে পওরের সঙ্গে, তার সন্তান হয়েছিলো, গোপাল রাজবংশী, পওরের ছোটবিবি এসেছে। সব চাইতে নিচে যা থাকে তা ঠাণ্ডা একটা শব্দ ছাড়া আর কিছু থাকে না।

সামাথ বললো, 'বাসে যে যাবু তারও উপায় নাই।'

'কেনে?'

'রোয়ার বোঝা না হয় ছাতে তুলি দেয়া যায়, যেমন ভিজি গেইছি বাসের প্যাসেঞ্জাররা আপত্তি কইরবে। উমরায় ভিজি যাইবে।' সামাথ হাসলো।

'তোর বাসই-বা আইসে কোটে?'

'আর দুই-তিন মাইল হওয়ার পারে, মনৎ কর রোদু তেমন চাড়িবে না যাওয়ার আগে।

সামর্তিনি ভাবলো ঃ কিন্তুক কালি যা হইল—।

সামর্তিনি খুশি খুশি মুখে মনে করলো ঃ সকালেই হঠাৎ শোনা গেলো, সাত-আট বছর বাদে সেই লক্ষ্মীছাড়াটা নাকি ফিরে এসেছে। কে আবার ? সামাথ। মনে হয় দিনকাল খুবই ভালো ! শার্ট প্যাণ্ট, হাতে সোনার ঘড়ি, তাতে রুমাল বাঁধা, পায়ে নাকি বুট, আর কাঁধে, তাক নাকি, পরে জানা গেলো, কিটব্যাগ বলে, তাতে তার আরও জামা-কাপড়, জিনিসপত্র। হৈচৈ পড়ে গিয়েছিলো গোটা সেই বাড়ি-পাড়াতে। ভাবা যায় যে একদিন কাউকে না ব'লে, যেদিকে দুচোখ যায় বলতে বলতে চ'লে গিয়েছিলো সেই ফিরে এসেছে ? অবশ্য একেবারেই নিরুদ্দেশ নয়। একবারেই সে সৈনিক সিপাহী হওয়ার মতে অত দূরে যায় নি। বছর চার পাঁচ আগেও, এ, সে এসে খবর দিতো, নাকি চা বাগানে দেখা গিয়েছে, নাকি বাসের কনডাকটারি করতে দেখা গিয়েছে। আর সেও বাড়ির এঘরে বুড়িদের সঙ্গে, বাচ্চাদের সঙ্গে, পওরের সঙ্গে, যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে, তার খোঁজখবর নিয়ে বেড়ালো, সকাল থেকে দুপুর পার ক'রে বিকেল পর্যন্ত। এক—সামর্তিনিকে বাদ দিয়ে।

লজ্জা ? ভয় ? দুঃখ ?

দ্বারিঘরে থাকা নাকি পছন্দ করেছে যে এক সপ্তাহ এখানে থাকবে।

বর্ষার দিনের বিকেল তখন সন্ধ্যা হয়, সামর্তিনি দ্বারিঘরের পাশ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে জলপাইতলাটায় বিদেশী বিদেশী চেহারার মানুষটাকে দেখে ঠাহর করেছিলো, সেই নিশ্চয় সামাথ। তার এরকম বলা দরকার মনে হয়েছিলো কিছু ক্ষতি হয় নি। হয়তো হেসেই বলা যাবে, তারপর কতদিন চলে গিয়েছে, সে তারপরে পওরের নিকার মেজ বিবি।

সে পায়ে পায়ে তখন জলপাই-এর তলায়, মানুষ চেনাও যায়ও না, এরকম আলোতে সামাথকে বলেছিলো, 'বাপুরে, এলা না 'লক্ষ্মীমান' হয়্যা গেইছিস।'

কিছু দূরে একজন চাকর ব'সে বাঁশ চাচারি দিয়ে জাল বুনছিলো। সে দিকে দেখিয়ে সামাথ বলেছিলো, 'জান্ বুনে কি ?' সামর্তিনি তো ?

সামর্তিনি ভাবছিলো, সে জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি তো এখন সৈনিক সিপাহী হয়ে গিয়েছো সকলে বলছে। ভালো হয় নি বলো ? কথা হচ্ছিলো না।

তখন সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে জল দাঁড়ানো চষা জমিটাকে দেখিয়ে সামাথ বলেছিলো, 'রোয়া নাই গাড়ে দেখং। জমি তো করি রাখছে।'

সামর্তিনি বললো, 'এটা না সত্র বিঘা ভুই। আজ চাষ শেষ হৈল। কাল বোধায় রোয়া হইবে। কিন্তুক—' একটু থেমে গলা নামিয়ে মৃদু সলজ্জ হেসে সে বলেছিলো, 'কিন্তুক।'

সামাথ ঘুরে সামর্তিনির মুখোমুখি হয়ে বলেছিলো, সিমোতিনী. তুই রাগ করি আছিস কি ?'

'না-হয়। তুই চালি গেলু—সেলা আমরা ছোট—। পাছে কিন্তুক ভয় ধরছে, কি

কি বা হৈল ? কোটে বা গেলু ?’

সামাথ হাসতে পারলো। বলেছিলো ‘সেলা নাই চলি গেইলে, এলা এমন করি ফিরির না-পারলং হয়।’

‘উমরায় কয় তুই এলা ‘লক্ষীমান’ হয়্যা গেইছিস।’ সার্মার্তিন মৃদু হেসে বলেছিল।

‘হয় ? তো ধরি নে, তুই-এ মোক লক্ষী পথ দিলু।’

সত্যি কি কৃতজ্ঞতার সুর সেটা এতদিন পরে সামাথের নিচু ক’রে বলা সেই কথায় ?

সামাথ মুখ ঘুরিয়ে সার্মার্তিনকে দেখে নিয়ে বললো, ‘এমন তুই রোয়া গাড়ার সময় ভিজিস, দেখছং আগত। আর তখন তো ফির ইন্দারায় ছান করিবার আগে কুড়াত যায়্যা ডুবছিস। বোধহয় তোর জ্বর হইবে না। অলপ্ অলপ্ জোরে চল না-হয়তো।

তাড়াতাড়ি চলতে গেলে ঝুলন্ত রোয়ার ভারে সামাথের কাঁধের বাঁক উঠছে নামছে। সারা গায়ের কাপড় ভিজে গেলে সার্মার্তিন কোন দিকে সামলায় ?

সাত আট বছরের অতীতের কথা, আর বই এর দোকানের সেই বুড়ার কথা, একই হয়ে থাকে মনের মধ্যে যদিবা তার উপরে আরও অনেক অনেক কথা তেমন জমা হতে থাকে। যেমন পওরের নিকা, তার আদর সোহাগ, যেমন কারো সন্তান হওয়া, যেমন গোপাল রাজবংশীর কথা। কোন বা এক কথা, সার্মার্তিন ভাবলো, মনের উপরে ‘বাদামী কিছিম’ দাগ রেখে যায়। অনুভূতি কমে কমে আসে, কিন্তু দাগটা বেশ চওড়া হয়ে থেকেই যায়।

ভাবো। কি ? না—খুব জ্বর, আর সাতদিন খায় নাই পওরের দ্বারিঘরে বসছে আসিয়া। কতদিন আর ? চার পাঁচ বছর আগে হবে। ‘তোর তো জ্বর। খাস নাই তুই। আর চলতে পারিস না মনে হচ্ছে। তুই বলালি গোপাল রাজবংশী নাম। আমরা মোম্মদী। আমাদের হাতে জল, ভাত খাবু তো ?’ সেই থেকে সেই গোপাল থেকে গিয়েছিলো। জ্বর সেরেছিলো, স্বাস্থ্য ফিরেছিলো। দেখা গিয়েছিলো তখন, সে একুশ বাইশের এক যুবক। ‘কোথাও না যেতে চাস যদি, এখানে থাকবি যদি, ধানের কাজ কর। জানিস ?’ গোপাল বলেছিলো, সে জানে সব কাজ। কিন্তু অন্য চাকরদের কাছে সে বয়স্ক বোকা অকর্মা চাষীদের একজন ব’লে ধরা পড়তো। সার্মার্তিনর মনে হতো, আসলে এসব কাজ সে কোনদিন করে নি। সে রাজবংশী ভাষায় কথা বলতো, অন্য চাকররা ভাবতো বোকাটা কথা বলতেও শেখেনি। সার্মার্তিন ধরে ফেলতো, শব্দ, উচ্চারণ, ঘরোয়া শব্দ বাছাই-এ মনে হয় রাজবংশী ভাষাটাকে সে শিখতে চেষ্টা করছে। আসলে ওর ভাষাটা বাংলা।

সন্দেহটা বেড়ে গিয়েছিলো সার্মার্তিনর। তার মেয়ে তখন বছর খানেকের। কাজের বেলায় কাজ এগোয় না ব’লে, সার্মার্তিন তাকে মাঝে মাঝে মেয়ে ধরার কাজ

দিতো। আর সে কাজ হাতে নেয়াতে, মাঝে মাঝেই তাকে সামতিনির কাছাকাছি থাকতে দেখা যেতো। একবার পরীক্ষা করার জন্য তাকে বেশ কয়েকটা টাকা দিয়ে সে বলেছিলো, 'যা ফালাকাটার বাজার থাকি তোর পায়জামা আর পিরহান কিনি আন।' সামতিনি ভেবেছিলো, সে ফিরবে না। কিন্তু ঠিক ফিরে এসেছিলো।

কিন্তু ধরা পড়েই গেলো। সামতিনির মেয়েটা তখন বছর দেড়েক। খুব কঠিন অসুখ করেছিলো। পওর তখন সবহাপতি হওয়ার ব্যাপার নিয়ে খুব ব্যস্ত। বলেছিল সামতিনিকে, 'গোপালক ধরি জলপাইগুড়ি না হয় চলি যা।' জলপাইগুড়ি শহরে পৌঁছে হাসপাতালের ডাক্তারের সামনে সে যেন অন্য গোপাল। তারা ইংরেজিতে হ্যাটরম্যাটর বলে, আর গোপাল মেয়ে কোলে শোনে চুপ ক'রে। তারা কাগজ লিখে দিলো। তখন গোপাল ওষুধ কিনতে বেরুলো। এক ওষুধের দোকান ওষুধ দিলো। গোপাল ডাক্তারের লেখা কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে নিতে একটা ওষুধ ফেরৎ দিয়ে বললো, 'এটা নয়। ভালো করি পড়ে দেন।' তখন ওষুধের সেই শিশিটা বদলে দিলো দোকানদার। বাড়িতে ফিরে আরও ধরা পড়লো গোপাল। মেয়েটার অসুখে তার মুখেও হাসি ছিলো না। সামতিনি বললো, 'একটা ভুল হইল, গোপাল, ডাক্তার কইল না বেমারিটা কি ?' গোপাল বলেছিলো, 'কাগজে লিখি দিছে, মুখত না আলাপ করছে, শোনেন নাই।' 'সে তো ইংরেজিতে।' গোপাল কি বলতে গিয়ে থেমে গেলো। সামতিনি বললো, 'তার চায়্যা মুস্কিল করছি, দেখং, কোন ওষুধ কখন বা খোয়াই, কতক্ষণ থামি থামি।' গোপাল দুর্ভাবনায় ম্লান। সে সব ভুলে গিয়ে, সামতিনির দুর্ভাবনার মধ্যেও তাকে অবাক ক'রে দিয়ে, ডাক্তারের লেখা সেই কাগজ দেখে কোন ওষুধটা কখন খাওয়াতে হবে বলতে বলতে থমকে গিয়েছিলো। তখন বিচার করার সময় নয়। মেয়ের অসুখে ব্যস্ত সামতিনি বলে-ছিলো, 'সবহাপতির থাকি ঘড়িটা চায়্যা নেং, তুই পারবু তো ঘড়ি দেখি দাওয়াই খোয়াইতে।'

সেই একদিনেই খুব সাবধান হয়ে গিয়েছিলো সেই গোপাল। কিন্তু এখন সামতিনি ভাবে, ওষুধগুলোর বিষয়ে ব'লে যাওয়ার পরেই পালানো সঙ্গত ছিলো তার। এরকম সময়েই বা কিছু পরে একদিন পওর উঠোনে ব'সে পুরুষদের ডেকে নিয়ে গল্প করছিলো, দুপগুরি অঞ্চলে নাকি ভদ্রলোকের ছেলেরা চাষীদের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে। সদরের পুলিশ সাহেব বলেছে, তারা খুব গোলমাল পাকাতে চায়। কিন্তু গোপাল তখনও পালায়নি। মাঝরাতে মেয়েটাকে ওষুধ খাইয়েও চুপ করে দাঁড়িয়েছিলো। সামতিনি বলেছিলো, 'আবার তো ছয় ঘণ্টা পরে, সকালে আসি যাইস। আমার কন্যাটাক সুস্থ করা নাগে তো।' এইজন্যই কি গোপাল আরও তিন চার মাস থেকে গিয়েছিলো চাকরদের মধ্যে। সে কি সেই মাঝরাতে সামতিনির চোখে চোখ আটকে বুঝতে পেরেছিলো, তার ইংরেজি শুনে মাথা নাড়ার কথা, প্রেসক্রিপশন পড়ে কিছু কিছু বুঝতে পারার কথা, সামতিনি তার মেয়ে সুস্থ

না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশ করবে না ? না, কোন কিছুরই প্রমাণ নেই। সে একজন বাড়ি থেকে পালানো রাজবংশী ছেলে কি না, কিংবা যাদের কথা তখন জোদ্দাররা ভয়ে ভয়ে বলাবলি করছিলো, যেমন পওরও, তাদেরই একজন কি না, তা বলা যাবে না। সিক্স সেভেন পড়া সার্মাতিনিও পরে বুঝেছিল কোন সময়ে কোন ওষুধ। সিক্স সেভেন এখন সকলেই পড়ে। মেয়েটা সুস্থ হওয়ার পরে, সে আর মাস দুই থেকে গিয়েছিলো, সব সমেত সাত-আট মাসই হবে। না থাকলেই ভালো ছিলো। সার্মাতিনির নৌকর হয়েছিল যেন।

কিন্তু কি হলো ? মেয়ে সম্পূর্ণ সারার আগেই একদিন পওর তাকে বলেছিলো, 'তোর নৌকরের প্রেমত পড়ি গেইছিস, দেখং।'

মেয়েটা প্রায় সুস্থ তখন। সার্মাতিনি বলেছিলো, 'তোমরা থাকেন ঘরজুড়ি, আর উমরা দ্বারিঘরে থাকি প্রেম করছে ?'

তখন তো পওরের বেহারের নিকার কথাবার্তা পাকা। পওর বলেছিলো, 'অকম্মা চাকরটাক ছাড়ি দে। উয়াক নাকি বিশ টাকা করি দিস ?'

'দিয়ার কথা আছে, নেয় নাই এলাও।'

'উয়াক তো দুই মাহিনা পর পর পাজামা পিরহান কিনি দিছিস।'

'দিং তো। সবহাপতির বেটি ধরিয়া, সবহাপতির বিবির সাথে যে চাকর যাইবে, তায় কি নেংটি পিঁধবে ?'

সে, হয়তো নিজের মেয়ের জন্যই গোপালকে অন্য চাকরদের থেকে আলাদা দেখতো। হয়তো চাকরদের সঙ্গে তেমন কাজকর্মের ব্যাপারে খাপ খায় না ব'লে, গোপাল বরং তার ব্যক্তিগত চাকরের মতো হয়ে উঠেছিলো। হয়তো সে কিছু লেখা-পড়া জানে, এরকম বুঝতে পারার পর, একটু সমীহ ক'রে কথা বলতো সার্মাতিনি। এটা খুবই সম্ভব, পুরুষদের চোখ থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়েদের মুখের দিকে, শরীরের দিকে প্রশংসার মতো কিছু এগিয়ে আসে। তা বোকা হলেও হয়, চাকর হলেও হতে পারে। তাকে কি ভালোবাসা বলবে ? এ কি কখনও সম্ভব, তার নিজের চালচলনে, কথাবার্তায়, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, এমন কোন ভাব কারো চোখে পড়েছে, যাতে ঠাট্টা করতে গিয়ে পওরের প্রেমের কথা মনে হয় ? এ কি কখনও সম্ভব, তখন পওরের তিসরা নিকার কথা, তার লালচিয়া-সাদা কন্যার কথা আলোচনা হচ্ছিলো ব'লে, তার মনে গোপালকে অন্য রকম লাগতো কিছু ? তা যদি কখনও হয়ে থাকে তা কিন্তু পওরের ঠাট্টার ফল।

কিংবা তা নয়। মনের সেই বাদামী দাগটা অন্য কিছু। গোপাল পালিয়ে যেতে পারলে হয়তো এরকম হতো না। সেই শেষ ঘটনাটাই ক্রমে ক্রমে যেমন মনের দাগটা, তেমন মনের সেই দাগটাই এখন গোপালকে ভালোবাসছে একরকম।

আশ্বিন মাস হবে। কুড়ার কিনারায় কাশগুলো তখনও কাঁচ ; কুড়ার জলে সাদা আর গোলাপী শালুক। কাশগুলোকে কেটে সেখানে কুড়ার নামার ঘাট, তার

উপরে ব'সে গোপাল পুঁটি ধরছিলো। বেশ বড় পুঁটি সেবার। সামতিনির মেয়েটা তার পাশে বসে। সামতিনি কুড়ার জলে শালুক আর তার নাল তুলতে নেমে-ছিলো। ঢ্যাঁপ পাওয়া যায় কিনা খুঁজে খুঁজে দেখছিলো। একটা গোলমাল, দুড়-দাড় শব্দ, একটা অব্যক্ত চিৎকার আর কান্না শুনে, সে ঘাটের দিকে মুখ ফিরাতে, দেখেছিলো : কাশবনের মধ্যে দিয়ে কিনারা ধ'রে তিন চারটে মোষ শিং নেড়ে দৌড়াচ্ছে, গোপাল উঠে দাঁড়িয়ে খালি হাতে মোষগুলোকে রুখতে চাচ্ছে যেন, তার মেয়েটা জলে পড়ে গেলো, গোপাল অর্ধেক জলে অর্ধেক ঘাটের উপরে পড়লো, গোপাল জলে নেমে তার মেয়েটাকে খুঁজছে, গোপাল মেয়েটাকে তুলে তাকে ঝাঁকাচ্ছে। ততক্ষণে সাঁতরে, জলের বাধা ঠেলে হেঁটে, সামতিনি ঘাটের দশ হাতের মধ্যে এসে পড়েছে, সে ভয়ে চিৎকার করলো। এটাও, এটাও কেন, সেই বুনোলা ষাঁড় মোষটা যেটাকে তখন লোহার শিকল বেঁধে রাখা হয়, ক্ষেপামির জন্য ? সেই ষাঁড় মোষটা দৌড়ে যেতে যেতে, তার পায়ে গলা থেকে ঝোলা শিকল কখনও ফাঁদের মতো টান দেয়ায় সেটা পাগলের মতো প্রকাণ্ড শিং জোড়া সমেত মাথাটাকে ঝাড়ছে। গোপাল আবার পড়ে গেল। সামতিনির মেয়েটা ছিটকে তার কোল থেকে কাশ বনে পড়লো। গোপালের উপরের দিকটা জলে। সামতিনি ঘাটে উঠতে উঠতে মেয়েকে কোলে নিতে নিতে দেখলো—

এখন সামতিনির মনে হলো গোপালের রক্ত জলে টকটকে লাল শালুকের মতো ফুটে উঠে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছিলো। তা হয় না। সে তখন দেখেছিলো মেয়েটার নিঃশ্বাস চলছে না। গোপালের মাথা ফাড়ি গেইছে। তখনই বুক সমান কাশবনে হাতে ঠাঙ্গা পওরকে দেখা গিয়েছিলো। পওর বলেছিলো, 'আরে তোমরা, তোমার বেটি ধরি এটে ? মনে করছি উমরায়।' প্রথমে মোষগুলো ছুটলো কেন, পাগলা ষাঁড়টা গলায় শিকল সমেত ছুটলো কেন, পওর কেন সেখানে ? কেন পওর মনে করেছিল শুধু গোপাল সেখানে ? হেলথ সেণ্টারের ডাক্তাররা বলেছিলো, মেয়েটার পেটে জল নেই। জলে পড়ার শকে এরকম হয়। শেষ হয়ে যায়। গোপাল-চাকরের এ অবস্থায় কলকাতার সার্জনরা কিছু পারলেও পারে হয়তো, আমরা জ্ঞান ফিরাতেও পারবো না।

সামাথ বললো, 'আচ্ছা, তো, সামতিনি, কুড়ায় এখনও শালুক ফুটে ? ঢ্যাঁপ হয় ?'

চমকে উঠে সামতিনি বললো, 'সেই থাকি মুই যাও এ না কুড়াত...' বলে সব কিছু পিছনে ফেলে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো সামতিনি। সামনের দিকে চোখ, ঠোঁট দুটিও নড়ছে।

সামতিনি বিড় বিড় ক'রে বলে চললো, 'এলা না ছোট বিবি এটে, সতক্ক থাকি না। অগঘানত্ বেহার যাইবে, সেলা ফির সতক্ক...। বাপুরে অগঘানত্ নাকি মোর ঘরটারও মাঝিয়া পাক করে।'

সামাথ জিজ্ঞাসা করলো, 'কি সতক্ক ? কি অগঘানত্ ? আপন মনে কি কইস ?'

সার্মার্তিন চমকে মনের বাইরে এসে বললো, 'কি কলু ? কুড়ার কি ? আচ্ছা রে, হাতত তো ঘড়ি। রুমাল খুলি সময় দেখ না কেনে।'

সামাথ রুমাল একটু সরিয়ে ঘড়ি দেখে বললো, 'ছওটা বাজছে। সামনাত দেখ ফির ঘোর হয়্যা আসে। এটা তো ইলশাগুড়ি। সামনাত দেখ সেই আর এক ঢাবা। ফির ঝমাঝম নামি যায় ঢাবাত দাঁড়ান লাইগবে।'

সার্মার্তিন বললো, 'ইয়াক ইলশাগুড়ি কলু কেনে ?'

সামাথ জিজ্ঞাসা করলো, 'তুই কি কবু, কি কইস ইয়ার নাম ?'

সার্মার্তিন ভেবে দেখলো, ইস্কুলে পড়ার সময়ে এ রকম গুড়িবৃষ্টিকে ইলশাগুড়ি বলতে শিখেছে, কিন্তু রাজবংশী ভাষায় কি বলে, সে জানে না। সে যেন একটু ঝাঁজের সঙ্গে বললো, 'তুই-ই সব জানিস। আচ্ছা ধানক কি বলে ক।'

ধান তো ধানই হইল।'

'আরে না।'

'তবে। ধান, ধান্য, ও—বুঝহং পেডি।'

সার্মার্তিন ঝির ঝির ক'রে হাসলো। বললো, 'ধানক কয় মায়।'

'মায় ? আচ্ছা ! তো ক, এই গছক কি কবু ?'

'ফাং।'

'আচ্ছা', সামাথ হাসলো, 'কোটে বা শিখিস ! মানুষক কি কইবে ?'

'মারাপ।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' সামাথ হাসিমুখে বললো, 'এইগুলা কি তোর হোলদিয়া মানুষের শবদ্ ? আচ্ছা, আচ্ছা এটে কাঁয় আর হোলদিয়া মানুষ ? ট্রাক করি গেইতে কছিস, এটে হোলদিয়া মানুষ নিশ্চিন্ হয়্যা গেইছে। কছিস সেলা, রাভা-কোচ কাঁউ এ নাই আর। হয়তো দু চারিটা শবদ্ থাকি গেইছে। তাৎ কি হয় ?'

'হয় না তো।'

'তুই একটা বাক্যও কবার পারবু না হয়তোক।'

সার্মার্তিন ভাবলো। সে যেন মনের মধ্যে হাতড়ালো। এসব সম্বন্ধে যা সে শুনেছে, যা সে ভেবেছে, তার মধ্যে সামাথের কথারই সমর্থন পেলো সে। কিন্তু বাক্যও সে দু একটা জানে তা প্রমাণ করতেই যেন মিট মিট ক'রে হেসে বললো, 'আং নাইঙো পেনেম সানাং।'

বলে সে থমকে গেলো। চোরা চোখে সামাথকে দেখলো।

সামাথ হাসিমুখে বললো, 'আচ্ছা, তো ইয়ার মানে কবার পারিস ? বোধ হয় পারবু না। কোটে বা শুনি রাখছিস ?'

সার্মার্তিন একটু দ্বিধা ক'রে বললো, 'আং তো আই হইলু।'

'আই ? চোখু ?'

'নো-হয় । আই, মুই ।'

'ও হো । তার বাদে ?'

'আই—'

'হুঁ ?'

'লাভ—'

'লাভ ? কি লাভ ?'

'ইউ ।'

সামাথ অবাক হলো। মনে মনে পুরো বাক্যটা জুড়ে আবার অবাক হলো। কিন্তু তা রাভা-ভাষার পুরো বাক্যটা সার্মার্তিন বলতে পারলো বলে কি না, তা বুঝতে পারলো না। সে হেসে ফেললো। সার্মার্তিন হাসলো। একটু লালচিয়া হলো তার হলুদিয়া সাদা জলে ভেজা মুখ। সে বললো, 'চল্ চল্ ।'

সামাথ বললো, 'নে ।'

'কি ?'

'দেখ, ভাবছং সামনার ঢাবায় দাঁড়াই, চা খায়্যা নেং। এলা দেখ পার হয়্যা যাই ।'

'বাড়ি যায়্যা খাইস। ওটে কেমন করি যাং ভিজা গাত্ ।'

'ওহো। ধান রোপা কালে ভিজিস কি নাই-ভিজিস। না-হয় দোকান ছাড়ি থাকি যাইতি, গেলাসত চা আনি দিনু হয় ।'

'ধান রোপা হয় ক্ষেতত। এটা সড়ক ।' দ্রুত চলতে চলতে বললো সার্মার্তিন।

কথাটা মিথ্যা নয়। মেয়েরা ধানক্ষেতে ভিজা শাড়িতে বেপরোয়া হতে পারে। এখানে তা হয় না।

কিন্তু সামাথ বিষয়টাতে মন রাখতে পারলো না। সে বললো, 'আচ্ছা রে, সার্মাত্তিন, তুই রাতি থাকি ধোঁকাত ফেলি দিছিস। ফির ট্রাকত গেইতে কলু, হাইসুগ, চিকাবায়রাই ইগলা কি ? ক তুই হাইসুগ কি ? মানষের কি হাইসুগ থাকবেই ?'

'থাকে তো। আছে তো। কেমন করি তোক বোঝাং হাইসুগ। যিটা আমরা মার থাকি পাং। সব রাভা-কোচের থাকি যাইবে। মার থাকি, মার থাকি, মার থাকি এমন চলবে। যেমন, শুনি থাকবি, হিন্দুর গোত্র থাকি যায় ।'

'তোর আছে ।'

'আছে তো। দালো ?'

'দালো ? তোর হাইসুগ দালো ?'

'হয়তো। মোর মা, তার মা, তার মা, তার মা দালো থাকি গেইছে। মুই কেনে দালো না হং ।'

'হবার পারে। তুই খাঁটি হোলদিয়া মানুষ। তোর পিত্যাও শুনছি হোলদিয়া,

মাও হোঁলদিয়া। মোর বোধায় নাই থাকে।'

'আছে তো। তুই না কান্ত্রাং—'

'কান্ত্রাং? যা, যা। মুই না মোম্মদী? আর এমন হবার পারে, সার্মাত্তিনি, তুই জানিস না মুইও না; হয়তোক শাতালু মিঞাই মোর পিত্যা। কেমন করি কাঁয় জানবে?'

'তাও', সার্মাতিনি সামাথের হোঁলদিয়া মুখের দিকে স্পষ্ট ক'রে তাকিয়ে বললো, 'তুই বুকের তলে তলে কান্ত্রাং থাকি গেইছিস। তোর মা কান্ত্রাং ছিল।'

'যা, যা। মোল্লা আসিয়া না আমাক—।' সামাথ তার ছুন্নতের পীড়াদায়ক লজ্জাটার কথা বলতে পারলো না।

সার্মাতিনি শান্ত সহানুভূতির গলায় মুখ নামিয়ে বললো, 'জানং।'

সামাথ সত্যি ধোঁকায় পড়ে গেলো। তার বুঝতে ইচ্ছা হলো, শাতালুর ছেলে ব'লে নিজের পরিচয় দিতে থাকলেও, সরকারি চাকরি করতে পিতার পরিচয় দিতেই হয়, এবং সে পাছুয়ার জাত হলেও হয়তো শাতালুই তার পিতা, তা হলেও, যেমন কিছু হলুদ রং তার, তেমন বুকের তলে তলে, যেমন সার্মাত্তিনি বলছে, সে কি কান্ত্রাং থেকে গিয়েছে তার মার জন্য?

কিছুক্ষণ পরে সে আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'ত্রাকত গেইতে কছিস, চিকাবায়রাই থাকি যায়। মোর কি তাও থাকি গেইছে? কেমন করি জানলু তুই? যা, যা, এটা না-হয়।'

সার্মাতিনির মুখ থেকে আলোটা যেন স'রে গেলো। সে চোখ তুলে দেখলো, গাছের সারির মধ্যে দিয়ে যতদূর চোখে পড়ে, তা থেকে যেন দিনটা পিছিয়ে যাচ্ছে। এমন হতে পারে ওই আলো-কমা জায়গাটার ওপারে হয়তো তেমন গাঢ় অন্ধকার, যখন মনে হয় মেঘটা মাটিতে নেমে পড়েছে। এদিকের এই ইলশাগুঁড়ি থেকে আধমাইল যেতে না-যেতে হয়তো বড় বড় ফোঁটার তেরচা বৃষ্টি নামবে। চিকাবায়রাই কথাটাই বিষণ্ণ। মৃত্যু—চিকাবায়রাই। সার্মাতিনি পথের দিকে চোখ নামালো।

সার্মাতিনি কয়েক বছর আগেও জানতো না। সে জানতো মৃত্যু হয়। সে শুনেছিলো আত্মা থাকে। আন্দাজ করেছিলো সেই আত্মাই জন্মের সময়ে মায়ের জঠরে আসে, মৃত্যুতে তা আবার মিলিয়ে যায়। কিন্তু সে জানতো না, রাভাদের বেলায় সেই আত্মা কোন নদী, পাহাড়, হ্রদ, পর্বত, ঝর্ণা কিংবা কোন বিশেষ গাছকে অবলম্বন ক'রে মায়ের জঠরে আসে, আর সেই বিশেষ বস্তু বা শক্তিকে ধ'রেই আবার মৃত্যুর পরে মিলিয়ে যায়। সেই বস্তু বা শক্তিই চিকাবায়রাই। মৃত্যুর সময়ে সেই চিকাবায়রাই-এর নাম ব'লে মরণোন্মুখের মুখে জল না দিলে তার মুক্তি নেই। আর এ বিষয়টা এতো গোপনীয়, যে কোচ-রাভা মেয়েরা নিজের মৃত্যুর সম্ভাবনায় শুধু কন্যাদের কানে কানে ব'লে যায় সন্তানদের কি চিকাবায়রাই। অন্য কোন

পুরুষ মানুষকে দূরের কথা, নিজের স্বামী পুত্রকেও এই গোপন নাম বলে না।

সামাথের মা মৃত্যুর সময়ে অন্য উপায় না-দেখে সার্মাতিনির মাকে নিজের পুত্রদের চিকাবায়রাই বলে গিয়েছিলো—সামাথ আর তার সেই ময়নাগুড়ির দর্জি, বড় ভাই-এর চিকাবায়রাই। আর বছরখানেক আগে সার্মাতিনির নিজের মায়ের কঠিন অসুখ হলে, যে কর্তব্যের ভার সে সামাথের মায়ের কাছ থেকে নিয়েছিলো, তা পালন করতে, সার্মাতিনিকে ডেকে সামাথদের চিকাবায়রাই বলে গিয়েছিলো। 'শুনি রাখ। মুই যেদু নাই থাকং। তুই না সামাথের মার কন্যামতো।'

পাশ থেকে চোখ তুলে সামাথের মুখ দেখে, তার চিকাবায়রাই সম্বন্ধে যা ন্যস্ত ধনের মতো মনে রাখছে, তা ভেবে সার্মাতিনি অবাক ও বিষণ্ণ হ'য়ে গেল।

সামাথ বললো, 'আছে মোর চিকাবায়রাই ? বাপুরে ভয় ধরায়্যা দিছিস। কার জানবে আমার সেইটা ? তুই কছিস মা জানে। তো, মোর মা বা কোটে ? তুই জানিস ? কেমন করি বা জানবু ?'

'জানং।'

সামাথ ভাবতে ভাবতে জোর ক'রে হাসলো। বললো, 'জানলে বা কি হয় ? হয়তোক সেই পাহাড়ে বরফের ঝড়ে খাড়া থাকিতে থাকিতে দুম্ করি একনা গুলি আসি যাইবে। সেই না মৃত্যু। সেলা কোটে বা তুই ? কেমন করি বা কানত চিকাবায়রাই কবু ? ট্রাকত না কলু মৃত্যুর সময় কানত কয়।' সামাথ ভাবলো, এই ভাবে নিশ্চিন্ হয়। আর সার্মাত্তিনির ভালোমন্দ যদি কিছু হয়্যা যায়, তবে কারো হাইসুগ, চিকাবায়রাই কিছুই থাকে না। নিশ্চিন্ হয়। সে মুখ তুলে সার্মাতিনির মুখ দেখতে গেলো। দেখলো সে মুখটায় শান্ত বিষণ্ণতা।

কিন্তু চড়বড় পট পট শব্দ ক'রে, ঝাঁ ঝাঁ শব্দ ক'রে, দূর থেকে দেখা সে কালো মেঘটা দৌড়ে এলো যেন। গাছপালায় ঝাঁকি লাগলো। সার্মাতিনি আগে, সামাথ পরমুহূর্তেই সে ধাক্কায়, যেন ঢেউ-এর ঝাপটা থেকে নাক মুখ বাঁচাতে, এক ধাপ পিছিয়ে গেলো। তারপর হাত দিয়ে চোখের থেকে চুল সরিয়ে সার্মাতিনি হেসে ফেললো।

সামাথ বললো, 'বাপুরে, থামি যাইবি ? বাপুরে সাড়ে ছওটা বেলাক্ পাঁচটা করি দিল্।'

পায়ে পায়ে লেগে সার্মাতিনির ভিজে শাড়িতে পত্‌পত্ শব্দ হলো। সে বাধ্য হয়ে ছোট ছোট ধাপে পা ফেলে এগোলো—'আর আধা মাইল, এক মাইল তো।'

সামাথ বাঁকুয়া ধরা হাত মাথার উপরে তোলে যেন জল আটকানোর জন্য, কিন্তু নাচের ভঙ্গি হয়ে যায় সেটা, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললো, 'চল্ চল্, ভালই হইছে রে। তোর শাতালু বাড়িত হয়তোক এলা বেলা পাঁচটার কম হয়্যা যাইবে।'

তারা তখন পাকা সড়ক থেকে শাতালু বাড়ি-পাড়ার কাঁচা সড়কে উঠেছে।

কাঁচা সড়ক, সার্মতিনি আঙুল টিপে টিপে ছোট ছোট ধাপ ফেলছে। সামাথ কাদা বাঁচাতে লম্বা লম্বা পা ফেলছে বলে কাঁধের বাঁক নেচে নেচে উঠছে, সে থামছে, দু এক পা পিছিয়ে সার্মতিনির পায়ে পা মিলিয়ে নিচ্ছে। আবার চলছে। ঝমঝমিটা থামছে।

'হুঁঃ। আবার আইসে। তো, অন্ধকারই তো ভাল্।'

'কেনে?'

'এমন ভিজি গেইছিস, গাওৎ কাপড়া মালুম হয় না।'

'যাঃ!'

'তো। আচ্ছা দেখ, অন্ধকারই তো ভাল্, মেঘ ঝাঁপি থাকা ভাল্!'

'কেনে?'

'দেখ, এলা কুড়ার ধারৎ এমনই অন্ধকার হওয়ার পারে। মাছ ধরে, মাছ ধরে। বেলা টের না পায়। আর এলা, তোর, মাগুর কইস, কালিবাউস কইস, শউল কইস, সবএ ডিমভরা।'

'রাত দুইটা থাকি এলাও মাছ ধরির থাকে?'

'থাকে তো। আর, যারা বাড়িত থাকি গেইছে, তারাও এলা ঘর থাকি না বিরায়। ভাবি দেখ, মাঝরাতে উঠি সোরগোল করি ঘুমাইলে কাঁউ উঠে? আর যেদু কাঁউ রয়া, আইঅর আনিয়া বা থাকে তোর ক্ষেতের ধারৎ, কাঁয় বা এই মেঘনাৎ ক্ষেতৎ নামবে?'

বৃষ্টিটা, যেমন হয়, ঝমঝমি ভাবটা ছেড়ে ঝরঝর ক'রে পড়ছে। ফলে জলপাই গাছটা আর জলে জল প'ড়ে সাদা সাদা হতে থাকা, জল দাঁড়ানো, কাদা ক'রে রাখা সেই সত্রবিঘা জমির একটা পাশ চোখে পড়ছে। লোকজন মুনিষ চাকর কেউই ধারে কাছে নেই সেই মেঘলা-আলোয়।

সামাথ বললো, 'একদম ক্ষেতে চলি যাবু তো? দেখ, ভাল্, কি না। হয়তোক, বাড়ির ভিতরৎ বুড়িরা উঠছে, হয়তোক এলা পওর ফিরছে কুড়া থাকি, হয়তোক ছোটবিবির ঘরৎ বসি তামাক ধরাছে। এটে কিন্তু কাঁউ নাই। মজা হইল না?'

'কি মজা?'

'কেনে! কাঁউ জানবে কোটে থাকি বা নৌতুন ধানের রোয়ার বোঝা ক্ষেতের ধারৎ। তুই যে আনছিস কাঁউ ধরির পারে? বুঝবে কি নৌতুন ধান?'

তারা জলপাইতলা পার হয়ে সেই জলভরা জমিটার দিকে এগোলো।

সামাথ বললো, 'আচ্ছা, চা খাবু, না আগত জমিত নামি যাবু?'

সার্মতিনি মৃদু হেসে বললো, 'আচ্ছা। মুই যদি ক্ষেতৎ নামি যাই, তুই পারবু না আমার ঘর থাকি চা করি আনতে? ওটে স্টোভ, কেটলি, গিলাস, চা সব আছে।'

'আর তুই ব্লউস পরি ক্ষেতৎ নামি যাবি?'

'কি হইবে তাৎ।'

'ধান হইবে ?'

'কেনে ?'

'ক্ষেতের জলৎ ছায়া না পড়লে ধান হয় ?'

'ছায়া ?'

সামর্তিনির মনে পড়লো আজিরা রোয়া-রোপার সময়ে যে সব গল্প করে, তার মধ্যে একটা এই যে, কোচ, রাভা, রাজবংশী যাই বলো, রোয়ার ক্ষেতের জমিতে মেয়েদের বুকের ছায়া না পড়লে ধান ফলে না। কি করে ধান প্রাণ পাবে সে রকম না হলে ?

গল্পটা মনে পড়ায় সামর্তিনি মৃদুস্বরে বললো, 'যাঃ !'

শ্রাবণের মেঘও খেলা করছিলো। ঝমঝমি ঝরি থেকে জলপাইতলার কাছকাছি এসে তা ঝির-ঝির করছিলো, ক্ষেতটার কাছে এসে প্রায় আবার সেই ইলিশাগুঁড়ি। ফলে যে বেলা ছও সাড়ে-ছও থেকে পাঁচটা বা তার চাইতেও পিছিয়ে যাচ্ছিলো তা যেন একলাফে ছয়ের দিকে এগোচ্ছে। যদিও তত তাড়াতাড়ি জন-মানুষ তার সঙ্গে তাল রাখতে পারবে না। হতে পারে, এতক্ষণ সামাথের শরীর কিছু শ্রান্ত হয়েছে, যদিবা নানা রকমে ঝড়ে-পড়া জল তাকে অবসন্ন হতে দেয় নি। ভিজে পথ পিছল হয়, আর বর্ষণধারা শ্রান্তিতে অবসন্ন হতে দেয় না বটে, কিন্তু বাধা ঠেলে ঠেলে চলার অনুভব থাকে।

সামাথের মন কিছুটা বিষণ্ণ হয়ে পড়লো। মরণ, চিকাবায়রাই। শব্দ দুটো যেন সেখানে উচ্চারিত না হয়েও থেকে যাচ্ছে। সে বিশেষ কোন মৃত্যুর কথা ভাবলো না। কিন্তু তার সেই সীমান্ত-পর্বতের চাকরিতে মরণ তো সব সময় থেকে যায়, এরকম অনুভূতি হলো তার। সত্যি কি এরকম হয় ? সাতদিনের মধ্যেই সে চলে যাবে, আর সে রকম যদি ঘটে, তার কি চিকাবায়রাই-এর প্রয়োজন অনুভব হবে ? সে রকম সময়ে এই নৌতুন ধান উঠতেও পারে। হলো কি না তা জানবার সুযোগ থাকে না। সামাথ ভাবতে চেষ্টা করলো—আসলে কিছু না। সে হয়তো আসলে মোম্মদীই হ'য়ে গেছে।

এ সব কারণেই, সে, জলভরা, সমানভাবে কাদা তৈরি করা ক্ষেতটার দিকে চেয়ে থাকলেও, দেখতে পাচ্ছিলো না, মেঘের পিছন থেকে আলো প'ড়ে, সেই ক্ষেতটাকে কিছুক্ষণ আগে যেমন ভিজে শাড়ির মতো সাদা দেখাচ্ছিলো, এখন বরং তার তুলনায় হলুদই দেখাচ্ছে। কোচানি কানাইঙি গাবঅ হাইলদি।

সে ফিরে দেখলো, বোধ হয় আলোটা হঠাৎ তেমন উঠে পড়ায় জলপাইতলা আর ক্ষেতটার মাঝামাঝি জায়গায় সামর্তিনি মাথা থেকে রোয়ার ধামা মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক, মেঘলা ভোরে সড়ক দিয়ে রোয়ার ধামা মাথায় ক'রে চলা যায়। সেখানে সেভাবে চললে, তখন তো নির্জনই পথ, কেউ

চিনবে না। কিন্তু বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে, মুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেই হোলদিয়া রঙে জনমানুষ চাকর-নোকর ধরতে পারবে, পওর শেক-সবহাপতির সুন্দরী দুসরা বিবি না হয়ে যায় না। সেই দ্বিতীয় বিবি কাউকে, সে যেই হ'ক, হুকুম দিয়ে অনায়াসে কাজ করিয়ে নিতে পারে। ধানের রোয়া গাড়ার সময়, অন্য অনেকে মাছ ধরতে ধানক্ষেত থেকে মন অন্য দিকে নিলেও, তখন যদি সেই বিবি দাঁড়িয়ে থেকে যে কাউকে দিয়ে তৈরি করা জমিতে রোয়ার বোঝা নেয়ায়, তবে তা ঠিকই হয়।

সামাথ ক্ষেতের পাশে তার বাঁকের দুই বোঝা বেছন নামালো। ফিরে গিয়ে সামর্তিনির ধামা থেকে রোয়ার আঁটিগুলোকে নিয়ে এসে বাঁকের রোয়ার বোঝা দুটোর পাশে সাজিয়ে রাখতে শুরু করলো।

তখন এক পায়ে দু পায়ে সামর্তিনি সেখানে এসে দাঁড়ালো।

'ইয়াৎ কি সত্রবিঘা হয় ?' সামাথ জিজ্ঞাসা করলো হেসে।

'হয় না তো।'

সামাথ একটু ভেবে বললো, 'আচ্ছা একটা মোক বুঝা। আচ্ছা, তো, নৌতন ধানের রোয়া আনা ঠিক যেদু করছিস, গাড়ি আর নৌকর পাঠালে না তোর সত্রবিঘার রোয়া একেবারে আসি যায়। ফির দেখ, বীজতলায় গাড়ি ডাকিবার দিলু না। ভয় ধরছে বুঝি, গাড়ি ডাকিতে দেরি হইবে, আর সেই কালে ইমরা ক্ষেতে আইঅর রত্না গাড়ি দেয়। নাকি ভাবছিস, কম করি নেং রোয়া, যদি উমরা একদিক থাকি আইঅর কি রত্না গাড়ির ধরে তো, অন্য দিক থাকি তুই তোর তুলাইপাঞ্জা বসাবু বুঝলং তুই নৌতন ধানের কথা কাউক বলির চাস না।'

'মনত ছিলো না রে।' সামর্তিনি সরলতা ভাণ করে।

'কি মনত নাই থাকে ? বাপুরে—' সামাথ হেসে বললো, 'সড়ক থাকি নামি, তুই যে গ্রামত গেইছিস, মুই না চিনবু তোর রোয়া বেচা গয়নাথ, মুইও না দেখৎ কোনকালে। তুই ঠিক চিনি গেইছিস উমরার গ্রামত, উমরার বাড়ি, বীজতলা একেবারে খুঁজি পাছিস। আর মনত নাই থাকে ? আর যেদু ক'স নৌতন ধান দেখায়া সবাক তাক্ লাগাবার চাইস্ তায় বা কেমন ? হৌলুদ নৌতন ধান দেখি কি পওর নাই চিনে ?'

'আরে।' সামর্তিনি বললো, 'তো, বেহার শহরৎ হাউয়া জাহাজ নামে উঠে, তুই শুনিস বোধায়, মুই জানবার জানলে কি চড়া হইল্। কোন কিছু জানলে কি তা মনৎ থাকা হইলো। তুই কালি সন্ধাৎ খালি ক্ষেত দেখায়ে কথা কলু,; তাতে না মনৎ আসি যায়! এলা কি করবু? বেলা হইলে নৌকর লাগাইবে, না হয় পাছে দেখা যাইবে, আজিরাও আসির পারে। রোয়া গাড়বে। চা খাবু তো। আর পওর ধান চিনি বা কি করে।' সামর্তিনি হেসে হেসে বললো, 'তুই জানিস না। এ জমি না মোরএ। রাভা জমি, দালো জমি। তো, তোর সবহাপতি কইছে,

মোরএ নাকি দেনমোহর। যদিও না-লেখে কাগজৎ।'

সামাথ বললো, 'ওঃ হোঃ আচ্ছা।' সে হাসলো। বললো, 'কাঁউএ কিন্তুক এলাও, দেখ, ঘর থাকি না-বিরায়। এলাও কুড়াত থাকি গেইছে হয়তোক। মাছ, মাছ। এলাও হয়তো ওটে মেঘ থাকি আন্ধার হয়্যা আছে। তো, আজ রাতিও কি মাছ না আইসে? পওর কুড়াত যাইবে না আজ রাতিও?'

সামতিনির জলে ধোয়া চক্‌চক্ হোলদিয়া-সাদা গাল একেবারে লাল হয়ে উঠলো। শোনা যায় কি না-যায় এমন স্বরে সে বললো, 'যাঃ, সিপাহী কোথাকার।'

কয়েক পা দূরে গিয়ে, সেখান থেকে সে গলা তুলে বললো, 'সামাথ, পিরহান ছাড়ি নে। আমার ঘরৎ চলি আসিস চা খাবু তো। সেইটে এলাও রাতি থাকি যায় বা। ঝরি নামে, দেখ।'

ভিজা গায়ে সুখে শীতে শিউরে সামতিন হাসলো।

অন্বেষণ

শ্রীবিভা সেন, কিংবা মিসেস বিভা সেন, এমন কি এম এস বিভা সেন যত যাই বলো, তা কিন্তু লেডি বিভা সেন অথবা ডেম বিভাবতী, সে রকম শোনায় না। ওসব ইংল্যাণ্ডে চলে। এদিকে আবার পদ্মভূষণ ইত্যাদি, যদি কোন নর্তকী, আজকাল ডাঁসেউজ বলছে, অনেক ভিড় সত্ত্বেও পেয়েও যায়, নামের সঙ্গে নাকি যোগ করা যায় না। আর সেই গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ইতিহাসে কে অমর থাকবেন, তাও বলা যাচ্ছে না। এরকম বিভা সেনকে—

চিফ সেক্রেটারি সেন নিজের অফিস কামরায় সেই পরিচিত সুদৃশ্য সুইভেল্ চেয়ার থেকে মাঝ-অক্টোবরের বেলা তিনটেতে কার্পেটে পড়ে গেলে, সাড়ে তিনটের আগেই অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চে নীত হয়েছিলেন। রাত এগারোটায় চাদরে মুখ ঢেকে দেওয়া হয়েছিলো। সেই চিফ, যিনি মার্চে রিটায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণরত্বে, বিশ্বব্যাঙ্কে, অথবা ইউএনোতে, নিদেন স্পেশ্যাল আড্-ভাইসরিতে নিযুক্তই প্রায়, শুধু প্রাইম একবার সবদিকটা দেখে নেবেন। আর সেই মিসেস চিফ সেক্রেটারি যিনি শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত শোস্যালিটেদের মধ্যেও তাঁর সাদা শিফনে, আকাঁধ ঝোলা ফেঁপে থাকা চুলে বিশিষ্ট হ'য়ে, রুক্ষই দেখাচ্ছিলো, গ্লস্-ছাড়া হাল্কা মরা-লাল ঠোঁটে সংহত-শোক হেন ঘুরছিলেন। চিরকালইতো রাদার টাফ ফর অ্যান ইণ্ডিয়ান গার্ল। আর ছেলেরা মাথা কামাতে বসলে, পরিচিত বিউটি-পার্লারের মিস্ রোবিই বাংলোয় এসে তাঁর শোবার ঘরের নিভৃতে তার লম্বা চুল-গুলোকে সেভাবে ছেঁটে, শ্যাম্পু ক'রে, ড্রেস ক'রে দিয়ে গিয়েছিলো, নখ থেকে সব রংকে ফাইল ক'রে তুলে দিয়েছিলো। তখন সদ্য বৈধব্যে পার্লারে যাওয়া যায় না। সেই বিভাবতী সেনকে—

বাঙালী তো, কাজেই মচ্ছমুখিও। আর তাতে বেছে বেছে আমিষভোজী এবং কাছাকাছি পদমর্যাদার অফিসাররা, একজন মেজর-জেনারেল সমেত ; সাউথ ইণ্ডিয়ান ইডলিওলারা এটায় আসেন না ; তারা নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে গেলে, আত্মীয় স্বজনকে সি অফ করতে নিজেই নিজের গাড়ি ড্রাইভ ক'রে স্টেশনে গিয়েছিলেন। সরকারি শোফার সরকারি গাড়ি নিয়ে ছিলো, দুখানা ট্যাক্সিও মালপত্র নিয়ে, নতুবা ঘেঁষা-

ঘোঁষ হ'তো না ? স্টেশন থেকে ফিরে এসে, তখন প্রায় অবসন্ন দিন, অজেয় আর বিজয়কে নিয়ে নিজের শোবার ঘরের মেঝেতে রাগের বিছানায় বসেছিলেন, যদিও মচ্ছমুখির পরে আসবাব ব্যবহারে দোষ নেই নাকি, তাহলেও আজও এরকম থাক, কাল থেকে বরং শোফা খাট এসব। আর সেখানে বসে সেই সেদিনের পর থেকে, তখনই প্রথম মিনিট দু-তিন খাবো খাবো-না ক'রে স্মোকিং এ এখন আর দোষ নেই বলে, সিগারেট ধরিয়েছিলেন। সেই মিসেস চিফ সেক্রেটারি, মিসেস বিভাবতী সেনকে মচ্ছমুখির পরের দিনের সকাল থেকে পাওয়া গেলো না। সেদিন নয়, তারপরেও না। যদিও তখনও যে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছিলো, যে সামিয়ানা খাটানো হয়েছিলো, বাইরে থেকে আনা টেবিল চেয়ার, কিচেনের জন্য আনা সেই জায়ান্ট সাইজ ডেকচি, টাব, কড়াই ইত্যাদি, বাঁশের খুঁটিতে টানা টেম্পোরারি ইলেকট্রিক লাইন ইত্যাদি—সবই তখনও ক্রিয়াকাণ্ডকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে থেকে নেই, একেবারেই নেই।

প্রথমেই অজেয়। অনেকদিন বাদে বিছানায় শুয়ে ঘুম কি গাঢ়তর হয়েছিল ? অথবা ঘুমের মধ্যে 'বাসাটাকে সাফসুতরো করার ব্যাপারটাও আছে' এমন অস্বস্তি ছিলো ? সাত, সাড়ে সাতে ঘুম ভাঙলে, বালিশের নিচে অভ্যাস মতো ঘড়ি আর চশমা হাতড়ে আনতে গিয়ে, সে সবের সঙ্গে রুপোর রিংয়ের চাবির গোছা পেয়ে অবাক। সেটা যে মার, চাবিগুলোর চেহারায়, তার মধ্যে বাড়ির গোদরেজগুলোর আর ভল্টের লকারের চাবিও,—এরকম বুঝতে বাকি থাকে না। সে চশমা পরে, ঘড়ি হাতে গলিয়ে, বাথরুম ফেরৎ সেই চাবির রিং হাতে মার ঘরে গিয়ে মাকে পেলো না। বিজয়ের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো, সে তখনও ঘুমাচ্ছে। মা হয়তো স্নানে ঢুকেছে এই ভেবে সে বেরোল। আজও সব অগোছালো, ক্লান্ত ঝি-চাকরদেরও দেখা নেই। 'কাউকে ডাকতে হয় বেড টির জন্যে', এই ভেবে এ বারান্দায় ও বারান্দায় সে স্যাণ্ডালের শব্দ ক'রে ঘুরলো।

আধঘণ্টা বাদে সে আবার মার ঘরে গেলো। আর তখনই তাদের পুরনো আয়া বেড-টির ট্রে নিয়ে সেখানে। তিন কাপ চা—তার, মার, বিজয়ের। তার কাপটা নিলো, আয়া মার খালি বিছানাটাকে দেখে নিয়ে টিপয়ে মার কাপটা রেখে বিজয়কে চা দিতে গেলো। অজেয় চা শেষ ক'রে, মার কাপ তো জুড়িয়ে জল হচ্ছে, উঠে বাথ-রুমের দরজার দিকে চাইলো, আর অবাক হ'য়ে গেলো, দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করা ছিটকিনি তুলে। অজেয় এত অবাক যে ছিটকিনি নামিয়ে দরজা খুলে বাথরুমের ভিতরটা দেখলো—না, এরকম হ'তে পারে না, মা সেখানে গেলে, বাইরে থেকে কেউ আটকে দেবে।

সে মিনিট পনেরো এদিক ওদিক ঘুরে, বারান্দাগুলোর উপরে দাঁড়িয়ে যতটা দেখা যায়, তেমন করে সামনের পিছনের লন, গ্যারাজ এসব দেখলো। ঘরে ফিরে চাবির রিংটা নিয়ে সে বিজয়ের ঘরে গেলো। বিজয় চা খেয়ে অভ্যাস মতো আবার

বিছানায়। অজেয় রিংটাকে দোলালে বেশ শব্দ করলো চাবিগুলো। বিজয়ের চোখ বন্ধ দেখে অজেয় আবার মার ঘরের দিকে গেলো। মার চায়ের কাপে সর পড়ছে। আচ্ছা লুকোচুরিতো!

সে নিজের ঘরে ফিরলো আবার। এটা তো আশ্চর্য কাণ্ডই, চাবির গোছাটা কখন কেন সে ভাবে তার বালিশের নিচে গেলো!

ঘরগুলোতে সকালে ঝাঁট দেয়া পুরনো আয়ারই কাজ। সে তেমন ক'রে অজেয়-র ঘরে গেলো. অজেয় তাকে জিজ্ঞাসা করলো, মাকে দেখেছে কি না সে। আয়া-দেখেনি। আয়া কাজ শেষ ক'রে চলে গেলে. অজেয় অবাক হ'য়ে ভাবলো, শুধু বাড়ির গোদ-রেজগুলোর নয়, যাতে মূল্যবান সব থাকে যেমন মার গহনাগুলো. ব্যাঙ্কের লকারের চাবিও সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে বিজয় এলো, কাঁধে তোয়ালে, ব্রাশের উপরে পেস্ট। সে বললো, 'আয়া জিজ্ঞাসা করলো, মা কোথায়?' অজেয় বললো, 'আমিইতো আয়াকে তাই জিজ্ঞাসা করলাম।'

অজেয়, তার মনে চাবির গোছাটা ক্রমে বড় খটকা হ'য়ে উঠছে, কাউকে কিছু না ব'লে একতলার সবগুলো ঘর খুঁজে এলো। বিজয়ও খবরের কাগজের খোঁজে আবার মার ঘরে গিয়ে, বেড-টির অস্পৃষ্ট কাপটাকে সরপড়া চা সমেত দেখে অজেয়র কাছে গেলো আবার। অজেয় বললো, 'কাউকে না ব'লে কোন কাজে গেলেন?' পুরনো আয়ার জানার ছিলো—রান্নার লোকটা জিজ্ঞাসা করছে, তিনজনের ব্রেক ফাস্ট একত্র দেয়া হবে কি না; জেনে নেওয়া হয় নি, আজ থেকে মা ডিম খাবেন কি না, সে তো একদিকে নিরামিষই।

ব্রেকফাস্টের সময়। সাড়ে আটে তারা খুঁত খুঁত করতে করতে ব্রেকফাস্ট করলো। তারা মধু আর কলার কথা ভুলে গেলো বরং ভাবলো, কতক্ষণ এই একটা দুশ্চিন্তা, পরে হাসাহাসি হওয়ার ভয়ে গোপনে রাখা যায়? মার ব্রেকফাস্ট আয়া তার ঘর থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে নিচে নেমে গেলো।

বিজয়, ব্রেকফাস্টের পরে, লনে বাগানে যারা কাজ করছে, তাদের কাছে খোঁজ নেয়ার সঙ্কোচ ত্যাগ করলো। তারা ছ' শোয়া ছ' থেকে কাজ করছে। না, ম্যাডামকে তারা কেউ লনে বা বাগানে দেখে নি।

কিন্তু বিজয় আবিষ্কার করলো গ্যারেজে বিভা সেনের নিজের গাড়িটা, সেই দুধ-সাদা মার্সেডিজটা নেই। তা হ'লে ছ'টারও আগে। আর তারপর এই আড়াই ঘণ্টা হ'য়ে গেলো!

ব্রেকফাস্টেই চাবির গোছার বিস্ময়টা দুই ভাই আলাপ করেছিলো। বিজয় বাগান থেকে ফিরলে দুজনে আলাপ ক'রে স্থির করলো, অন্যের সাহায্য নেয়ার সময় হ'য়ে যাচ্ছে যেন। নটা বাজার অর্থ তিন ঘণ্টা হ'য়ে যাওয়া। কি এমন কাজ থাকতে পারে যে সেই ভোর থেকে এখনও তা শেষ হয় না? কিন্তু সঙ্কোচও যেন। যদি পরে হাসাহাসি হয়? এখন পর্যন্ত বড়জোর আনইউজুয়্যাল বলতে পারো।

সাড়ে দশে তারা পরিচিত ডেপুটি সেক্রেটারিকে ডেকে ব্যাপারটা ব'লে, পরামর্শ চাইলো। ঠিক হ'লো পরিচিতদের বাংলোয় খোঁজ নেয়া চলতে থাক লাঞ্চ সময় পর্যন্ত। বেলা দুটোয় ডেপুটি সেক্রেটারি নিজেই খোঁজ নিলেন ঃ এখনও ফেরেন নি ? তা হ'লে ? আর একটু দেখবো ? না, পুলিসে—

এতো বোঝাই যাচ্ছে, তার পরে সেই বেলা দুটো থেকে অজেয়, বিজয়, ডেপুটি ভদ্রলোক, পরিচিত দু' চারজন করে অনেকে, অবশেষে নিউ দিল্লির থানা-গুলো, পরস্পর যোগাযোগ ক'রে জানতে থাকলো বিভাবতী সেনকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিস্ময়, কৌতূহল, কৌতুকবোধ, দুঃখ, আশঙ্কা, সাদা মার্সেডিজ অ্যাকসিডেন্ট, গাঙস্টারেরা—

নিজের বুকের কাছে রেখে মানুষ করা দুই ছেলে কি অবস্থায় কি করবে তা কি আর বোঝা যায় না ? যেন চোখে দেখা যায়। অজেয়র বালিশের তলায় চাবি যেমন, বিজয়ের বিছানার পাশের টিপয়ায় রাখা উপন্যাসটার ভাঁজে, ঠিক যেখানে পেজ মার্ক, সেখানে রাখা ছোট্ট চিঠিটা। বিজয়ের চোখে সহজে পড়বে না তা আন্দাজ করতে একজন মায়ের খুব ভাবতে হয় না। ঘুম থেকে উঠে লাঞ্চের আগে কে আর উপন্যাস পড়ে ?

কিন্তু, বিভা সেন হাসলোই যেন, সাড়ে দশে অজেয়রা ডেপুটি সেক্রেটারিকে বললে, তখন সাড়ে চার ঘণ্টা, আর ডেপুটি সেক্রেটারি বেলা দুটোয় পরিচিত লোক-জন আর পুলিস থানাকে জানাতে থাকলে, তখন আট ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। আর আট ঘণ্টাকে মার্সেডিজের গড়ে ৫০ কিমি দিয়ে গুণ করলে চারশ' কিমি হয়ে যায়। হয় না ? —সেই বাংলো থেকে ?

অন্যের যা মনে থাকে তার চাইতে বেশি মনে থাকে তার, তা নয়। একটা সুবিধা হয়েছে তার, কোন কোন জায়গায় কোন কাচে, কোন আর্শিতে, যেমন সেই ভ্যালিশ কেনার সময়ে দোকানে, যেমন হাইওয়ে থেকে প্রথম বাঁয়ে মোড় নিতে রেয়ারভিউ মিরারে, শাড়ী ঢেকে ওভারকোট পরার সময়ে রেল কামরার আয়নায়, সে নিজেকে কয়েকবার দেখেছে। ফলে নিজের সম্বন্ধে ভাবতে সুবিধা হচ্ছে— যেন অন্য কাউকে দেখছে।

যেমন একতলার কিচেনের সেই আমন্ত্রিতদের প্রয়োজনে যোগাড় করা জায়ান্ট-সাইজ সেই সব কালিমাখা টি-কেটল, কড়াই, ডেকচি ইত্যাদির উপর দিয়ে ভোর ছটার প্রথম আলোয় কুকিং রেঞ্জের ওপারের জানালার শার্সিতে দেখা নিজেকে। নিমন্ত্রিতরা ছাড়াও আট দশজন গেস্টও তো ছিলো এ কয়েকদিন বাড়িতে। সেখানে সেই কিচেনে, তখনই একবার খেয়ে নিতে, আর ফ্লাস্কটায় ভ'রে নিতেও, সে তখন খুব তাড়াতাড়ি কফি করছিলো। সেজন্য তার দোতলার কিচেনটাই যথেষ্ট বটে। আসলে সেই, ভোররাতে নিচে নেমে আসাটাই দরকার ছিলো। মাঝারি বড় একটা সুটকেশ নিয়ে নিজের ঘরে ব'সে যা খুশি তা করা যায়। রাত এগারোটাতেও সে রকম

কেউ দেখলে, ভাববে, এরকম গুছিয়ে রাখাই স্বভাব। কিন্তু ভোররাতে তেমন সুটকেস নিয়ে নামা যায় কি? যতই তা আধুনিকভাবে হাল্কা, চাকা লাগানো হ'ক। চাকারও শব্দ আছে। আর তার পক্ষে সেটাকে হাতে ঝুলিয়ে শূন্যে শূন্যে নামানোও শক্ত। শব্দ নাই বা হ'লো, বাড়ির কর্ত্রী ভোররাতে সুটকেস নিয়ে নামছে। তার ব্যাখ্যা সহজ হয় না। গ্যাসরেঞ্জের ওপারের শার্সির প্যানেল একের পর এক স্বচ্ছ হতে থাকলে, ঠোঁটের কোল থেকে কফির কাপটা নামিয়েছিলো সে, রুমালে হাত মুছেছিলো। কাপটার গায়ে লিপগ্লসের দাগ। মুছবে? দাগ দেখে বোঝা যায় কার ঠোঁট? কিন্তু তার চাইতে বড় সমস্যা সুটকেসটা।

সুতরাং কিচেনের পাশের বারান্দা ঘুরে লনে নামার তিন থাক সিঁড়ি নেমে, সুটকেসটা চাকায় দাঁড়ালে, লনটা তাড়াতাড়ি পার হ'য়ে গ্যারাজ। আলো তার চাইতে কম হ'লে সে সময়ে গাড়ির শব্দ অস্বাভাবিক ব'লেই কারো মনে থেকে যেতে পারে, তার চাইতে আলো বেশি হ'লে ঝি চাকররা বাইরে আসবে।

গ্যারাজের চাবি তো আগের বিকেল থেকেই তার কাছে। লিভারি পরা বুড়ো সেই সরকারি ড্রাইভার তখন তার গাড়ি নিয়ে শেষবারের মতো চ'লে যাচ্ছে।

যাওয়ার আগে ম্যাডামের নিজের গাড়িটাকে সে সার্বিসিং থেকে চালিয়ে এনেছিলো, যেখানে সেটাকে ম্যাডাম নিজেই কিছু আগে স্টেশন ফেরৎ রেখে এসেছিলো। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ফিরলে সে জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'কেমন লাগলো চালাতে? মার্সেডিজ চালিয়েছো আগে?' আর সরকারি ড্রাইভার বলে-ছিলো, 'ভেবেছিলাম ভারি লাগবে। না, ম্যাডাম, লাগে নি। বলছিলেন বিশ বছর হ'লো কেনা। মনে হলো কালই কেনা হয়েছে। ট্যাঙ্ক পুরো ভরতি। মোবিলও দিয়েছে।' সুটকেসটাকে গাড়ির পিছনের সিটে বসানো হ'লো। এই মার্সেডিজটা 'বেশ লম্বা গড়নের। আর সুটকেস আর গাড়ি দুই-দুই-ই দুধ সাদা হওয়াতে, সুটকেসটা তেমন চোখে পড়ে না। আর ড্রাইভার না বললেও, গাড়িটা তার চেনাই, সে জানতোই কি অবস্থায় আছে। কালই সে চালিয়ে নিয়েছিলো স্টেশনে চিফ সেক্রেটারির আত্মীয়দের সি-অফ করতে।

তখন প্রথম আলোয় বাড়িটা। বাড়ি? নতুন চিফ সেক্রেটারি আবার এসেছিলো। 'ম্যাডাম, একটা কথা আপনাকে ব'লে রাখি। আপনি যতদিন ইচ্ছা এই বাংলোয় থাকতে পারেন। এইচ এমকে বলেছি। তিনি সম্মত। এর চাইতে আর স্যাড কি?'

স্যাড্ ইতো। মার্চে রিটায়ারমেণ্ট, তারপরেই নিদেন লেফ্টেন্যাণ্ট গভর্নর। অক্টোবরে কি হয়ে গেলো।

স্পিডোমিটারে তখন হয়তো পঁচিশ-ত্রিশ-পঁচিশ। শহরের মধ্যে তাই ভালো। আধঘণ্টায় ন্যাশনাল হাইওয়েতে পৌঁছে তখন পঞ্চাশে, আর সে রকম ঘণ্টা দেড়েক চলে, দিনের আলোয় রোদের ঝাঁজ মিশবার আগেই, প্রথম যে পথ ডানদিকে, যে

কোন পথ, সেটাতেই ঢুকে পড়বে, এটা আগেই ঠিক করা ছিলো। সে বাঁক অবশ্য তেমন হওয়া চাই, যাতে ট্রাক ইত্যাদির জ্যাম না থাকায় ত্রিশ চল্লিশে ঢুকে পড়া যায়, যাতে কারো মনে থাকার পক্ষে কম সময়ে সাদা মার্সিডিজটা পার হয়ে যাবে। আর তারপরে আরও দুটো তেমন বাঁক ডাইনে, আর তারপরে আর দুটো বাঁক তেমন বাঁয়ে, যাতে দশ সাড়ে দশে সে প্রায় খুঁজে পাওয়ার অতীত।

হয়তো দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন থেকে রেডিও, টেলিভিশনের মানুষ হারানোর ঘোষণায়, খবরের কাগজেও ছবি সমেত, সংক্ষেপে বায়োডেটা সমেত, নিশ্চয় বিভা সেনের কথা বলা হয়েছে। কারণ উপন্যাসের পাতার ভাঁজে রাখা চিঠিতে 'খোঁজ কোর না' বলা থাকলেও, ছেলেরা খোঁজ না করে পারে না। আর এরকম ভেবেই সে রেডিও, টেলিভিশনের সামনে বসছে না, হোটেল-লাউঞ্জে যেখানে খবরের কাগজ, সেখানেও না। এখন রোজ থাকছে না কাগজে, হয়তো মাঝে মাঝে হয়তো এক প্রদেশের কাগজে দেয়া শেষ হ'লে, অন্য প্রদেশের কাগজে। যেমন সাত দিন আগের সেই সন্ধ্যায় ড্যালহৌসির হোটেলে, চণ্ডীগড়ে ছাপা তিনদিনের পুরনো কাগজে সে নিজের ছবির মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলো—ছবি, সংক্ষেপ বায়োডেটা।

সেজন্যই সে ড্যালহৌসি ত্যাগ ক'রে আবার পথে, এমনও নয়। সে পার্কাস্টাইল হুড্‌টা তুলে দিলো ওভারকোটের। আর তাতে তার ক্বচিৎ রুপোলি ভাব ধরা চুল-গুলো ঢাকা পড়লো। তো, শীত, এখানে তো বেশ শীতই।

পা পিছলানো, পদস্খলন, এসব বলে। ও, না, বিভাবতী সুন্দরী ভাবলো। এরকমই নাম ছিলো তখন, আর এই পাহাড়ী ঘোড়াগুলোর পা পিছল পথেও স্খলিত হয় না। সে সামনে তাকালো, পাশে, আর পিছন দিকেও দেখলো।

এখনকার ভূতপূর্ব চিফ-সেক্রেটারি পঁয়ত্রিশে তখন, কেডারে বছর বারো হয়েছে, কুচিপুড়ি ড্যান্সারকে বিয়ে করতে, ভালোবেসে বিয়ে করা স্ত্রীকে ডাইভোর্স করেছিলো। তখন সেই ম্যাজিস্ট্রেট জেলার বাইরে বিখ্যাত নয় ব'লে স্ক্যাণ্ডালটা কিছুটা চেপে গিয়েছিলো। আর সেই কুচিপুড়ি ড্যান্সারের পিতা, কালেক্টরেটের নাজির, যখন কি এক ভাঙছে, কি এক হারাচ্ছে এরকম ভেবে ভীত, উদভ্রান্ত, তখন ম্যাজিস্ট্রেটের প্রস্তাব : চার পাঁচ মাস সময় দিন বিবাহ করবো। বলতে পারো না, হঠাৎ কি ক'রে সুঘ্রাণ ছড়ানোর মতো, নিজের কাছেও অবিশ্বাস্যভাবে, দিন পনরো, তিন সপ্তাহে কারো নাচের খ্যাতি সহর থেকে সারা জেলায় তারপরে প্রদেশে, তারপরে তার বাইরে ছড়াতে থাকে। রোজকার রোজ কাগজ আসে, আর বিস্ময় বাড়তে থাকে।

তাকে এখনও, চল্লিশে, পঁয়ত্রিশই দেখাতো, দেখায়ই, বলতে পারো, এই ওভার-কোটে আর হুডে ঢাকা না থাকলে। অজেয় আর বিজয়, তার ছেলেরা বাইশে আর উনিশে। একজন এম এ ফ্যাইন্যাল আর আই এ এসের জন্য একসঙ্গে তৈরি হচ্ছে, অন্যজন এবার বি এ দেবে। তারপর ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং। কোথায় আবার?

লণ্ডনেই। সেখানকার সেই ড্যাম্প আবহাওয়া তার অসুবিধা হয় না। যে যার নিজের ভার নিক। পিতৃমাতৃহীন হ'লে পরস্পরকে আরও কাছে পায় না?

এমন কি তারা যদি কোন রকমে তাদের সেই অধ্যাপিকা সৎমায়ের দরুন সেই সৎ-ভাইটিকে আপন ক'রে নেয়, ক্ষতি কি? সেই অধ্যাপিকা সৎমায়ের সঙ্গে যাওয়া আসার মতো সামাজিকতা হ'লেও ক্ষতি নেই বোধ হয়। পিতার এক সময়ের স্ত্রী হিসাবে একেবারে 'নিস্পর' মানুষের চাইতে কিছু কাছের মানুষ বোধ হয় না?

কিংবা। সন্ন্যাস, গৃহত্যাগ যাই বলো, তা কি গুছিয়ে সাজিয়ে বিলি বন্দোবস্ত ক'রে, তারপরে? যেমন সেই সরকারি বাংলোয় যে পর্দাগুলো, টিভি, ফ্রিজ, শয্যা উপকরণ, গোদরেজগুলো, হার্থরাগগুলো, জয়পুরী বাসন-কোসন, যা সব নিজেদের টাকায় কেনা, তা সব ভেবে নিয়ে? তা হ'লে তো মদের বোতলগুলোকে, বাসমতীর বাড়তি স্টক, এসবও ভাবতে হয়। এমন কি হরিয়ানার আধ-তৈরি কটেজটার সামনে স্তূপাকারে রাখা বিল্ডিং মেটিরিয়্যাল, সেখানে গ্যারাজে রাখা স্কুটার দুটোকে, ইতিমধ্যে কিনে ফেলা হয়েছে যে সব ফার্নিচার, ফলের গাছগুলোকে যা অবশ্যই কেয়ারটেকার আর তার স্ত্রী দেখে রাখে—সে সবকেও ভাবতে হয়।

আর। তখন দুটো বেজে যাচ্ছে, ততক্ষণে অজেয় আর বিজয় থানার সাহায্য নিতে শুরু করেছে নিশ্চয়, ততক্ষণে আটঘণ্টাও হয়েছে, আর চার'শ কিমি হ'তে চলেছে। সেটা আরও বড় রাস্তা, আর বাঁদিকে, আগের ডাইনেব দুটোর চাইতে বরং চওড়াই, যা নিশ্চয় কোন বড় শহরে নেবে। এটা একটা ধাক্কাই, এই মৃত্যু—কিছু ভাঙবে, হারাবে, নষ্ট হবে।

সে বাঁ হাতে স্টিয়ারিং নিয়ে ডান হাতে জানালার বাইরে ইশারা করতে করতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশে বাঁক নিলো। ট্রাকটা ডানপাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। আর রিয়ার ভিউ মিররে নীল রং সেই ট্রাকটার পাশে তার ঠোঁটের কোণ দুটি বিষণ্ন সেই মাঝারি শহরে ঢুকতে, মুখের উপরে অন্তর্মুখিনতার পর্দা যা ভেদ হয় না, সানগ্লাসে ঢাকা চোখের নিচে গোলাপী-গ্লস দেয়া ঠোঁট—। আর তারপর সোজা তাকালে নিজের মার্সেডিজের দুধ-সাদা বনেট।

সেই অতীতে এই দুধ-সাদা মার্সেডিজ কিন্তু বিপদ ঘটাতে চলেছিলো। না হয় কেডারে পনেরো বছর হয় তখন, তা হ'লেও এরকম একটা মার্সেডিজ, রাদার লং ফর নন স্পোর্টিং কার; ঋণে? কোথাকার ঋণে? কিসের ঋণে কেনা? আর বলবে কি, তা বিজয়ের জন্য একজনের 'থ্যাঙ্কু'। সে বছরইতো সে। আর সে যখন নিজে টোয়েন্টিজের গোড়ায়। যত্নই তো। এক হাতে, এই দুখানা হাতেই, ড্রাইব করা। আর দাম যা বেড়েছে, এই পুরনোটাই যাতে কেনা তার বেশি দামে বিক্রি হ'তে পারে। হাসলো সে। ভিতরের কিছু বেগড়ানোর কথা ভাবা যায় না।

তো, সে বোধহয়, স্বামীর মৃত্যুর পরে লজ্জার কথাই, মানে, আবার ছেলেপুলে আনতে পারে। লজ্জার কথাই হ'য়ে ওঠে—সেই তেরোতে শুরু আর চল্লিশ পার হ'তে

হ'তেও, আর তা কি না স্বামীর মৃত্যুর পরের দিন সকালে, যখন আর কোন দরকার নেই।

না, না, শব্দটা বোধ হয় একসেন্ট্রিক। না কিউট? গাড়িটা তার নামে কেনা, তার নামে লাইসেন্স। এতটুকু ধুলো জমতে পারে না বডিতে, কলকব্জায় এতটুকু বেগড়ানো ভাবা যায় না। উইণ্ডশিল্ডে ধুলো জমেছিলো ব'লে ওয়াইপার চালাতে গিয়েই যেন চোখে পড়েছিলো সেই সহরে ঢুকতে গিয়ে। এমন একটা গাড়ির উইণ্ডশিল্ডে, ভিতরের দিক থেকে লাগানো একটা খবরের কাগজের কাটিং, ওয়াই-পার ছুঁতে পারে না বলে আট ন'বছর থেকে গিয়েছে।

অ্যান ব্রউন। সন্দেহ হয় আসল নাম কি না। অ্যান ব্রউন। কাঁধছোঁয়া শন রং চুল, অ্যাশ ব্লোনড্। মোটা নীল কাপড়ের সাফারি, কিংবা তেমন মোটা রং-চটা নীল কাপড়ে বুকে কোমরে ঝোলা-পকেট, ফ্রক। বিজয় লাগিয়েছিল কাগজ থেকে কেটে। ত্রিশের অ্যানের সঙ্গে এগারো বারো বয়সের বিজয়ের ভালোবাসা হয়ে-ছিলো। অ্যানের চুমু নাকি ভালো লাগতো।

এসেছিলো যেন সাংবাদিক। ছদ্মবেশ? বিদেশপন্থীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় সেরকম মনে হয়েছিলো। কেন যোগ দেয়া? অন্য কোন প্রফেশনে বিপ্লবী আর পুলিশ দুপক্ষের সঙ্গে যোগ রাখা যায় না? কিংবা তা কূল ধরে ধরে এগিয়ে হঠাৎ অকূলে ভেসে যাওয়া? পরে অবশ্য, ধরা পড়ে নিজেদের কনসালের সাহায্যে দেশে ফিরে যেতে হয়।

কিন্তু ততক্ষণে বোধ হয় দশ ঘণ্টার উপর গাড়িটাকে চালানো হয়েছে। আর আশঙ্কা হচ্ছে, হয়তো তার রিফ্লেক্সগুলো ক্লান্ত, আর তা সে বুঝতে পারছে না। তখনকার সেই রাস্তাটা কোন মাঝারি শহরে ঢুকে পড়লে, আর তার পথে পথে ধীরে ধীরে চালিয়ে গেলে, হয়তো কোন মাঝারি হোটেল পাওয়া যেতে পারে। তা হ'লে সেখানে সন্ধ্যা থেকে সকাল, সকাল আটটা পর্যন্ত কাটানো যায় কি? এসব দিক দিয়ে বড়ো শহরই বরং নিরাপদ। এসব সে যখন ভাবছে, ততক্ষণে পুলিশ হয়তো হসপিট্যালগুলোতে খোঁজ নিচ্ছে।

এসব ব্যাপারে প্ল্যান না-করাই ভালো। সে তো ভেবেছিলো, মথুরাতে রাত কাটিয়ে, পরে আগ্রা-এটা-হরদৈ, এরকম চ'লে যেতে পারবে। কিন্তু প্ল্যান তো লজিকে হয়, আর যারা খুঁজবে তারাও লজিক আনে প্ল্যানিং-এ। দুই লজিকেই একই বিশেষ পথ ধরা পড়তে পারে।

চতুর্থ দিনের সকালেই সে, সুতরাং, নাগপুরে। আর বিকেলে যখন সে নাগ-পুরের সেই ভালো হোটেলটার লবিতে খবরের কাগজের খোঁজে নামছিলো, সে আশা করেছিলো খবরের কাগজগুলো হাতে পাওয়া যেতে পারে। দেখে, কাগজের নেশা চা কফির মতোই, আর সকালের দিকে সকলেই লবিতে হ'ক, স্ট্যাণ্ডে হ'ক, কাগজের কাছে ভিড় করে। কাগজ হাতে নিয়েই দেখতে পেলো সে, শুনতে

পেলো আলোচনা, একজনের পাশপোর্টের ফটোর, যা পাঁচ বছরের পুরনো হলেও— পঁয়ত্রিশে থেকে চল্লিশে নাকি বদলায় নি। এমন কি একটা আইভরি-সাদা মার্সে-ডিজ বেনজেরও উল্লেখ আছে। দেখো কাণ্ড! অজেয় আর বিজয়ের চেষ্টা কতদূর পৌঁছতে পারে! সুতরাং ঘরে না-ফিরে, লবি থেকে অফিসে গিয়ে, তখনই চেক আউটের বন্দোবস্ত করতে হয় না? যেন পাতলা বরফের উপর স্কেট করা। পেট্রল পাম্পে রাখা গাড়িটাকে এনে, সুটকেশটাকে তাতে চাপানো পর্যন্ত তখন ওরকম প্রার্থনাই হতে পারে—পাতলা বরফের পাতটা যেন টেকে।

বোধ হয় মনস্তত্ত্বের ধোঁকা, যার ব্যাখ্যা সেই তাত্ত্বিকরাই জানে, যে একজনের মনে হয়েছিলো গাড়িটাকে নাগপুর কোতয়ালির গাড়ির ভিড়ে রেখে সরে পড়ো। সে কি আশা করেছিলো গাড়িটা পুলিশের চোখে পড়বে, আর তারা অজেয় আর বিজয়কে খুঁজে বার ক'রে গাড়িটা পৌঁছে দেবে? সে ব্যাপারে এই এক সুবিধা ছিলো, গাড়িটা, সেই গোড়াতেই, নাগপুরে রেজিস্ট্রি করা। আর নাগপুর এখন আর সে রকম সহর নয়, যে মার্সেডিজ তেমনভাবে হর হামেশা পাচ্ছে।

কিন্তু গাড়িটাকে সে রকম থানায় রেখে ট্যাক্সি নেয়া? ট্যাক্সিওয়ালারা খুব ধূর্ত হয়। এ যাবৎ ওটাই সব চাইতে কঠিন ছিলো—সম্ভাব্য সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে, গাড়ি থেকে নেমে, সুটকেসটাকে চাকায় চালিয়ে পঞ্চাশ মিটার পথ যাওয়ার পর দাঁড়ানো যতক্ষণ না একটা ট্যাক্সি আসে। তা ট্যাক্সিওয়ালারা খুব আশ্চর্য হ'য়ে যেতো, তেমন দামি গাড়ি থেকে নেমেই কাউকে ট্যাক্সি নিতে দেখলে।

আর ট্যাক্সিতে ব'সে সে ঠিক ক'রে ফেলেছিলো, বড় কোন রেলস্টেশনের ক্লোকরুমে সুটকেসটাকেও ছেড়ে দেয়া যায়। বুদ্ধিটা মনে ধরতে, সে ট্যাক্সি বড়বাজারে থামিয়ে, পিঠে ঝুলিয়ে নেয়ার বড় একটা ভ্যালিজ কিনেছিলো। আর তারপরে স্টেশন। আর ট্যাক্সিওলার 'কোন গাড়িতে যাবেন', 'রিজার্ভেশন আছে কি না' এসব প্রশ্নে অন্যমনস্ক থাকার ভান করে উত্তর না দেয়া। আর তারপর তাকে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে বিদায় দিয়ে সুটকেস নিয়ে একেবারে বুকিং কাউন্টারে দাঁড়ানো। এই চ্যাপ্টারই কঠিন ছিলো।

এটা বলা যায় না, নাগপুরের পুলিশ লাইসেন্স থেকে খুঁজে বার করে ইতিমধ্যে গাড়িটাকে অজেয়দের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে কি না। অথবা কি গাড়িটা চোরাই গাড়ি হ'য়ে ডাকাতি বা লুঠে অংশ নিয়ে, রংচটা, তোবড়ানো অথবা কঙ্কাল হ'য়ে ধরা পড়বে? না, না, তা হ'লেও তা কি পথের পাশে প'ড়ে থাকা কোন এক প্রিয়জনের কঙ্কাল হ'তে পারে?

কিংবা অ্যান ব্রউনের ছবিটা কি চোখে পড়ে যাওয়ায় অন্য দিকে মন যাবে পুলিশের? চিফ সেক্রেটারি নোটস্ দিয়ে এসে বলেছিলো বটে, 'অ্যান যদি কখনও এদেশে আর না ফেরে খালাস দেয়া যায়। ট্রান্সপোর্টেশনই হ'লো। বেকসুর নয়। যার সঙ্গে সহবাস করছিলো সে তো ম্যানইটার। এনকাউন্টারে গেছে। ফিরলে

বিশ বছর।'

কি আশ্চর্য! সে তো তাকে লণ্ডনে পরিচিত সাংবাদিক ব'লে জানতো। আর সে সুবাদে অ্যান্ চিফ সেক্রেটারির বাংলোয় অতিথিও হয়েছিলো। আর তা থেকে, ক্রমশ তাকে এই মার্সেডিজেই গোপালপুর-অন-সি তে পৌঁছে দেয়া। সেটাই তার নিজেরও তখন পর্যন্ত সব চাইতে লং ডিস্টান্স ড্রাইবিং। কিন্তু কি উদ্দেশ্য ছিলো? বিপ্লবীর শয্যায় ঘুমিয়ে, বিপ্লবের মেকানিক্স জেনে নিয়ে, বই লেখা? টাইমস্-সাপ্লিমেন্টের বিজ্ঞাপন আলোচনায় সে রকম মনে হতে পারে। এক ফুলফিলমেণ্ট? নাকি সেই গলফ বলটার মতো ১৮-র হোলে না গিয়ে, কি ক'রে জলে গিয়ে পড়লো?

কিন্তু ততক্ষণে সে বিভা আবার দিল্লি মেইলে বসেছে। দু'তিন ঘণ্টা দেরি ছিলো সেই প্রায় সন্ধ্যার গাড়িটা আসতে, আর প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে সুটকেসের পাশে স্তব্ধ ছিলো সে।

সেটাও কিন্তু আর একটা ছবি। না, উইণ্ড শিল্ডে লাগানো কাগজের কাটিং কেন হবে? সরু লম্বা অফ হোয়াইট ফ্রেমে, বেশ লম্বাটে আয়তনের, অ্যাম্বার, মেরুণ লাল, ব্রাউনে আঁকা; পায়ের পাতা ছোঁয়া মেরুণ লাল গাউনে, উঁচু ঝু'টি ব্রাউন চুলে, যেন গ্রীক ভাস্কর্যের ভাবই, গলার রুদ্রাক্ষের মালায় ডান হাত ছু'ইয়ে, নিবেদিতা।

ছবিটা গোড়ায়, কিন্তু, সেই ম্যাজিস্ট্রেট বাংলোয়, চিফের সেই প্রথম-স্ত্রীর শোবার ঘরে ঝুলতো। আর সেই সব মৃদু বিস্ফোরণের ঝাঁজ কাটিয়ে (তখন তো ম্যাজিস্ট্রেটের সেই হন্তদন্ত অন্য প্রভিন্সে বদলির সময়ে কোন কিছুই তদারক করে নি সে) কি ক'রে বা প্যাকড হ'য়ে ছবিটা নতুন বাংলোয় এসে গিয়ে থাকবে। নিবেদিতা নিশ্চয় স্বামীর সেই অধ্যাপিকা-স্ত্রী নয় যে অস্বস্তি থাকবে। আর তা ছাড়া, কয়েক বছরে এসব ট্রিঙ্কেটে অভ্যস্ততা এসে যায়। পরে একজন অনেক বদলির পরে চিফ হ'য়ে বসলেও, তার বাংলোর বসবার ঘরে সিস্টার নিবেদিতার, যার নাম একসময়ে মার্গারেট, তার ছবি ঝুলতে দেখা যায়।

কি বলবে? মেয়েমানুষ থেকে অ্যান ব্রউন আর সিস্টার নিবেদিতা। কিন্তু ততক্ষণে দিল্লি মেইলে বেশ গতি লেগেছে। সেই চেয়ার কারে আলো জ্বলছে। সহযাত্রীদের চোখের মণিগুলোর নড়াচড়া দেখে মনে হ'তে থাকলো, সেই প্রথম, বোধ হয় বিদেশিনী পোড় খাওয়া ট্যুরিস্টিনির মেক-আপ ভালো। চল্লিশেও একা একজন স্ত্রীলোকের পথে বিপথে চ'লে বেড়ানোর পথ কুসুমে ঢাকা নয়, এদেশে কিংবা অন্য দেশেও। সাপ ছোবলাতে চাইবেই। রাত নটায় আলো নীল হ'তে থাকলে, সহযাত্রীদের অধিকাংশের ঘুমের ঘোর লাগতে থাকলে, টয়লেটে গিয়ে হাল্কা ওভারকোট আর নীল স্ল্যাক্স জোড়া পরে নিয়েছিলো সে, আর চুল ঢেকে মস্ত ব্যাণ্ডানা রুমাল জড়িয়েছিলো মাথায়। স্টিল ব্লু ওভারকোট, নীল স্ল্যাক্স, লালে সাদা ফুটকি সেই রুমালে যখন মাঝরাতে এক বিদেশিনী ট্যুরিস্টিনিকে দেখে অবাক

হচ্ছে না-ঘুমানো সহযাত্রীরা, সে সুটকেস থেকে ভ্যালিজে নিছক প্রয়োজনের যা কিছু ভ'রে নিতে পেরেছিলো। সেই নিতান্তই বেমানান পোশাকে এই এক অধিকন্তু সুবিধা ছিলো, যে নিউ দিল্লিতেই সুটকেসটাকে লেফটলাগেজে রেখে, দিল্লিরই অপরিচিত পাড়ার এক তিনতারা হোটেলে উঠলে,—কোন অসুবিধা হয় নি। সাপের সেই ছোবলাতে চাওয়ার সত্যের মতো, এটাও সত্য—পোশাকই পরিচিত, মানুষ নয়। সে হাসলো।

আর এখন তো আরও। সিমলাতে চুলগুলো ব্লিচ ক'রে নেওয়ার পরে, দিল্লিতে কেনা এই রংচটা নীল ক্যানভাস ট্রাউজারে, ধুলোধূসর হওয়া ওভারকোটে, চুলঢাকা পার্কা কায়দার হুডে, পায়ে আবার পুরুষালি নর্থস্টার, চোখে বেঢপ সান গ্লাসে,— এক কথায় আগ্‌লি বলতে পারো।

কিন্তু, দেখো, অজেয়রা এখনও খোঁজটা নিয়েই চলেছে, নতুবা চণ্ডীগড়ের কাগজে বেরোন সংবাদ ড্যালহৌসিতে দেখো কেন? লেফট্‌লাগেজ অফিসে কি সুটকেসটাকে পেয়েছে সি বি আই? তার গায়ে লেখা নাম পড়েছে?

আর এতদিনে, অজেয়দের সৎভাই, সেই অধ্যাপিকার দরুণ, এতদিনে খবরটা পেয়ে যেতে পারে। সে তো আবার আই এ এসটা না-পেলেও, পুলিশেরটা পেয়েছে। আর এসব সংবাদ কোন সহরে গেলে, পুলিশের সুপারইনটেনডেন্টরাই আগে পায় বোধ হয়।

ওটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালোই হয়েছিলো, সুদর্শনের আসা। সে নিজেই চেষ্টা করেছিলো যাতে ইচ্ছা হ'লে, সুদর্শন আর তার মা শেষবারের মতো দেখতে পায়। বরফে, ফুলে…। (সুদর্শন এসেছিলো, তার মা আসে নি। বিদ্বেষ? না কি এতদিন পরে বোকা বোকা লাগতো? সুদর্শনের নিজেরই বছর পাঁচেকের ছেলে আছে। এখন বোধ হয় তার নিজের বাবা-মা না থাকলেও চলে। আর সুদর্শনের মার বয়স তো এখন সাতান্ন আঠান্ন হবে। চুল নিশ্চয় পেকেছে। দাঁত কি বাঁধানো হয় নি আর চোখের চশমার কাঁচ, সে তো গোড়া থেকেই, এখন কত পুরু কে জানে? আর পোশাক যত উজ্জ্বল করো ততো বেখাপ্পা, নয় কি?)

না, না, তা কেন? তার নিজের সান গ্লাসটাও এমন কিছু সুদৃশ্য নয়, বরং কুদৃশ্য ব'লেই কেনা। কে দেখছে তার আড়ালে চোখদুটো নিষ্প্রভ কিনা? ট্রাউজারটাকে ড্যালহৌসির ধোবা বেরঙা ক'রে দিয়ে ভালোই করেছে। আর গালের চামড়ায় দাগ না পড়লেও ঠাণ্ডার ফাটল কি পড়ছে না? ফ্যাকাসে লিপগ্লসে, ধুলোধূসর ব্লিচ করা চুলে, তেমনই ধূসর ওভারকোটে তাকে নিশ্চয় চল্লিশে পঁয়ত্রিশ না দেখিয়ে বরং পঞ্চাশ দেখাচ্ছে এখন।

ওটা সে ভালোই করেছিলো, সুদর্শনদের খবর দিয়ে। আর সে তো সুদর্শনের ফেরার সময়ে তাকে চিফের সবচাইতে পছন্দের ঘড়িটা আর ওয়াকিং স্টিকটা দিয়েছে। তারও তো জনক।

আর তাছাড়া পোশাকের কথায় ইলেনোরর কথা ধরো। ইলেনোর রুজভেল্ট। তার সেই সব আনসেকস্‌ড মোটা চালের গাউন। কিংবা অ্যান ব্রউনের জটার, পেন, কাগজের প্যাডে ভারি অনেক পকেটওলা, মোটা কাপড়ের ফ্রক অথবা নিবেদিতার সেই বালিশ-খোল হেন গাউন। কেমন হয়ে যায় যেন, না? মেয়েরা বাইরে বেরোলেই ভিতরে বাইরে আর যেন মেয়ে থাকে না।

আর সে তো এখন বিভা সেনও নয়। সিমলার স্টেট ব্যাঙ্কে ক্যাশের খানিকটা, আর ট্র্যাভেলার্স চেকগুলো জমা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে গিয়ে, সে হাসলো, নিজের নামটাকে দুভাগ ক'রে 'বি. ভাসেন' ক'রে নিয়েছে, শুধু ইংরেজি স্মল আর ক্যাপিটাল অক্ষরগুলোকে বসানোর হেরফেরে। আর সে তো জানেও না, এখন কোথায় সে, হরিয়ানায় কিংবা হিমাচলে। টুন্নুরামও কি জানে? সে তো কাল বিকেল থেকেই বলছে, আর খুব দূরে নয় বোধ হয়। আর আজ সকালে, ঘণ্টাখানেক চলার পরে স্যাড্‌লের বেল্ট ছিঁড়ে গেলে, ঘোড়াটা এই গাছে বেঁধে বেল্টটাকে সারাতে স্যাড্‌ল নিয়ে নিচে নেমে গেছে ঢাল বেয়ে বেয়ে, কাল যে গ্রামে রাত কেটেছিলো সেখানে। পাকদণ্ডির পথ ব'লে যদি সে আজ বিকেলের আগে ফিরতে পারে।

যে ক্যাশটা সে সঙ্গে এনেছে তাতো ওভারকোটের নিচে ট্রাউজার্সের পা বরাবর লুকানো পকেটে। এখন সে এই আলপাইন স্টিক হাতে এই বিশ্রী গগলসে চোখ ঢেকে পাহাড়ে পিঠ দিয়ে, পাথরটায় ব'সে থাকতে পারে। সুবিধা এই, ঘণ্টায় একজন কেউ যায় কি না এ পথে। এই পাথরটা যা হাত তিনেক চওড়া পাহাড়ের লেজে। চারদিকে কুয়াশায় ইতিমধ্যে দুপুরেই সন্ধ্যার ভাব। পাহাড়ের গায়ে ঝোপগুলো নীল। আর শীত।

গগলসের কথা যদি বলো, মীরারও ছেলেবেলা থেকেই চশমা লাগে। মীরার আটত্রিশ হ'লো। মীরার চোখের ডাক্তার বলেছিলো, 'তার পক্ষে দিদিকে অনুসরণ না করা ভালো। কারণ নাচে শুধু শরীরের নয়, চোখেরও কসরৎ হয়। মায়োপিকের পক্ষে ভালো নয়।' মীরা নাচের আসরে যেতোই, কিন্তু কাগজে নাচের ভঙ্গিতে হাত পা মুখের ছবি আঁকতো। নাচতো না।

সে মীরার প্রথম বিয়ে, বরের সঙ্গে আমেরিকা যাওয়া, সে বিয়ে ভেঙে যাওয়া, মীরার একা ভারতে ফেরা—এসব মনে করলো। মীরার ত্রিশের আগেই এসব ঘটেছিলো। ভারতে ফিরে কিছুদিন দিল্লীতে তার কাছেই ছিলো মীরা। আর তখন সে মীরাকে বলতো, 'ছবি আঁকিস না কেন?' বছরখানেক পরে মীরা এক স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল, আর এক হরিণাভি ব্রাহ্মণকে বিয়ে করেছিলো। সে এক আর্টিস্ট। আর্টিস্টরা ভালো বর হয় না বোধ হয়। কখনও সফল হয় তারা? নাকি পোরট্রেট আঁকতো। কেউ কেউ তা আঁকে, নতুবা ব্যবসায়ীদের ঘরে ঘরে অত কুৎসিত সেগুলো দেখো কি করে? এ সব ভাবতে গেলে হাই ওঠে। অ্যামেরিকার সেই প্রথম ডাক্তার বর বরং—এখানকার ভি আই পিরা বাইপাস করাতে গেলে কাগজে

নাম ওঠে। কেন এরকম? সাত বছর অ্যামেরিকায় থেকেও মীরার সন্তান হয়নি ব'লে?

সে প্রায় আশ্চর্য হ'লো, তারপরে সাত বছর মীরার কোন খবর রাখে নি। হিমাচলের মাণ্ডির সেই স্কুলের ঠিকানায় সে চিফ সেক্রেটারির খবর দিয়েছিল বটে।

মীরা তার দ্বিতীয় বিয়ের আগে রামনগর থেকে চিঠি দিয়েছিলো বটে। একটু তাড়াতাড়ি হ'য়ে যাচ্ছিলো না? অ্যামেরিকা থেকে ফেরার এক বছর হয়েছে কি না হয়েছে। হয়তো রামনগরে হানিমুন ছিলো। মাস দুয়েক বাদে মাণ্ডি থেকে গল্প লেখিকা পোর্টারের একটা ছোট বায়োগ্রাফি ফেরৎ পাঠিয়েছিলো। যেন বইটা ফেরৎ দেয়াই। অথচ সেটাই যেন চিঠির উত্তরও। পোর্টারের চতুর্থ কি পঞ্চম বর, তখন সেই লেখিকার চৌষট্টি হবে, হৃদ্দ ত্রিশ বছরের।

দুপুর গড়িয়ে গেলে, বিভা দেখলো প্রায় বিশ ডিগ্রির চাপ বেয়ে টুহুরাম উঠছে। এই টুহুরামের চল্লিশ হবে। মাথায় ময়লা উলের টুপি। গায়ে তার চাইতেও ময়লা পশম-ধোসার জামা। উলের টুপিটা সরালে টেকো মাথায় খুসকি। আর তার ঘোড়াটা, না, নিশ্চয় ওয়েলার নয়, যার চকচকে চামড়ার নিচে সেনসুয়াল পেশীগুলো চঞ্চল হবে। বড় বড় নোংরা বালামচির, আর রোগাও বটে।

কিন্তু মীরার মাণ্ডির সেই স্কুলে চাকরি করার খবর অন্তত পাঁচ-ছয় বছরের পুরনো। সে যখন স্কুল থেকে ফিরে আসছে, তখন সেই স্কুলের চাপরাশি জনকুরাম, যার ভাগনা এই ঘোড়াওলা সুলতানপুরিয়া টুহুরাম, বলেছিলো মীরার খবর। ছওমাহিনা আগে সেই মেমসায়েব একবার স্কুলে এসেছিলো পুরনো পাওনা ডি. এর খোঁজ করতে। এখন স্পিটি-টাণ্ডি থেকে তিরলোকনাথ যাওয়ার পথে কোন গাঁওয়ে পেরাইমারি ইস্কুল করেছেন সে। খুব উঁচুতে, খুব ঠাণ্ডা আর বরফও।

বেশ, এই তো হ'লো, এবার কোনদিকে? দিল্লি থেকে নাগপুর আবার দিল্লী হয়ে সিমলা-মাণ্ডি সে তো 'চার' এই অঙ্কটা এঁকে এঁকে চলেছে। মাণ্ডিতে সে দুদিন বিশ্রাম দিতে পারে পা দুখানাকে। যখন এসব ভাবছে তখন কতগুলো সুবিধা দেখা দিলো। জনকুরামের সুলতানপুরিয়া ভাগনার ভাড়া দেয়ার ঘোড়া ছিলো, সে নিজে ঘোড়ার সঙ্গে চলতে রাজি ছিলো, আর সে তখন উপর থেকে নেমে মাণ্ডিতে ছিলো।

কিন্তু আবার, সেই লজিকও ছিলো। অজেয়রা পুরনো চিঠি খুঁজে যদি জানতে পারে মীরা মাণ্ডিতে ছিলো? তা হ'লে এদিকে পড়বে খোঁজ করার ঝোঁক। সে জন্যই বরং কাংড়া, ধরমশালা, ড্যালহৌসির দিকে। 'চলো না দেখে আসি।' তাছাড়া জিরিয়ে নেয়ার পক্ষে, এখন হঠাৎ দাম পড়ে গেছে, বৃদ্ধা মেমের মতো ড্যালহৌসি বরং নির্জন। আর ঘোড়া এজন্য যে বদখৎ ওভারকোট, বেরঙা ট্রাউজার্স, কুৎসিত সানগ্লাস, বেঢপ ভ্যালিজ, বিকেল গড়িয়ে গেলে ট্রাউজার্সের হাঁটু থেকে নর্থস্টার জুতো জড়িয়ে পট্টুর পুলিশি পটি, যা সব দ্বিতীয়বার দিল্লি ছাড়বার পর একে একে যোগাড় হয়েছে—এসব সত্ত্বেও সে তো 'সন্ন্যেস' নয়, বরং মানে, এসবের ভিতরে

একটা মেয়ে শরীরই তো ! বরং তাকে আড়াল করতেই এসব।

বেলা পড়ছে আর শীতও বাড়ছে। এরপরে গ্রাবস পরতে হবে, পায়ে পট্টি জড়াতে হবে। সুবিধা এই, টুহুরাম বুঝতে পারে কোন গাঁওমে আশ্রয় নেয়া উচিত, কোনটাকে পার হ'য়ে যাওয়া ভালো। এও আর এক সুবিধা, তাকে আর চেনাও যায় না। কিন্তু কোথায় ? যতদিন ক্যাশ ততদিন ঘোড়া, তারপর শুধু পথ ? শুধু পথই।

টুহুরাম ফিরলো। স্যাড্‌লটাকে চড়ালো ঘোড়ার পিঠে। স্যাড্‌লের উপরে কম্বল ! সে জানালো, নিচের গাঁওএ আরও দু'একজন বলেছে, আর কিছু উপরে সে খোঁজ ক'রে দেখতে পারে। পথ ছেড়ে একটু বিপথে গেলে এক 'সন্নেসি মেম' থাকে। সেখানে ইস্কুল থাকতে পারে। কিন্তু, ঘোড়ায় চড়তে ভাবলো সে, মীরাই যদি হয়, সে তো এই শীতের মুখে যোগিন্দর নগরে নেমেও যেতে পারে যেমন জনকুরাম বলেছিলো। যদি চলতেই থাকি ? এমনও হয়। যদি চলতেই থাকি ?

কিন্তু, দেখো, অজেয়র পাশে ব'সে সুদর্শনও শ্রাদ্ধ করলো। নতুন ধরনের হ'লো, দুজনের একই সঙ্গে সে রকম করা। পুরোহিত খুঁত খুঁত করলে, পাশা-পাশি দুজন পুরোহিত বসানো হয়েছিলো। আর একবেলার মধ্যে সেই দ্বিতীয় প্রস্থ শ্রাদ্ধের যোগাড় ক'রে দেয়া হয়েছিলো। আগে তো শুধু অজেয়ই করবে এমন ঠিক ছিলো। হঠাৎ ঠিক হ'লো। অজেয়র চোখে জল ছিলো। সুদর্শনের বয়স বেশি, আর সে তো পুলিশের সুপারিনটেনডেণ্ট, তাকে আবেগ গোপন রাখতে হয়। তাকে বিস্মিত দেখাচ্ছিল। নৈকট্য বোধ কি থেকেই যায়, যদিও সে পাঁচ ছ' বছর না হ'ক ন' দশ বয়স থেকেই সেই জনক থেকে বিচ্ছিন্ন ?

বিভা হাসলো। টানটা কি সাহচর্যের নয় ? নতুবা বলতে হয়, যেন একই ওয়েভলেংথে থাকার ফল, সেই অদৃশ্য বীজ আর ত্রিশ বছরের আর একটা মানুষের। সুদর্শন খুশী হয়েছিলো সোনার লাইটার, সোনার ঘড়ি আর চেরির ওয়াকিং স্টিকটা পেয়ে। কেউ কি তার মায়ের মৃত্যুর পর তার পুরু পরকলার চশমা জোড়াকেও এরকম রেখে দেবে ? আশ্চর্য, তা হ'লে এটাই কি উত্তর ? এর জন্যই সব ?

না হ'লে, বলতে হয়, কিছু নেই, পেরাইমারি স্কুলও না, সন্নেসি মেমও না। চলতেই থাকো। একটা শুধু অসুবিধা। অ্যান ব্রউনকে যেমন, কোন কনসাল এসে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না বোধ হয় কোন কালে।

আর অজেয় আর বিজয়। আচ্ছা, কেন ?

আহা, মথ বোধ হয়। দিনের বেলাতেও অন্ধ। এতটুকু এক মুঠো ঝোপ, তাতেই হয়তো জীবনের প্রথম থেকে শেষদিন কাটবে। আহাহা, ঘোড়ার খুরের নিচে একটা ডানা গেলো। খুন ? না, না, তা সে করবে কেন ? পারে তা ?……তা ছাড়া নাচার সময়ে, সব নাচেই কখনও না কখনও প্রজাপতির মুদ্রা হয়। তাই

ব'লে কুচিপুড়ির মতো পরিশ্রমের নাচ কাউকে প্রজাপতি করে? তেমন নরম আর হাল্কা?

তা কেন? সে তো ঘোড়ায় উঠতে গিয়েও ছেলেদের কথা ভাবছিলো। সে তো অ্যান ব্রউনও নয়, নিবেদিতাও নয়। দেখো কাণ্ড! উৎরাইএ যদি বিজয়কে, চড়াইএ তবে অজেয়কে। সে অবাক হ'য়ে গেলো এই আবিষ্কারে। কেন? তা কি টিভি, রেডিও, খবরের কাগজ আর পিছন পিছন আসছে না ব'লে?

ছেলেদের মানুষ করার কথা ভাবতে গিয়ে বুকে লাগানো ঠোঁটগুলোকে অনুভব করলো সে। ডাক্তাররা না বললেও, দুধ তেমন টেনে নিতে থাকলে মাথা ব্যথাট্যাথা টের পাওয়া যায় না আর। সেবার আঙুলহারা হ'লে, ডাক্তার তো পেইন কিলার দিতে যখন আপত্তি করছিলো, আয়া সাবধানে বিজয়কে বিছানা থেকে নিয়ে গেলে ব্যথা যেন বেড়েছিলো। বিজয় আবার এসে টানতে শুরু করলে বরঞ্চ ব্যথা কমছিলো।

গূঢ় হাসিতে ঠোঁট চাপা হ'লেও, তার মুখ যেন, যেমন সম্ভব নয় তখন, তেমন চকচকে দেখালো।

হয়তো ব্যথা তখন মনে থাকে না। গ্ল্যাণ্ড বলবে? আজকাল ডাক্তাররা বলেও। প্রকৃতপক্ষে তাই কি? শরীরের আড়ালে অন্ধকারে গ্ল্যাণ্ডগুলো উত্তেজিত হয়, ঝিমোয়, মুষড়ে যায় আর আমরা মেয়েরা ভাবি 'অনুভব করছি'? শুধু মেয়েরা কেন? সকলেই?

সে অবাক হ'য়ে গেলো—বিজয় কি সেই ব্যথা ঢাকতেই যে আর কখনও নাচা হবে না, নিজের ঘরের মধ্যে আরশির সামনেও না? কি হয়েছিলো, কেন? একজন ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী তেমন ক'রে নাচলে অ্যাড্মিনিস্ট্রেশনের গাম্ভীর্য থাকে না ব'লে? নাকি অজেয়কে মানুষ করতে গিয়ে কেউ নাচার যোগ্যতা এত কমিয়ে ফেলেছিলো যে অ্যাড্মিনিস্ট্রেশনের গাম্ভীর্য নাচের লালিত্যর চাইতে দামি হ'য়ে উঠেছিল। আর সেই সব ভুলতে বিজয়?

টুহুরাম বললো, সামনে চড়াই থেকে যে পাকদণ্ডি উঠেছে সেটায় উঠলে দেখা যাবে, হয়তো ছোট-সে-ছোট কোন গাঁও আছে। সামনেই দেখুন উল্টানো পিরিচের মতো বরফপাহাড়। এরকম ওরা বলেছিলো।

তখন বিভাবতীর মনে হ'লো, আর অজেয়? অজেয় কি এজন্য তবে, যে নিজের সঙ্গে জড়ানো সেই ডাইভোর্স ইত্যাদির ব্যাপারকে পবিত্র করতে চেয়েছিলো সে? শুধু গ্ল্যাণ্ড নয় বোধ হয়। আজকাল কেই বা গ্ল্যাণ্ডের বিপত্তিতে ঠ'কে যায়? আর অভিজ্ঞতার পরামর্শও ছিলো। বরং ঝোঁক এসেছিলো তার। অবাক, নিজেকে পবিত্র করতে, নিজেকে? জানতাম না তো।

টুহুরাম বললো, বস্, মেমসাহেব এখানে দাঁড়াবেন। সে পাকদণ্ডি বেয়ে দেখে আসবে সেটা কোন গাঁওএ গেলো কি না। যদি গাঁও থাকে বুঝতে হবে, আরও নিচে থেকে কোন চড়াই সেই গাঁওএ গিয়েছে, যা তারা ছেড়ে এসেছে সকালের

অন্ধকারে। আর যদি গাঁও না থাকে, বুঝতে হবে সে গাঁও তবে আরও অনেক দূরে। অনেক দূরে। যদি থাকে।

তেমন করলো টুহুরাম। আধঘণ্টার মধ্যে ফিরেও এলো। বললো সে, পাক-দণ্ডির শেষে কম ঢালু পাহাড়ের গায়ে গাছপালাওয়ালা কয়েক একরের এক গাঁও আছে। সেখানে সে এক মেমসাহেবকে দুধ দোহাতে দেখেছে। সেই মেমসাহেব যদি সেই মেমসাহেব না হয়, তা হ'লেও উপরে সেখানে আজ থেকে যাওয়া হবে। টুহুরামের নিজের মেমসাহেবকে আজ কিছুক্ষণ থেকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

তখন বিভা অবাক হ'লো আবার, তা হ'লে এই কি উত্তর, যে মলিন শরীর আর হতাশা নাচ থেকে? সে ডান পা টাকে উঁচুতে তুলে বসিয়ে, আলপাইন স্টিকটাকে খানিকটা পুঁতে দিয়ে সেটাকে ধ'রে দাঁড়িয়ে দম নিতে লাগলো। টুহুরাম আরও চড়াইএ গেলো, সেখানে থেকে ঘোড়া-চলা উৎরাই দিয়ে সে গাঁও আসবে। না না, বিভা ভাবলো, মনকে এতো একলা হ'তে দিতে নেই, এ যেন ন্যুড্ হ'য়ে যাওয়া মনের। শাট্, শাট্। মিথ্যা হ'ক, তাও কি বলা হবে না, ওদেরই চেয়েছিলাম?

কিন্তু মীরাই বটে, হাঁটু পর্যন্ত গুটানো ঘাগরা, তার উপরে কাশ্মিরী টুইডের পুরনো হাউসকোট, যাতে অন্য রঙের কাপড়ের তালি, রুক্ষ চুল। শীতে ফাটা পায়ে কাঠের স্লিপার। মুখ শীতে আর পরিশ্রমে যতটুকু লাল, চোখের কোলে ততটাই কোঁচকানো, চশমা সত্ত্বেও।

দু'তিন মিনিট লেগে গেলো। তারপরে মীরা বললো, 'সে কি রে, দিদি? এভাবে? আয়, আয়।'

মীরা বললো, 'আগে দু' এক কাপ চা খেয়ে নে, তারপরে কথা। শীতও পড়েছে বটে। ভাগ্যে উনানে আঁচ দেয়া আছে।'

আর বিভা দেখলো, আট দশ ঘর মানুষের ছড়ানো ছড়ানো বসতির একপাশে স্কুলের ঘরটা ছেড়ে দিলে, এই একখানা মাত্র দোতলা ঘর নিয়ে মীরার বাড়ি। একতলায় কেউ থাকে না, গোরু দুটো, আর কাঠকুট থাকে, তারই একপাশে খাদের উপরে ঝোলানো মীরার বাথরুম। মোটা মোটা কাঠের বাড়ি। দোতলার সেই একটা ঘরেই সে ঘুমায়, রান্না করে, ছবি আঁকে। যে কোণটায় সে রান্না করে, উনানে জল ফুটছে, সে দিক ছাড়া তিনদিকে দেয়ালে নানা মাপের, নানা ঢঙের, নানা রঙের ছবি ছাদ থেকে মেঝে দেয়াল জুড়ে সাঁটা। শ্রীছাঁদ আছে ভেবেছো? কাঠের দেয়াল, বর্ষার ছাঁট লাগলে, বরফে ড্যাম্প হ'লে, ছবি তো বিবর্ণ হবেই। সে সব বিবর্ণ ছবির উপরে আবার নতুন ছবি সাঁটা। যেন দেয়াল ঢাকলেই হ'লো। নতুন ছবির তলায় পুরনো ছবি একশ' দেড়শো চাপা পড়েছে কি না কে বলে? যে দিকে চায়ের জল হ'য়ে আসছে, তার উল্টো দিকে বাঁকা তেড়া ইজেলে অর্ধেক আঁকা একটা পোরট্রেট যেন তেলরঙের। বিবর্ণ নীল ক্যানভাসের প্যাণ্ট, কালচে বাদামি

উইণ্ড চিটার, কালচে বরফ জুতো, ময়লা চুল, গায়ে যে রং তাতে বিদেশী বোঝা যায়। গলায় জড়ানো স্কার্ফ যা উইণ্ড-চিটার আর প্যান্ট ঢেকে নামছে সেটায় জাফরান রঙে নামাবলীর জাতের মোটিফ।

ততক্ষণে চা ভিজিয়ে মীরা বললো, 'আগে চা খেয়ে নে। তারপর কয়েকখানা চাপাটি গড়বো। তারপর তোকে স্নানের জল দেবো। আমার একতলার বাথরুম দেখে ভয় পাবি নে কিন্তু। তারপর রান্না করবো। হ্যাঁ, দিদি, এরকম কেন চেহারা, ছাইভস্মে নিজেকে ঢেকেছিস? র'স জল গরম করে নি, নিজেই তোকে স্নান করিয়ে দেবো। কি ক'রে আমাকে খুঁজে পেলি, আশ্চর্য!'

'তুই এখানে—'

মীরা হাসলো, 'সে এক মজার। এবারের আগেকার ইলেকশনে এক পার্টির হ'য়ে কিছু খেটেছিলাম। সেই 'এম্‌লে' এই জায়গাটার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলো। স্কুলটাকে সরকারি দান এনে দিয়েছিলো। দুবেলা খাওয়া চলছে। চা নে।'

বিভা বললো, 'যদি বলি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

মীরার মুখ গম্ভীর হ'লো। সে বললো, 'চিফের সংবাদ রেডিওতে প্রথম দিনেই শুনেছিলাম, তখন দু'তিন দিনের জন্য মাণ্ডিতে ছিলাম ব'লে। এখানে আর রেডিও কোথায়?' সে হাসলো, তারপর বললো, 'আগে স্নান করিয়ে দিই। এই ছাইভস্ম থেকে তারপরে যে মেয়েমানুষটা বেরোবে, তাকে তাড়াবে? সে সব পরে, এখন আমার মেয়েটিকে দেখ। কেমন, মনে ধরছে? কেতকী নাম। তোকে আগে লিখি নি। বিশ্বাস হচ্ছে না? হ্যাঁরে, নাড়ীছেঁড়া।'

বিভা পাঁচ ছ' বছরের সেই সোনালী-বাদামি চুলের মেয়েটার দিকে চাইতেই সে পাহাড়ি-হিন্দিতে বললো, 'তুমি আমার কি লাগছো?'

বিভা হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে নিয়ে বললো 'মাসীমা।' শিশুটি সেই হিন্দি-তেই বললো, 'তা হ'লে তুমিও আমাকে পেয়ার করছে। মা খুব করে। আর বাবাও।'

'তোমার বাবা নিশ্চয় তোমার মতো ভালো আর সুন্দর।'

কেতকী কোল থেকে উঠলো, বললো, 'বাহ্, দেখো নাই আমার বাবাকে?' সে হেঁটে অর্ধেক-শেষ করা সেই তেলরঙের পোরট্রেটটার কাছে গেলো। বললো, 'দেখো, সুন্দর না? আর কয়েকদিনের মধ্যে আঁকা শেষ হ'লে বাবা এসে যাবে। তুমি জানলাটার কাছে উঠে যাও। ওখানে যে বড়ফের চূড়া, ওটা হিমালয়, জানো? পিতাজী ওখানে তসবির আঁকতে গেলো।'

মীরা বললো, 'কেটকি, নিচে এক ঘোড়াওয়ালা এসে থাকবে। তাকে ডেকে আনো চা নিতে।'

কেতকী তখনই মই-সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো বিভার ঘোড়াওয়ালার খোঁজে।

বিভা বললো, 'তুই যেমন তরখর আছিস এখনও, মেয়েও হয়েছে তেমন টট্টরে।'

মীরা হাততালি দিয়ে হেসে বললো, 'দিদি, কি আশ্চর্য, কতদিন পরে শুনলাম। এসব বিশেষণ মা ব্যবহার করতো, তাই না ? র'স কয়েকখানা ক'রে চাপাটি গড়ি। কিন্তু দিদি এই পাহাড়ী গরুর ঘিয়ে একটা গন্ধ থাকে যা তোকে সহ্য করতে হবে।'

বিভা বললো, 'তোর মেয়েকে দেখে মনে হচ্ছে, তোর সেই হরিণাভি ব্রাহ্মণ চিত্রকর দেখতে খুবই ভালো।'

মীরা ময়দা নিয়ে বসতে বসতে বললো, 'দূর দূর, সে হবে কেন ? সে আবার চিত্রকর কিসের ? ড্যাপটসম্যান বলতে পারিস। এ একজন বিদেশী ছাত্র, সুইডিশ, হদ্দ কুড়ি হবে। এদেশে এসেছিলো কড়া সূর্যের আলোয় রং কেমন দেখায় তা আঁকতে। একসঙ্গে মাস দুয়েক তখন এদিকের হিমালয়ের ছবি এঁকে বেড়াতাম আমরা। খুব গরীবের মতো, হাঁটা, বড় জোর হিচ্ হাইকিং।' মীরার মুখ বেশ লাল হ'লো।

কেতকী টুহুরামকে ডেকে এনেছিলো। টুহুরাম চা নিয়ে সিঁড়ির উপরে বসলে কেতকী তার পাশে গল্প করতে বসলো।

মীরা বললো, 'অসুবিধা তো বটেই। গোড়া থেকে নিজেই ঠিক করেছিলাম, কিন্তু দিন যত যেতে লাগলো, ভয় হ'তে লাগলো। বয়স তো তখন ত্রিশ পেরিয়েও কয়েক বছর। ডাক্তার একজন নেই, ওষুধ বলতে কিছু নেই। একেবারে প্রিমিটিব মানুষ যেন, আর একেবারে একা। পাহাড়ী প্রতিবেশী যা ভরসা।'

'তোর মেয়ে যে বললো পাহাড়ে গিয়েছে ছবি আঁকতে।'

'তাই ভালো নয় বলা ? ছাত্র কি কোথাও আটকে থাকে ? মাস দুয়েক এদিকের হিমালয় আঁকা শেষ ক'রে পুবদিকের পাহাড় আঁকতে চ'লে গিয়েছিলো। একবার একটা টেলিগ্রাম এসেছিলো মাস খানেক ঘুরতে ঘুরতে—এক পাহাড়ী সহরের থানা থেকে। একটা বডি আইডেণ্টিফাই করার জন্য। তার ভ্যালিজে নাকি আমার ঠিকানা ছিলো। নাকি তার ডলারের লোভে যে হোটেলে উঠেছিল তার লাগোয়া গুণ্ডারা খুন করেছে। আমারই ভুল। আমার সেই আমেরিকান ডলার থেকে পাঁচ'শ মতো দিয়েছিলাম। কিছুই তো তার ছিলো না। না। (মীরা মাথা ঝাঁকালো) ওসব পুলিশের ব্যাপারে কে যায় ?'

বিভা খুঁজে পাচ্ছিলো না কি বলবে। চা শেষ ক'রে বললো, 'এখন শুধু অর্ধেক-শেষ পোরট্রেটটাই আছে ?'

মীরা বললো, 'আচ্ছা, দিদি, স্নান করার আগে কিছু খেয়ে নে না হয়। পাঁচ মিনিট লাগবে চাপাটিগুলো বানাতে।' সে চাপাটি ভাজতে শুরু ক'রে বললো, 'জল তো গরম হয়েছেই। তুই বারান্দায় হাতমুখ ধুয়ে নে। তোকে গোপনে বলি পোরট্রেটটা বারো আনাই কেতকীরই। পুরুষালি ধাঁচ দিয়েছি, বয়সও কুড়ির মতো করেছি। কেতকীর কান দুটো, কপাল আর চিবুক আমার মতো। তা বদলাতে হয়েছে। ওগুলো সেই ছাত্রটিকে মনে ক'রে ক'রে আঁকতে হয়েছে। তুই তো বুঝতে পারছিস,

কেতকী তার জনকের খোঁজ করতে শুরু করলেই ছবিটা আঁকছি। বলেছি হিমা-লয়ের ছবি আঁকতে গিয়েছে। পরে যখন না-ফেরাতে অসহিষ্ণু হবে, বলতে হবে সন্ন্যেসি হয়ে গেছে। সে জন্যে এখনই নামাবলী দিয়ে রাখছি।'

মীরার চোখ দুটো তাওয়ার উপবে। বিভার চোখে জল আসছিলো। এসব তার কেমন লাগছে বলতে পারছে না। এটা কি এক বিশ্রামের বিন্দু যখন জমানো পথের ক্লান্তিতে সব ইচ্ছা ভেঙে ভেঙে পড়তে থাকে। সে হাত মুখ ধোওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলো। তাড়াতাড়ি ক'রে সিগারেট ধরালো একটা। চোখ বন্ধ করলো যেন ধোঁয়া এড়াতে। ধোঁয়া একটু কমলে বললো 'খাবি একটা ?'

বিভা বারান্দায় গেলে মীরা সেখানে ঠাণ্ডা-গরমে মিশিয়ে এক বালতি জল দিয়ে গেলো। এই দু'কাঠা জমির উপরে মীরার এই কাঠের ঘর, কিছু দূরে কয়েক ধাপ উঠে তেমন দু'কাঠা জমির উপরে পাথরের মেঝের উপরে কাঠের তৈরী স্কুল-ঘর, আর বাড়িটা আর স্কুলটাকে তিনদিকে ঘিরে তেমন কাঠা দু'তিন পাহাড়ের ঢালে গোটা তিন-চার আপেল গাছ, তেমন গোটা কয়েক পিচ। স্কুলটার আড়াল থেকে মীরার গোরু দুটো বেরিয়ে এলো। আশ্চর্য, এখানেই মীরা। কেতকী তো এটাকেই তার মৃত্তিকা ব'লে জানবে। আর দেখো, আমেরিকার সেই ডাক্তার নয়, হরিণাভি সেই রূপবাণ চিত্রকর নয়, এখানে এক বিদেশী ছাত্র—সাবধানী মীরার কেতকী এখানে, এতদিনে।

অনেকদিন পরে বিভা একটা শাড়ি পরে বসলে, মীরা তাকে খেতে দিলো। কেতকীকে ডেকে টুহুরামের জন্য চাপাটি পাঠালো তার হাতে। বিভা খেতে শুরু করলে বললো, 'দিদি, তোর মনে পড়ে মা অড়র ডাল দিয়ে এক রকম খিচুড়ি করতো। মা ছাড়া আর কাউকে তা রাঁধতে দেখি নি। রাঁধবো ? আর পাহাড়ী শসার তরকারি, আর মেথির আচার। ঘি কিন্তু পাহাড়ী গোরুর। নিজের হাতে করা আর টাটকাও। চিমসে গন্ধটা লাগছে কি ? ওই যাঃ, হিং ছাড়াও কাঁচা লঙ্কা দিতো মা। শুকনো লঙ্কায় হবে, হ্যাঁ দিদি ? আচ্ছা বল, দিদি, এবার, এভাবে কেন ? (মীরা হাসলো) আমার জন্যে ? তা হয় না। আমি এখানে এখন না থাকতে পারতাম। সেটাই বেশি সম্ভব ছিল।'

বিভা যেন অবাক হ'য়ে গেলো। এর চাইতে সত্য আর কি ? মীরা এখানে থাকবে কে জানতো ? আর মীরার এটাকে সে ছাড়িয়েও যেতে পারতো। এখানে আসার আসল পথটাকে তো এরা ছেড়েই এসেছিলো একদিন আগে, টুহুরাম যেমন বলছে। তারপর তো শুধু পথই থাকে।

সেই পথে পথে ইংরেজি আট সংখ্যা আর ইউ বর্ণ লিখে লিখে চলা।

মীরা বললো, 'খালি হাত, খালি গলা, যেন উদ্বাস্তু, তিব্বতেরই বলা যায়, তেমন পোশাক। তুই তো আর ভগবানকে খুঁজতে বেরোস নি।' সে হাসলো।

বিভা ভাবলো, কেন এমন তা কিন্তু, এখন বোঝা যাচ্ছে না। অ্যান ব্রউনের সেই

গলফ বল হওয়া, আঠারো নম্বর গর্তের কাছে দিগন্ত টপকে যাওয়া? আর এক্ষেত্রে স্বদেশী সেই কনসালই বা কোথায়? সে বললো, 'আচ্ছা সব বলবো তোকে। তখন দুজনে মিলে কারণটা, খুঁজে দেখা যাবে। তোর বুদ্ধি চিরকালই বেশি।'

'ব'স, তোকে আবার একটু চা ক'রে দি।'

বিভা বললো, 'আচ্ছা এক কাজ করলে চলে বোধ হয়। আমি, কেতকী, তুই ড্যালহৌসিতে গিয়ে থাকলাম। আর সেখান থেকে খবর পাঠালাম অজেয়দের। ওরা এসে নিয়ে যেতে পারে। তোর স্কুল এখন বন্ধ। আর তোর আপেল আর পিচে নিশ্চয় জল দিসনে রোজ।' বিভা হাসতে পারলো।

মীরা আবার চা করতে বসলো।

বিভা বললো, 'আচ্ছা মা থেকে আমি আর তুই, আর আমাদের অজেয় আর বিজয় আর কেতকী...'

'মানে?'

বিভা ভাবলো; খোঁজাটাই কি সব? আর তারপরে অজেয়দের, কেতকীদের মৃত্তিকা হ'য়ে যাওয়া? সে বললো, 'তুই রান্না শেষ কর। দেখি মার মতো পারিস কি না। এখন আমার সেই খিচুড়ির গন্ধটা মনে আসছে যেন। তারপর, তোর বুদ্ধি চিরদিনই আমার চাইতে বেশি, দুজনে আলাপ ক'রে দেখবো কি দাঁড়ায় এসব হয়তো কিছু দাঁড়ায় না।'